শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডে সিআইএ কিংবা কিসিঞ্জার প্রশাসনের ভূমিকা কি সত্যিই ছিল? কতটা ছিল? পঁচাত্তরের অভ্যুত্থানের চক্রান্তের সূচনা কি পঁচাত্তরেই, নাকি আরও আগে? ১৯৬৯ সালে ঢাকায় আসা দুই আততায়ী কারা? চক্রান্তের শেষ কি পঁচাত্তরেই? এ বিষয়ে খোদ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও সিআইএর দলিল কী বলে? জানার জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড • মিজানুর রহমান খান

মিজানুর রহমান খান

মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সিআইএর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠে ঘটনার ঠিক পরপরই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বরাবরই এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। ভারতে জরুরি অবস্থার কড়াকড়ির মধ্যেও মিডিয়ার একটি অংশ বাংলাদেশ-অভ্যুত্থানে সিআইএর জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে। কংগ্রেস নেতারাও এর সঙ্গে সুর মেলান। এ নিয়ে ওয়াশিংটন-দিল্লি সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়। তেল আবিব থেকে দিল্লিতে ছুটে আসেন মার্কিন সিনেটর টমাস ইগলটন। ইন্দিরা গান্ধী তখন তাঁকে বললেন, সিআইএর জড়িত থাকার কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। এদিকে মস্কো ঢাকায় সিপিবি নেতাদের বার্তা পৌঁছে দেয় যে কেজিবির খবর হলো বাংলাদেশ-অভ্যুত্থানে সিআইএ জড়িত নয়। মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ এ বিষয়ে অনুসন্ধানে নামেন। এ পর্যন্ত তিনিই একমাত্র সাংবাদিক, যিনি সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৭৫-এর ঘটনায় মার্কিন-সংশ্লিষ্টতার যথার্থতা দাবি করেছেন। তবে তাঁর অনুসন্ধান ছিল প্রধানত 'দায়িত্বশীল সূত্র'-নির্ভর। মুজিব হত্যাকাণ্ডের তিন যুগের বেশি সময় পর এই গ্রন্থেই প্রথমবারের মতো এ ঘটনায় মার্কিন-সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবমুক্ত করা দলিলের আলোকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হলো। এই বইয়ে এমন সব তথ্য রয়েছে, যা পাঠককে শুধু চমকেই দেবে না, অধিকতর কৌতূহলীও করে তুলবে।
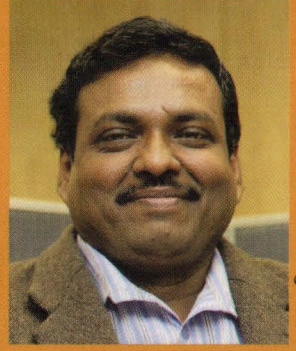
আলোকচিত্র : সাহাদাত পারভেজ

মিজানুর রহমান খান

জন্ম ৩১ অক্টোবর, ১৯৬৬, বরিশাল। বিএম কলেজ, বরিশাল থেকে হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর। তিন দশক ধরে সাংবাদিকতা করছেন। সংবিধান ও আইন নিয়ে লেখালেখি করেন। উল্লেখযোগ্য বই *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, *১৯৭১ : আমেরিকার গোপন দলিল*। বর্তমানে *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক।

প্রচ্ছদ : **কাইয়ুম চৌধুরী**

মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড
পঞ্চম মুদ্রণ : মাঘ ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪২০, আগস্ট ২০১৩
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৬০০ টাকা

Markin Dalile Mujib Hottakando
by Mizanur Rahman Khan
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 88-02-8180081
e-mail prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 600 only

ISBN 978 984 90254 7 4

উৎসর্গ

আলী আকবর খান ও
নাছিমা বেগম আঙ্গুরা
আমার আব্বা ও মাকে

সূচিপত্র

ভূমিকা

অন্তত ছয় বছর আগে *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমানের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা একটি সাদা খাম পেয়েছিলাম। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান বিষয়ে তাঁর লেখার অনেক ক্লিপিং এবং তাঁর নিজের বনেদি মহাফেজখানা, যেখানে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য নামীদামি লেখকের লেখা বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের বড় ঘটনাকে ছুঁয়ে যাওয়া বই রয়েছে, সেখান থেকে অবিরাম সরবরাহ আর সেই সঙ্গে দেশি-বিদেশি অন্যদের লেখালেখির দরকারি ক্লিপিং পেয়েছি।

সেই সাদা খামের প্রাপক মতিউর রহমান। প্রেরক লিফশুলজ, বলপেন দিয়ে লিফশুলজের হাতে লেখা ঠিকানা। খাম খুলে দেখি, কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জের সঙ্গে লরেন্স লিফশুলজের এবং কিসিঞ্জারের সঙ্গে লিফশুলজ ও কাই বার্ডের চিঠিপত্রের ফটোকপি।

লিফশুলজের দীর্ঘ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য ও ধারণা আমি আমার অনুসন্ধানে নিশ্চয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছি। কিন্তু তা মূলত গ্রহণ করেছি ততটুকুই যা কোনো দলিল সমর্থন করেছে।

এই বই রচনার কৃতিত্ব লেখকের একার নয়, এর পরামর্শক, জ্ঞানান্বেষী নির্দেশক মতিউর রহমান; তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সহযোগিতার কোনো তুলনা নেই। তিনি বাংলাদেশের পথিকৃৎ অনুসন্ধানী সাংবাদিক, যিনি পঁচাত্তরের অভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সম্পৃক্ততার বিষয়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে অব্যাহতভাবে নজর রেখে আসছেন। ১৯৯৩ সালে তিনি *ভোরের কাগজ*-এ লিখেছেন, 'শুধু অভ্যন্তরীণ কারণ নয়, মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজের তথ্যানুসন্ধান থেকে জানা যায়, সিআইএর জ্ঞাতসারে কয়েকজন দক্ষিণপন্থী আওয়ামী লীগ নেতা ও সামরিক

অফিসারদের বছরাধিককালের ষড়যন্ত্রে মুজিব নিহত হন। এ তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে পারে কারণ মার্কিন সরকার কখনোই শেখ মুজিবের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না।' এই লেখা পরিমার্জিত আকারে ২০০২ সালে *প্রথম আলোতে* ছাপা হয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এটি পরিশিষ্ট-৬-এ যুক্ত করা হলো। লিফশুলজই একমাত্র সাংবাদিক, যিনি মার্কিন-সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে প্রথম বই লিখেছেন। বিশ্বের অধিকাংশ লেখক এ বিষয়ে তাঁকেই উদ্ধৃত করে থাকেন। আর এ ক্ষেত্রে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের ভূমিকা ঠিক বিপরীত। তিনি সৈয়দ ফারুক রহমান ও আবদুর রশিদের জবানিতে লেখেন, তাঁরা কখনোই মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এর গুরুত্ব বোঝাতে তিনি এমনকি তাঁর বইয়ে বড় হরফে 'NOT' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে তাঁদের এই দাবি অসত্য প্রমাণিত হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের প্রতি হেনরি কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত বিরাগ দালিলিকভাবে প্রমাণিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয়েছে যে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে কথিত মার্কিন-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তদন্তযোগ্য। মুজিব সরকার উৎখাতের ঘটনায় মার্কিন দূতাবাস বা হেনরি কিসিঞ্জার প্রশাসনের বিস্মিত হওয়ার কথা ছিল না। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলার অভাব, অসন্তোষ এবং সম্ভাব্য সামরিক অভ্যুত্থানের গুজব-গুঞ্জন ঢাকা, ইসলামাবাদ ও দিল্লির মার্কিন দূতাবাস এবং ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে বাংলাদেশ ডেস্ক কর্মকর্তাদের আলোচনার খোরাকে পরিণত হয়েছিল। কিসিঞ্জার নিবিড়ভাবে এসব পর্যবেক্ষণ করেছেন। ১৯৭৫ সালের মার্চে 'অভ্যুত্থানের গুজব' নিয়ে মার্কিন দূতাবাস খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে উইলিয়াম বি স্যাক্সবি নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভারতে যাওয়ার আগে ওয়াশিংটনে কিসিঞ্জারের মুখোমুখি হন। স্যাক্সবি বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে পরিচিত। তিনি জানতে চাইলেন, 'বাংলাদেশ অভ্যুত্থান [বাকশাল প্রবর্তন] কি কোনো পরিবর্তন এনেছে?' উত্তরে কিসিঞ্জার বললেন, 'ঘটনাপ্রবাহ ঠিক সেভাবেই অগ্রসর হচ্ছে, যেমনটা পূর্বানুমান করা হয়েছিল। আমি কখনো ভাবিনি যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আসবে।' তিনি এ সময় স্মরণ করেন যে দেশটিকে তিনি 'বাস্কেট কেস' বলেছিলেন। 'বাস্কেট কেস' কথাটি বহুল প্রচারিত। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীর [মুজিবের] দীর্ঘদিনের গুণগ্রাহী। একজনের জীবনে এমন কারও

সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ সচরাচর ঘটে না যে যিনি তাঁর দেশের জনক এবং যিনি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় থেকে একটি জাতি সৃষ্টি করেছেন।...এবং প্রধানমন্ত্রী যদি গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হন তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না।'

তবে আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য আপাতত যখন যেমন যেদিকে যেটুকু নির্দেশ করেছে, এই বইয়ের বিবরণ বা সুতোগাঁথা সেদিকে চালিত হয়েছে। পরবর্তী বইয়ে সেই ধারা চলমান থাকবে। এই কাজ ১৫ আগস্ট নিয়ে সীমিত পর্যায়ের একটা অনুসন্ধান—এ বইকে এভাবে দেখা হলেই এর প্রতি বেশি সুবিচার করা হবে বলে মনে হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে মতিউর রহমানের অনুসন্ধিৎসা এবং নিরন্তর তাগিদের ফসল এই প্রকাশনা। তাঁর এবং লেখকের একই অভিন্ন লক্ষ্য : সত্য খুঁজে বের করা, তথ্যনিষ্ঠ থাকা। তাই নির্দিষ্টভাবে কোথাও পৌঁছে যাওয়ার কোনো বিষয় এতে নেই।

এর কোথাও অসংগতি, ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে, সে ক্ষেত্রে এর সবটুকু দায় একান্তভাবেই আমার। তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের মন্তব্য আমার। এই বইয়ের বেশ কিছু তথ্য ইতিমধ্যে *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত হয়েছে।

১৫ আগস্ট এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। আর একটি তারিখেও তা মিলিয়ে যায়নি। সে কারণে এর পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি দিয়ে একটি সার্বিক মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রে শুধু মার্কিন দলিল নয়, ব্রিটেনের রাজনৈতিক আশ্রয় লাভকারী সাবেক কেজিবি-কর্মী ভাসিলি মিত্রখিন, আর্কাইভ সূত্রে পাওয়া কেজিবির কিছু দলিল এবং অন্যান্য বইয়ের আলোকেও বিষয়টিকে দেখার একটা চেষ্টা এতে আছে। এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনায় অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসানের অসামান্য সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। নানাভাবে আরও যাঁরা আমাকে ঋদ্ধ ও ঋণী করেছেন তাঁদের মধ্যে মালেকা বেগম, সোহরাব হাসান, মশিউল আলম, রাশেদুর রহমান, আখতার হুসেন, জাফর আহমদ রাশেদ অগ্রগণ্য। প্রচ্ছদের জন্য অশেষ ধন্যবাদ বরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে। আর ধন্যবাদ আমার স্ত্রী আনজিনা শিরীন, ছেলে শাদমান ও আনান এবং মেয়ে আফসারাকে, যারা তাদেরকে আমার সময় না দেওয়া মেনে নিয়েছে বলেই এই বই লেখা সম্ভব হয়েছে।

মিজানুর রহমান খান
ঢাকা, জুলাই ২০১৩

ইতিহাসের পর্দা সরছে

ইতিহাসের কিছু অজানা অধ্যায় ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। ২০ ডিসেম্বর ১৯৬৯। শেখ মুজিবুর রহমান জানতে পেরেছিলেন, তাঁকে হত্যার জন্য দুজন আততায়ীকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। এ-সংক্রান্ত মার্কিন নথিটি নিম্নরূপ :

২৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯, প্রেরক মার্কিন কনস্যুলেট ঢাকা। প্রাপক : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াশিংটন ডিসি। অনুলিপি আমেরিকান কনসাল : করাচি, লাহোর, পেশোয়ার। কনফিডেনশিয়াল ঢাকা। বিষয় : পূর্ব পাকিস্তান শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে হত্যার চক্রান্ত।

১. ২৩ ডিসেম্বর ১৯৬৯ শেখ মুজিবুর রহমানের (protect) সঙ্গে ডেপুটি চিফ অব মিশন সিডনি সোবার[১] এবং কনসাল ইনচার্জ সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিব তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা-ষড়যন্ত্রের তথ্য প্রকাশ করেন। মুজিব বলেন, ২০ ডিসেম্বর ১৯৬৯ তিনি বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম জানতে পারেন, কিন্তু তখন গুরুত্ব দিতে চাননি। কিন্তু ২২ ডিসেম্বরে তিনি এ বিষয়ে যাচাইকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ লাভ করেন। ফলে তাঁর মনে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে।

---

১. সিডনি সোবার ১৯৪৭ সালে ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯৭২ সালের মে থেকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানে মার্কিন দূতাবাসের অস্থায়ী চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ছিলেন। শেখ মুজিব সম্পর্কে সিডনি সোবারের সাক্ষাৎকার দেখুন পরিশিষ্ট ১-এ।

২. শেখ মুজিব বিশ্বাস করেন, ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যকার পাঞ্জাবিদের একটি ক্ষুদ্র চক্র রয়েছে। ওই পাঞ্জাবি সেনাচক্র, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের ধারণা মেনে নিতে পারছে না। দুই আততায়ীর মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছে গেছে। মুজিবের সমর্থকেরা অবশ্য তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ নজর রেখে চলেছেন। মুজিবকে যখন প্রশ্ন করা হয়, এ বিষয়ে সামরিক আইন প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে কি না, তখন তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত হন। কিন্তু স্বীকার করেন যে তাদের জানানো হয়েছে। (মন্তব্য : মুজিবের এই দ্বিধান্বিত হওয়াটার পেছনের কারণ হয়তো এটাই, এ বিষয়ে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।)

৩. মুজিব মনে করেন, ষড়যন্ত্রকারীরা যদি মনে করে থাকেন যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়, তবে পাগল ছাড়া তারা আর কিছুই নয়। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের উসকানিতে যদি তাঁকে হত্যা করা হয়, অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার শেষ সুযোগ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

৪. মন্তব্য : মুজিবকে হত্যার ষড়যন্ত্র সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, মনে করিয়ে দেওয়ার পক্ষে এটা একটা সময়োপযোগী বিষয় যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকদের নিরাপত্তাব্যবস্থা কল্পনাতীত রকম শূন্যের কোঠায়। আসন্ন অবাধ রাজনৈতিক কার্যক্রমকালে, বিশেষ করে শেখ মুজিব হাজার হাজার কিংবা কোনো একদিন লাখো লোক তাঁকে ঘিরে থাকবে। এ রকম ভিড়ের মধ্যে একজন আততায়ী মুহূর্তের মধ্যে তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তার ফল দাঁড়াতে পারে বিয়োগান্ত।

৫. মুজিব আলোচনাকালে অন্য যেসব প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করেছেন, তা পৃথক এয়ারগ্রাম মারফতে পাঠানো হচ্ছে।—কিলগোর।[২]

---

২. এন্ড্রু আই কিলগোরের জন্ম ১৯১৯ সালের ৭ নভেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা অঙ্গরাজ্যে। ১৯৮০ সালে পররাষ্ট্র সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণকালে তিনি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তিনি আমেরিকান এডুকেশনাল ট্রাস্টের অন্যতম মূল প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠান *দ্য ওয়াশিংটন রিপোর্ট অন মিডল ইস্ট অ্যাফেয়ার্স* শীর্ষক সাময়িকীর প্রকাশক। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন নৌবাহিনীতে চাকরি করেন। অনলাইন উইকিপিডিয়া বলেছে, কিলগোর উত্তর-পশ্চিম ওয়াশিংটনে বসবাস করছেন। ১৯৬৭-৭০ সালে তিনি ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেটে পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন।

এই ঘটনার তিন বছর পর ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব সরকারের অগোচরে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আলোচনা করতে।[৩]

এরপর বছর না ঘুরতেই ১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই একইভাবে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য মার্কিন দূতাবাসে যান আরেকজন মেজর। তিনি ফারুকের ভায়রা ভাই মেজর আবদুর রশিদ। ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির পক্ষে সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ক্রয় নিয়ে কথা বলতে তাঁকে পাঠানো হয় বলে দাবি করেছিলেন তিনি।[৪]

এখানেই শেষ নয়। ১৩ মে ১৯৭৪। সৈয়দ ফারুক রহমান 'উচ্চতম পর্যায়ের বাংলাদেশ সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে' শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা চান।[৫]

এর ঠিক ১৫ মাসের ব্যবধানে ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ঘটে। ফারুক রহমান ১৯৯২ সালের আগস্টে লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে (পরিশিষ্ট ৩) দাবি করেন যে, তিনি ১৫ মাস ধরে মুজিব হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ফারুক-রশিদ মার্কিন দূতাবাসে তাদের ওই গোপন মিশন বা যুক্তরাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য কখনো কোথাও দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

বাংলাদেশের একটা মার্কিনমুখিতার সূচনা ঘটেছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কোনো এক সময় ভারতের মাটিতে। জনপ্রিয় ধারণা হলো, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রমুখের উদ্যোগেই পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠন প্রশ্নে নিক্সন-কিসিঞ্জার প্রশাসনের সঙ্গে 'পূর্বযোগাযোগ' ঘটেছিল। কিন্তু ভারত ও প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের পুরো মন্ত্রিসভার জ্ঞাতসারেও যে এই গোপন যোগাযোগ চলেছিল, তা-ও লক্ষ করা যায়।

কলকাতায় মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের প্রশ্নে খন্দকার মোশতাক আহমদের নাম বহুল আলোচিত। কিন্তু কাজী জহিরুল কাইউমের

---

৩. ডকুমেন্ট নং কনফিডেনশিয়ালঢাকা৩১৫৬, ঢাকা থেকে তারবার্তাটি ওয়াশিংটনে প্রেরণ করেন ঢাকার মার্কিন দূতাবাস-কর্মকর্তা নিউবেরি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রকাশকাল : ৩০ জুন ২০০৫।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. ডকুমেন্ট নং সিক্রেটঢাকা২১৫৮। ঢাকা থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে তারবার্তাটি প্রেরণ করেন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার। প্রকাশকাল ৩০ জুন ২০০৫।

নাম সেভাবে প্রচার পায়নি। ষাটের দশকে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন কাজী জহিরুল কাইউম। মোশতাক-জহিরুল ছিলেন জাতীয় পরিষদের সদস্য। ১৯৭৩ সালে জহিরুলও আওয়ামী লীগের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হন। তাঁকে বাকশালের কুমিল্লা জেলা সেক্রেটারি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। তিনি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ ঢাকায় ইন্তেকাল করার আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন।[৬]

ড. আলফ্রেড হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭৯ সালে তাঁর *দ্য হোয়াইট হাউস ইয়ার্স*-এ লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত এল কে ঝায়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল।' পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কিন সম্পৃক্ততার বিষয়টিকে মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ একাত্তরের ওই 'পূর্বযোগাযোগের' আলোকেই দৃঢ় ভিত্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। কলকাতায় মার্কিন কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতা কাজী জহিরুল কাইউম মুখ্য ভূমিকা রাখেন। এ-ও ঠিক যে, ফারুক-রশিদ যুক্তরাষ্ট্রমুখিতার যে ধারা ১৫ আগস্টের আগে ও পরে চালু করেন, তা-ই পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে নিয়ামক হয়ে ওঠে। মুজিব আমলে রুশ-ভারত অক্ষশক্তিতে থাকা বাংলাদেশকে খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমান মার্কিন ও ইসলামি অক্ষশক্তির আওতায় আনেন।

তখন ছিল স্নায়ুযুদ্ধের যুগ। বিশ্ব ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। এক দিকে পুঁজিবাদী আমেরিকা। অন্য দিকে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন। দুই পরাশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন সরকার ও অঞ্চলকে নিজ নিজ প্রভাববলয়ে আনতে সক্রিয় ছিল। দক্ষিণ এশিয়া আলাদাভাবে দুই পরাশক্তির প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে তখনো। তবে ভারত ঝুঁকে ছিল সোভিয়েত শিবিরে। আর পাকিস্তান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। এ রকম প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার (পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী) চীনের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। সাধারণভাবে ওই সময়ে এটা অবিশ্বাস্য ছিল যে, কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র নিজ গরজে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। কিন্তু বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল।

---

৬. কাজী জহিরুল কাইউমের পুত্র কাজী রফিকুল কাইউমের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার।

গোপনীয়তার মাত্রা এতটাই কঠোর ছিল যে, খোদ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও তা জানতেন না। পাকিস্তান সফররত কিসিঞ্জার অবকাশ যাপনের কথা বলে ইসলামাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং চীন সীমান্তসংলগ্ন পর্যটন শহর মারি পৌঁছান। সেখানে তিনি হঠাৎ 'অসুস্থ' হন এবং গোপনে চীন সফর করেন। সেই খবরও পাকিস্তানের তখনকার মার্কিন দূতাবাসের দু-একজনের বেশি কর্মকর্তা জানতেন না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ছিলেন এই গোপন কূটনীতির অনুঘটক। সে কারণে নিক্সন-কিসিঞ্জার জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে ইয়াহিয়া সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা বাংলাদেশের বিরুদ্ধাচরণে মার্কিন সমর্থনকে অনেকেই সেই যোগসূত্রের অন্যতম ফল হিসেবে বিবেচনা করেন। দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব যাতে একচ্ছত্র হয়ে না পড়ে, সেদিকে নজর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বামভীতি ১৯৪৭ সালে দেশভাগ থেকেই লক্ষ করা যায়। সেদিক থেকে বাংলাদেশের জন্ম ছিল প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, বিশেষ করে হেনরি কিসিঞ্জারের একটা বড় পরাজয়। যদিও তাঁদের দাবি, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাঁদের আপত্তি ছিল না। ভারতের সঙ্গে মতভিন্নতা ছিল প্রক্রিয়াগত। শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। বর্তমান গ্রন্থে আমরা মুজিব হত্যায় অভিযুক্তদের সঙ্গে মার্কিন-সংশ্লিষ্টতা বা পূর্বযোগাযোগের কিংবা সে বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত জনমতের কিছু খণ্ডচিত্র দেখতে পাব। তবে সেটা অবশ্যই আংশিক। সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্তভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসার সময় বোধ হয় এখনো আসেনি।

শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডে সিআইএর কথিত সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ। *বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভল্যুশন* (সহ-লেখক কাই বার্ড) নামের এই গ্রন্থ ১৯৭৯ সালে বের হয়। এর আগে মুজিব হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি হংকংয়ের সাপ্তাহিক *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ* ও লন্ডনের দৈনিক *দ্য গার্ডিয়ান*-এর জন্য প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রায় চার দশক আগে তিনি ভারতে এসেছিলেন। সেই থেকে তাঁর পেশা ও চিন্তারাজ্যের অনেকখানি জায়গাজুড়ে আছে দক্ষিণ এশিয়ার তিন রাজধানী ঢাকা, দিল্লি ও ইসলামাবাদকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ। বিবিসি ও ফরাসি দৈনিক *লা মঁদ*-এর হয়েও কাজ করেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য বই : *দ্য ট্রায়াল অ্যান্ড*

কনভিকশন অব আরিফ দুররানি (১৯৯১, সহ-লেখক স্টিভেন ও লিফশুলজ সহধর্মিণী রাবিয়া আলী), *হোয়াই বসনিয়া? : রাইটিংস অন দ্য বলকান ওয়ার* (১৯৯৩, সহ-লেখক রাবিয়া আলী), *হিরোশিমা'স শ্যাডো* (১৯৯৮, সহ-লেখক কাই বার্ড)।

কাই বার্ড মার্কিন কূটনীতিক ইউজিন এইচ বার্ডের ছেলে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবের দেশে ফেরার সময় ইউজিন বার্ড দিল্লিতে মার্কিন বাণিজ্য অ্যাটাশে ছিলেন। এর আগে ১৯৬৭-৭২ সালে তিনি মুম্বাই ও দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। শেখ মুজিবকে দেখতে তিনি তাঁর ছেলে কাই বার্ডকে নিয়ে পালাম (বর্তমান ইন্দিরা গান্ধী) বিমানবন্দরে যান। ইউজিন বার্ড ১৯৯৪ সালে মার্কিন কথ্য ইতিহাস প্রকল্পকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তথ্য দেন, 'তখন তাঁর (কাই বার্ড) বয়স ১৮ কিংবা ১৯। কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের (সিবিএস) ক্যামেরা ক্রু হিসেবে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই কাই বার্ড নতুন বাংলাদেশে পৌঁছান। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁকে সীমান্ত পার হতে সহায়তা করে। ঢাকায় কাই বার্ড মুজিবের সাক্ষাৎকার নেননি। কিন্তু লরেন্স লিফশুলজের সঙ্গে একটি বই লিখেছেন।' ১৯৭৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ওই বইয়ের দুটি ভাগ। দ্বিতীয় ভাগটির নাম *দ্য মার্ডার অব মুজিব*। পুরো বই নয়, এই অংশ যৌথভাবে লেখা। কাই বার্ড অবশ্য পরে আর মুজিব হত্যাকাণ্ড নিয়ে লিখেছেন বলে জানা যায় না।

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম স্যাক্সবি ১৯৭৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছিলেন (বার্তা নং ১৯৭৬নিউডিই০০৯৩৬), লরেন্স লিফশুলজ দিল্লির মার্কিন দূতাবাসকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, ভারতে তাঁর ভিসা আর নবায়ন করা হবে না। ১৯৭৬ সালের ২৫ জানুয়ারি স্যাক্সবির বার্তায় (১৯৭৬নিউডিই০১২১১) বলা হয় :

> আট দিন সময় দিয়ে ২৫ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটার মধ্যে বের হয়ে যেতে তাঁকে আলটিমেটাম দেওয়া হয়। মানবিক কারণে ও "একজন কর্মরত মার্কিন সাংবাদিক" বিবেচনায় মার্কিন দূতাবাস আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় বাড়াতে দূতাবাসের অনুরোধ উপেক্ষিত হয়। লিফশুলজ যেতে চাইছিলেন না। ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পুলিশ লিফশুলজের সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁকে ২৮ জানুয়ারি মধ্যরাতের মধ্যে দেশত্যাগের নির্দেশ দেয়। তিনি পরদিন করাচির উদ্দেশে দিল্লি ছেড়ে যান। স্যাক্সবি তাঁর এ দিনের বার্তায় লিখেছেন, ভারতের তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *টাইম* ম্যাগাজিনের স্থানীয় স্ট্রিংগার জিম শেফার্ডকে বলেন, ছয় বছর ভারত ও বাংলাদেশে থাকা লিফশুলজ, যিনি হিন্দিতে অনর্গল কথা

বলতে পারেন, তাঁর ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কারণ তিনি "বড় বেশি জেনে গিয়েছিলেন"।[৭]

ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউতে বাংলাদেশ-বিষয়ক নিবন্ধের দ্বারা লিফশুলজ অবশ্য মুজিব সরকারকেও বিব্রত করেছিলেন। বাংলাদেশ-বিষয়ক তাঁর লেখাসংবলিত ওই পত্রিকার অন্তত তিনটি সংখ্যা মুজিব সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। সামরিক আদালতে কর্নেল তাহেরের বিচারের বিষয়টি তিনিই বিশ্ববাসীর কাছে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। মুজিব হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের পক্ষপাত তাঁর লেখালেখিতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। এন এম জে ছদ্মনামে লিফশুলজ *ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন।[৮] তিনি দেখান যে, ১৯৭৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি *বাংলাদেশ টাইমস* পত্রিকায় বড় শিরোনাম ছিল, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদন বলেছে বাংলাদেশে মানবাধিকার-পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।' অথচ এর চার মাস আগেই সেনাবাহিনীতে গণপ্রাণদণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১৯৭৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় 'বাংলাদেশ এক্সিকিউশনস : এ ডিসক্রেপেনসি' বা 'বাংলাদেশে প্রাণদণ্ড একটি অমিল' শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। এতে তথ্য দেওয়া হয় যে আগের বছরের ২ অক্টোবর এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ঘটনায় ২১৭ জনের প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়। ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৮ ঢাকার মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আলফ ই বার্গেসেন এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি গোপন বার্তা পাঠান। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তরের সূত্র এটি মিডিয়ায় ফাঁস করে দেয়। ওই বার্তা থেকে দেখা যায়, বার্গেসেন লিখেছেন, যে ২১৭ জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় তার মধ্যে প্রায় ৩০-৩৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় আনুষ্ঠানিক বিচার-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আগেই। লিফশুলজ লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৭৬ সালের বৈদেশিক নিরাপত্তা সহায়তা আইন যা ৫০২-বি হিসেবে পরিচিত, তাতে একটি সংশোধনী আনা হয়েছে। এর আওতায়ই বাংলাদেশকে সামরিক সহায়তা দেওয়া হয়।

লিফশুলজ আবু তাহের হত্যা মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চে ১৪ মার্চ ২০১১ একটি বিবৃতি দেন। লিখিত

---

৭. ডকুমেন্ট নং ১৯৭৬নিউডিই০১৩৬৯।

৮. *Murder In Dacca Ziaur Rahman's Second Round*, N. M. J., *E&PW*, Vol-13, No 12 , March 25, 1978.

হলফনামায় উল্লেখ না থাকলেও আদালতকে তিনি বলেছেন, 'শেখ মুজিব হত্যা মামলায় জিয়াউর রহমান পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। কর্নেল ফারুক ও রশিদের সঙ্গে কথোপকথন এবং অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের বই *বাংলাদেশ: আ লিগ্যাসি অব ব্লাড* থেকে সেটা স্পষ্ট। জিয়া আগস্ট অভ্যুত্থানের মুখ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি চাইলে অভ্যুত্থান হয়তো বন্ধ করতে পারতেন। কারণ, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি আগেই ওয়াকিবহাল ছিলেন।' বিবিসির সৈয়দ মাহমুদ আলীও ২০১০ সালে লিখেছেন :

> মূল ষড়যন্ত্রকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একমাত্র আর্মার্ড রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছে ২০ মার্চ ১৯৭৫ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব কামনা করেন। জিয়া তাতে অসম্মত হন। কিন্তু মেজরদের প্রতিহত করার কথা তিনি বলেননি। তিনি তাঁর অধীনস্থ বাহিনীকে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহারেও সচেষ্ট হননি। যদিও তিনি নিজে আগে থেকে বিষয়টি জানতেন।[৯]

মুজিব হত্যায় লিফশুলজের গবেষণাকর্ম তিন দশকের বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে উদ্ধৃত হচ্ছে। তবে এ-ও লক্ষণীয় যে, লিফশুলজ ছাড়া অন্য কোনো বিদেশি সাংবাদিক এযাবৎ মুজিব হত্যায় মার্কিন বা সিআইএর সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে খতিয়ে দেখার কোনো প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বলে জানা যায় না। আর সে কারণেই হয়তো পশ্চিমা লেখক ও গবেষকদের অনেকেই লিফশুলজকে উদ্ধৃত করেছেন।

মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস্টোফার এরিক হিচেন্স ২০০১ সালে তাঁর *দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার* বইয়ে লিফশুলজের বরাতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সিআইএর সম্পৃক্ততার বিষয়টি সমর্থন করেন। হিচেন্স চার দশকের বেশি সময় সাংবাদিকতা ও লেখালেখিতে জড়িত ছিলেন। *নিউ স্টেটম্যান*, *দি আটলান্টিক*, *দ্য নেশন*, *দ্য ডেইলি মিরর* ও *ভ্যানিটি ফেয়ার* ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। তিনি ১২টি বই লিখেছেন। তিনি ক্যানসারে মারা গেলে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারসহ অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার বইয়ে হিচেন্স কিসিঞ্জারকে একজন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কিসিঞ্জারের বিচারের জন্য

---

৯. S Mahmud Ali, *Understanding Bangladesh*, Columbia University Press, 2010, পৃ. ১১১।

ন্যুরেমবার্গসহ অন্য কিছু ট্রাইব্যুনালের আদলে একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের দাবিও তোলেন তিনি। কিসিঞ্জারকে তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এক বিচিত্র মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। হিচেন্স লিখেছেন :

> বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কিসিঞ্জার রাজনীতির বিষয়টাকে একটি নিতান্ত "ব্যক্তিগত" ব্যাপার হিসেবে গ্রহণের প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাঁর কারণে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তাঁর জন্য অসুবিধাজনক কতিপয় ব্যক্তির কথাও আমরা জানি। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সালভাদর আয়েন্দে, আর্চ বিশপ ম্যাকারিওস ও শেখ মুজিবুর রহমান।

এই নিবন্ধ ছাপা হয় ২০০১ সালের মার্চ মাসের *হারপারস ম্যাগাজিন*-এ। হিচেন্স একসময় এই ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ওই বই অবলম্বনে মার্কিন পরিচালক অ্যালেক্স গিভনি একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তাতে কিসিঞ্জারের সঙ্গে সাক্ষাৎকাররত অবস্থায় হিচেন্সের ছবি আছে। এখনো তা আর্কাইভ ফুটেজ অবস্থায় রয়েছে। তবে হিচেন্সের বইটি যে কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কিসিঞ্জার চরিত্র চিত্রণের বিষয়টি মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএর জড়িত থাকার অভিযোগের গভীরতা অনুধাবনের জন্য প্রাসঙ্গিক। ১৯ এপ্রিল ২০০১ 'ওয়াশিংটন ভেন্দেত্তা ওহ্ হেনরি' শিরোনামে *দি ইকোনমিস্ট*-এ হিচেন্সের বইটির একটি সমালোচনা ছাপা হয়। এতে বইটিকে 'আক্রোশপূর্ণ ও বিতর্ক সৃষ্টিতে পারঙ্গম' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। *ইকোনমিস্ট*-এর ভাষ্যকার অবশ্য ইঙ্গিত দেন যে, কিসিঞ্জারের পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক ভাবমূর্তি নিরীহ নয়। তিনি উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের দূরপ্রাচ্য-বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিক্সন আমলের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করেছিলেন। এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি কিসিঞ্জারের প্রতি নিশ্চিতভাবেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। হিচেন্স অবশ্য নিজেই স্বীকার করেন যে, কিসিঞ্জারকে তিনি তাঁর 'রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী' মনে করেন। হিচেন্সের মৃত্যুর পর ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ *ইকোনমিস্ট* তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ছাপে 'ক্রাইং ফ্রিডম' বা ক্রন্দসী স্বাধীনতা।

হিচেন্স তাঁর বইয়ে কিসিঞ্জার ও ইয়াহিয়ার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। মুজিব হত্যাকাণ্ডই শুধু নয়, একাত্তরের গণহত্যার জন্যও হিচেন্স কিসিঞ্জারকে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইয়াহিয়া তাঁর তথ্যমন্ত্রী জি ডব্লিউ চৌধুরীসহ ঘনিষ্ঠদের বলেছেন, ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের সঙ্গে তাঁর যে ব্যক্তিগত বোঝাপড়া তাই তাঁকে সুরক্ষা দেবে। পরে মি. চৌধুরী লিখেছেন,

'নিক্সন ও কিসিঞ্জার যদি তাঁকে মিথ্যা আশ্বাস না দিতেন তাহলে ইয়াহিয়া অনেক বেশি বাস্তবানুগ ভূমিকা রাখতে পারতেন।'[১০]

হিচেন্সের দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য :

> ভারতবিদ্বেষী নিক্সনকে খুশি করাই ছিল কিসিঞ্জারের ব্যক্তিস্বার্থ। আর এটা চরিতার্থ করতেই তিনি তাঁর বাংলাদেশ নীতি সূত্রবদ্ধ করেন। তিনি পণ করেছিলেন, কিছুতেই তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয় মানবেন না। বাংলাদেশ-সংকট মোকাবিলায় তিনি একশ্রেণীর মন্দ এমনকি হরবোলা মিডিয়ার খপ্পরে পড়েছিলেন এবং চীনে তাঁর আপাতচমৎকার মুহূর্তগুলোকে তারা কিছুটা নষ্ট করেছে। তিনি বাংলাদেশ ও তার নেতাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। এমনকি তাঁর তৎকালীন সহকারী রজার মরিসের মতে, কিসিঞ্জার আয়েন্দের সঙ্গে মুজিবকে তুলনা করেছিলেন।[১১]

সিআইএর সাবেক কর্মকর্তা রজার মরিস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের আমলে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের স্টাফ হিসেবে যোগ দেন।

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ ও কিসিঞ্জার

কিসিঞ্জারের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের অভিযোগ শেখ মুজিবকে শাস্তি দিতে তিনি খাদ্যসাহায্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাই চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে নিক্সন প্রশাসনের ভূমিকার বিষয়টি আজও গবেষকদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ব্রিটিশ গবেষক আলেকজান্ডার ওয়ালের কথায়, 'ওই সময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্যসাহায্য বন্ধ করে দেয়। আর সেটা ছিল হেনরি কিসিঞ্জারের নিষ্ঠুরতম সিদ্ধান্ত।'[১২]

তিন মার্কিন অধ্যাপক জর্জ ডব্লিউ নর্টন, জেফরি আর আলওয়াং, উলিয়াম এ মাস্টার্স ২০০৬ সালে লিখেছেন :

> ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে সরকারিভাবে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে ৩০ হাজার লোক মারা গেছে মর্মে সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল। তবে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। বেশির

---

১০. *দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার*, পৃ. ৪৮।

১১. ওই, পৃ. ৫০।

১২. *Famine crimes politics & the disaster relief industry in Africa*, London African Rights & the International African Institute, 1997, James Currey Publishers, P. 17.

ভাগই একমত যে দুর্ভিক্ষের আগে বা পরে ক্ষুধা বা সে-সংক্রান্ত কারণে মৃতের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে।[১৩]

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৯৮১ সালে যদিও লিখেছেন, '১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের কারণ আর যা-ই হোক, সেটা খাদ্য কমে যাওয়ার কারণে ঘটেনি।'[১৪] তবে ওই সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্য না দিতে মার্কিন প্রশাসনের রাজনীতিটাও অস্বীকার করা যাবে না। অধ্যাপক রেহমান সোবহান লিখেছেন, '১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে এক প্রকট দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে খাদ্যসাহায্যকে ব্যবহার করল। সেই চাপ ছিল এমন একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার জন্য, যার ফসল হলো ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তন।'[১৫] ইলোরা শেহাবউদ্দিন ২০০৮ সালে লিখেছেন, 'রেহমান সোবহান যখন দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্য রাজনীতিকে দুষছেন, তখন এমা রথচাইল্ড (১৯৭৬) লিখছেন যে, কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক রদ না করা পর্যন্ত মার্কিন খাদ্যবাহী জাহাজ বাংলাদেশে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।'

১৯৭৪ সালের ৬ জুন কিসিঞ্জার এক তারবার্তায় লিখেছেন, কিউবায় পাট রপ্তানির সিদ্ধান্ত *বাংলাদেশ অবজারভার*-এ ১৯৭৪ সালের ৪ মে প্রকাশিত হয়। এ থেকেই আমরা বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। তিনি এ ব্যাপারে আইনগত প্রশ্ন তোলেন। বলেন, পিএল ৪৮০-এর ১০৩ ঘ (৩) ধারার এর অধীনে বিষয়টি আটকে যেতে পারে। এটার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে খাদ্য সরবরাহ স্থগিত রাখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়।[১৬]

১০ জুন ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার জানিয়েছেন, এইড সমন্বয়ক ও ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ অব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সচিব সাইদুজ্জামানের (পরে এরশাদ সরকারের অর্থমন্ত্রী) সঙ্গে কথা বলেন। তবে দূতাবাস নিজস্ব সূত্রে জানতে পেরেছে, ৪ মে *অবজারভার*-এর রিপোর্টের আগে বাংলাদেশ সরাসরি কিউবায় কোনো রপ্তানি করেনি।

---

১৩. George W. Norton, Jeffrey R. Alwang, William A. Masters, *Economics of Agricultural Development: World Food Systems and Resource Use,* Routledge, 2006, P. 31.

১৪. Amartya Sen, *Poverty and Famines*, Oxford University Press,1981, P. 141.

১৫. Elora Shehabuddin, *Reshaping the Holy: Democracy, Development, and Muslim Women in Bangladesh*, P. 70. Columbia University Press, 2008.

১৬. ডকুমেন্ট নং ১৯৭৪স্টেট১১৯৩৮৯।

অবজারভার শুধু পাটজাত পণ্যের উল্লেখ করেছে।[১৭]

১৯৭৪ সালের ১১ জুন নিক্সন সরকারের রাজনীতি-বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জোসেফ জন সিসকোর প্রেরিত এক বার্তায় দেখা যায়, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হোসেন আলীকে কিউবায় পাট রপ্তানিসংক্রান্ত জটিলতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁকে এটাও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ পিএল ৪৮০-র নতুন গ্রহীতা, তাই অসাবধানতাবশত কিউবার সঙ্গে সে ওই বাণিজ্য করে ফেলতে পারে। ওই আইনে নির্দিষ্টভাবে কিউবা ও উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক করার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইউএসএইডের ডোনাল্ড ম্যাগডোনাল্ড এ নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, রাষ্ট্রদূত বোস্টার এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছেন।[১৮]

১৩ জুন বোস্টার লিখেছেন :

> পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম আজ আমাকে তাঁর সঙ্গে আলোচনার আমন্ত্রণ জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই "জটিল" বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জানাতে বলেছেন যে সরকার-নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা কিউবায় ৪০ লাখ চটের বস্তা রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক রপ্তানি হয়েছে। এমন রপ্তানি কেবল একবারের জন্যই। পিএল ৪৮০-সংক্রান্ত আইনি জটিলতা তাদের জানা ছিল না। এটা অজ্ঞতার কারণে ঘটেছে। নুরুল ইসলাম বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি লাতিন অমেরিকার দেশগুলোকে কিউবায় রপ্তানি করতে দিয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখা যায়। কারণ, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা ভালো নয়।

লক্ষণীয় যে, এই বৈঠক সফল ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। বোস্টার বাংলাদেশের পক্ষে এক অসাধারণ সুপারিশ করেন। কিউবায় ভুল করে পাটজাত পণ্য প্রেরণের কারণে বাংলাদেশকে যাতে শাস্তি না দেওয়া হয়, সে জন্য তিনি মুজিব সরকারের সার্বিক অবস্থান তুলে ধরেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আর্চার ব্লাডের মতোই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁর মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি লিখেছেন :

> আমাদের নিজেদের জিজ্ঞেস করা উচিত যে বাংলাদেশের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে আমাদের লাভটা কী। সোভিয়েত ব্লক থেকে তাড়াতাড়ি বের হওয়া

---

১৭. ডকুমেন্ট নং ১৯৭৪ঢাকা০২৬০৫।
১৮. ডকুমেন্ট নং ১৯৭৪স্টেট১২৩১৭১।

তার জন্য দুরূহ। তবে মুজিব সরকার তার পররাষ্ট্রনীতিতে যেভাবে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে, সেটা মার্কিন স্বার্থের অনুকূল। বাংলাদেশ এক বছর ধরে সকল পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি লেইনজেন মি. হোসেন আলীকে যেমনটা বলেছেন, তেমনি আমিও তাঁকে (নুরুল ইসলাম) বলি যে, এ নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্ক করলে কোনো সুফল মিলবে না। এখন আমি মনে করি না যে, কৌশলগতভাবে গুরুত্বহীন এমন একটি কৃষিপণ্যের রপ্তানি নিয়ে আমরা বাংলাদেশের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে কোনো ফায়দা পেতে পারি।

তা ছাড়া রাষ্ট্রদূত বোস্টার সমস্যাটির আইনি সমাধানও বাতলে দেন। তিনি যুক্তি দেন যে, 'পাটজাত পণ্যের কোনো কৌশলগত গুরুত্ব নেই। তাই ওই আইনের আওতায় একে "অকৌশলগত কৃষিজাত পণ্য" হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।'[১৯] তবে বাংলাদেশে যখন অনাহারে মানুষ মরছিল, তখনো কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার দিতে চাননি। এর সাক্ষ্য-প্রমাণ এখন মার্কিন দলিল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

১৪ আগস্ট ১৯৭৪। বিকেল পাঁচটা। মিনেসোটা থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেটিক সিনেটর হুবার্ট হামফ্রে টেলিফোনে কথা বলছেন কিসিঞ্জারের সঙ্গে। হামফ্রে মার্কিন খাদ্য-কূটনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। ১৯৫০-এর দশকে ভারতে দুর্ভিক্ষের সময় হামফ্রে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পাশে দাঁড়ান। এর ফলে কংগ্রেস ইন্ডিয়ান ইমার্জেন্সি ফুড অ্যাক্ট, ১৯৫১ পাস করে এবং ভারতকে ২০ লাখ টন খাদ্যশস্য ক্রয়ে ১৯০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে ট্রুম্যান সরকারকে অনুমতি দেওয়া হয়।[২০]

সিনেটর হামফ্রে ওই দিন কিসিঞ্জারকে রোমে অনুষ্ঠেয় আসন্ন বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেন। কিসিঞ্জার বলেন, 'আমিও আপনাকে ওই সম্মেলনে যোগ দিতে অনুরোধ জানানোর কথা ভাবছিলাম।' এ সময় তাঁদের আলোচনায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি উঠে আসে :

হামফ্রে : আমি মনে করি, ওই সম্মেলনে আপনার উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বাংলাদেশ তো একটা 'বাস্কেট কেস'। তাদের জনগণের জন্য ত্রাণ সরবরাহে আমরা কি নির্বাহী বিভাগ থেকে কোনো অনুরোধ পেয়েছি?

---

১৯. ডকুমেন্ট নং ১৯৭৪ঢাকা০২৬৮৯।

২০. *Transplanting the Great Society: Lyndon Johnson and Food for Peace*, University of Missouri Press, 2008, By Kristin L. Ahlberg, P. 15.

কিসিঞ্জার : আমাকে এটা দেখতে দিন। অবশ্যই আমাদের এটা করা উচিত।

হামফ্রে : আমি ভেবেছিলাম, বিষয়টি আপনার নজরে আনা উচিত।

কিসিঞ্জার : আমি খুবই সহানুভূতিশীল।[২১]

১০ জানুয়ারি ১৯৭৫। সন্ধ্যা ৭ ২০। টেলিফোনে কথা হচ্ছে কিসিঞ্জার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট টম এন্ডার্সের মধ্যে :

কিসিঞ্জার : গত তিন দিন আমি প্রেসিডেন্টের কাছে আমাদের পিএল ৪৮০ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে চাইছি। কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে একটি ভালো কার্যপত্র পাইনি। প্রত্যেকটি কার্যপত্রে ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দেব না। ইন্দোনেশিয়াকে নয়, বাংলাদেশকে বাদ দিন।[২২]

১৯৭৫ সালের ১০ জানুয়ারি কিসিঞ্জার যেখানে বাংলাদেশকে বাদ দিতে বলছেন, সেখানে ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রদূত বোস্টার ঢাকায় মুজিবকে আশ্বস্ত করছেন। দুর্ভিক্ষের করাল থাবা তখন গোটা দেশে প্রসারিত।

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি। প্রাপ্ত দলিলটিতে কোনো তারিখ নেই। দিনটি ছিল শনিবার। শেখ মুজিব এ দিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টারের সঙ্গে ৪০ মিনিট ধরে কথা বলেন। বোস্টারের সঙ্গে মার্কিন পলিটিক্যাল কাউন্সিলর কোচরান ছিলেন। বোস্টার কিসিঞ্জারকে লিখেছেন :

পিএল ৪৮০-এর আওতায় আমি মুজিবকে অতিরিক্ত সাড়ে তিন লাখ টন গম সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্তের কথা বললাম। মুজিব শুনে আশ্বস্ত হলেন। তিনি ভাবলেন, অন্তত জুন পর্যন্ত এই গম দিয়ে পরিস্থিতি সামলানো যাবে। তিনিও এ সময়ের মধ্যে সোয়া লাখ টন গম আনতে পারবেন বলে জানালেন।

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে পড়েছিল যে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হোসেন আলী আন্ডার সেক্রেটারি জোসেফ সিসকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'কোনো শর্ত ছাড়াই বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে যেকোনো পর্যায়ে বৈঠকে বসতে চায়। তার অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই সঙিন যে, তার আর কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ নেই।'[২৩]

---

২১. মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, রিভিউ অথরিটি : রবার্ট এল ফুনসেথ, তারিখ/কেস আইডি : ৫ মার্চ ২০০৩, ২০০১০২৯৭৯।

২২. টেলিকন, রিভিউ অথরিটি রবার্ট এইচ মিলার, তারিখ/ কেস আইডি : ২২ ডিসেম্বর ২০০৪, ২০০১০২৯৭৯।

২৩. ডকুমেন্ট নং স্টেট০২৬২২৭।

বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন সচিব সাইদুজ্জামান ওয়াশিংটনে কিসিঞ্জারের জন্য একটি চিঠি এবং বাংলাদেশের আর্থিক সংকট নিয়ে একটি স্মারক বয়ে নিয়ে যান। এতে উল্লেখিত সাহায্যের আবেদনের প্রতি বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ঔদার্যপূর্ণ সাড়া আশা করে। ১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই বাংলাদেশ প্রতিনিধি ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি লেইনজেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[২৪]

জোসেফ সিসকোর বর্ণনায় :

> ১৯৭৪ সালের ৮ জুলাই হোসেন আলী অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আথারটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশ-পাকিস্তান উত্তেজনা প্রশমনে মুজিব-ভুট্টো শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের সাফল্য তুলে ধরেন। হোসেন আলী বলেন যে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরকালে সম্পদ বণ্টন ও বিহারি প্রত্যাবাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বাস্তবে এর মানে হলো দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত আলোচনাকালে স্বল্প মেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও খাদ্যসংকট মোকাবিলায় মার্কিন সরকারের সহায়তা কামনা করেন। হোসেন আলী বর্তমান এবং নভেম্বর/ডিসেম্বরের আউশ/আমন ধান ওঠার মধ্যকার খাদ্য-পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। আথারটন তাঁকে বলেন যে, ১৯৭৪ অর্থবছরে প্রদেয় সর্বশেষ ৭৩ হাজার টন গমের চালান যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিগগিরই বাংলাদেশের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা। তবে আথারটন রাষ্ট্রদূত আলীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, কিউবার সঙ্গে চটের বস্তা রপ্তানি ইস্যুর সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত পিএল ৪৮০-এর অধীনে বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন কোনো চুক্তি করা যাবে না।[২৫]

১৯৭৪ সালের ২৭ জুলাই মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট রবার্ট এস ইঙ্গারসল এক বার্তায় লিখেছেন, সাইদুজ্জামানের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার আগে কিউবায় পাটের বস্তা সরবরাহ শেষ হবে না। ১৯৭৪ সালের ১৫ আগস্ট কিসিঞ্জার ঢাকার মার্কিন দূতাবাসকে জানান, 'পিএল ৪৮০ কর্মসূচির আওতায় এক-চতুর্থাংশ খাদ্য বণ্টনের প্রথম ঘোষণা আগামী সপ্তাহে দেওয়া হবে। তবে বস্তা রপ্তানি ইস্যুর সুরাহা হতে হবে। বাংলাদেশ থেকে কিউবায় সর্বশেষ পর্যায়ের রপ্তানির সমাপ্তি ঘটলেই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে তা

---

২৪. ডকুমেন্ট নং ১৯৭৪স্টেট১৬৩৭০৮।
২৫. ডকুমেন্ট নং ১৯৭৪স্টেট১৪৬১৪৬।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জানাতে হবে।’[২৬]

১৯৭৪ সালের ২৯ আগস্ট সাইদুজ্জামান মার্কিন এইড সমন্বয়ককে বলেন, চটের বস্তাবাহী সর্বশেষ জাহাজ কিউবার উদ্দেশে সেদিনই বাংলাদেশের জলসীমা পেরিয়ে গেছে। বোস্টার এই খবর ওয়াশিংটনকে জানিয়ে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ সরকার আশা করে যে, এর ফলে পিএল ৪৮০-এর আওতায় বাংলাদেশের জন্য ভোজ্য তেল ও খাদ্যশস্য ছাড় সহজ হবে।’[২৭]

১৯ আগস্ট ১৯৭৫। শেখ মুজিব হত্যার মাত্র চার দিন পেরিয়েছে। রাষ্ট্রদূত হোসেন আলী ওয়াশিংটনে আথারটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডে তাঁরা উভয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। একপর্যায়ে হোসেন আলী নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে ১৯৭১ সালে কলকাতায় তাঁর ‘ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের’ কথা উল্লেখ করেন। হোসেন আলীর বর্ণনায়, মোশতাক ‘ধার্মিক, সৎ এবং অকপট’। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, হোসেন আলী ও আথারটন উভয়ে একমত হন যে, পিএল ৪৮০-এর আওতায় বাংলাদেশকে খাদ্যসহায়তা দিতে দ্রুত উভয় দেশের সমঝোতায় পৌঁছানো খুবই কাঙ্ক্ষিত।[২৮]

মি. আথারটন ঢাকায় কিসিঞ্জারের সফরসঙ্গী ছিলেন। কিসিঞ্জারের সফরসঙ্গী প্রেস টিমটি দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য স্থাপিত একটি লঙ্গরখানা পরিদর্শন করেছিল বলে বোস্টার এক তারবার্তায় উল্লেখ করেন।[২৯]

খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এম আর সিদ্দিকীকে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে তিনি বোস্টারের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় তিনি ফারুক-রশিদ গ্রুপের শঙ্কার কথা বোস্টারের কাছে পৌঁছে দেন।

১৯৭৫ সালের ১৯ আগস্ট বোস্টার ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো বার্তায় উল্লেখ করেন :

> বৈঠকের শেষ পর্যায়ে সিদ্দিকী বলেন, তাঁর ‘তরুণ বন্ধুরা’ কয়েক দিন ধরে সম্ভাব্য ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় খুবই বিচলিত বোধ করছেন। ওই তরুণ বন্ধুরা ভাবছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কতিপয় বৃহৎ শক্তি যদি নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিত, তাহলে ওই আশঙ্কা হ্রাস

---

২৬. তারবার্তা নং ১৯৭৪স্টেট১৭৯০৫৩।
২৭. তারবার্তা নং ১৯৭৪ঢাকা০৩৮৭৭।
২৮. তারবার্তা নং ১৯৭৫স্টেট১৯৭৩৪০।
২৯. তারবার্তা নং ১৯৭৪ঢাকা০৪৮৯০।

পেত। সিদ্দিকী মনে করেন, ওই উদ্দেশ্যেই তাঁরা (মেজরদ্বয়) আমাদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এবং মেজররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে আগাম স্বীকৃতির বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে একটা আশ্বাস আশা করেন।

বোস্টার লিখেছেন :

আমি সিদ্দিকীকে বললাম, ওই ধরনের অনুরোধ নিয়ে দূতাবাসের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি। তবে মোশতাক সরকারকে আমরা এই মুহূর্তে কীভাবে মূল্যায়ন করছি, তা আমি তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, আমরা এখন নতুন সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছি এবং আমরা তা অব্যাহত রাখার আশা রাখি। আমি এ বিষয়ে তারবার্তা থেকে পাওয়া স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্রের ১৮ আগস্টের প্রেস বিবৃতির একটি কপিও তাঁকে দিলাম।

সিদ্দিকী তার পরও আমার কাছে জানতে চাইলেন, ভারতের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে বলে আমি মনে করি? বললাম, আমি এ পর্যন্ত যত বক্তব্য পড়েছি তাতে মনে হয়, ভারত যুক্তিসংগত কারণেই ঢাকার সরকার পরিবর্তনের বিষয়টিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মনে করে। এবং কোনোভাবেই এটা মনে করার কারণ নেই যে তারা অন্য কোনো উপায়ে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।

আমাদের আলোচনার উল্লিখিত অংশটি সম্ভবত এ কারণে যে, সিদ্দিকী মোশতাক সরকারকে আগাম স্বীকৃতি প্রদানে আমাকে অনুরোধ করেছেন, সে বিষয়টি তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারীদের অবহিত করতে চান। সিদ্দিকী মেজর রশিদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। রশিদ অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি।

১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ কিসিঞ্জার এই বার্তাটি পাঠান :

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে পিএল ৪৮০ আইনের ওই ধারা সংশোধন করা হয়েছে। আমরা প্রেসিডেন্টের কাছে এই সুপারিশ রাখতে যাচ্ছি যে, তিনি যেন বাংলাদেশ প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ নির্দিষ্ট করেন। বাংলাদেশ যদি কিউবায় রপ্তানি পুনরায় শুরুও করে, তাহলেও আমরা 'টাইটেল ওয়ান অব পিএল ৪৮০'-এর অধীনে তার কাছে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারব। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগবে। এই পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আনলে আপনাকে তা অবহিত করব।[৩০]

---

৩০. তারবার্তা নং ১৯৭৬স্টেট০৬১৫৫১।

সিআইএ, নাকি সরকারি মহল

লরেন্স লিফশুলজসহ অনেকে শেখ মুজিব হত্যায় নির্দিষ্টভাবে সিআইএর নাম উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে তা উহ্য রেখে ওয়াশিংটনের সরকারি মহলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ক্রিস্টোফার এরিক হিচেন্স লিখেছেন :

> চুয়াত্তরের নভেম্বরে কিসিঞ্জার দক্ষিণ এশিয়ায় এক মুখরক্ষার সফরে গিয়ে বাংলাদেশে আট ঘণ্টার যাত্রাবিরতি করেন এবং এখন আমরা জানতে পারছি যে, এর পরপরই ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের একাংশ গোপনীয়ভাবে মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররত একদল বাংলাদেশি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। ওই সময়ে সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটি তৃতীয় বিশ্বে সিআইএ পরিচালিত নাশকতা ও হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তদন্ত করছিল। চিলিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এড কোরির মতো কোনো রাষ্ট্রদূত লক্ষ করতে পারেন যে, 'টু ট্রাক' ধারণার বাস্তবায়ন তাঁর অজান্তেই ঘটে গেছে। তাঁরই মাথার ওপর দিয়ে দূতাবাসের গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও সামরিক অ্যাটাশেদের কাছে ওয়াশিংটনের গোপন নির্দেশনা আসে এবং তারা তাদের মতো করে তার বাস্তবায়ন ঘটায়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের লরেন্স লিফশুলজ তাঁর সম্পূর্ণ গবেষণায় এখন দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করছেন যে, বাংলাদেশেও ওই 'টু ট্রাক' বা দ্বিমুখী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল।[৩১]

পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন সাংবাদিক সেইমুর হার্শ ১৯৮৩ সালে প্রকাশ করেন তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ *দ্য প্রাইস অব পাওয়ার : কিসিঞ্জার ইন দ্য নিক্সন হোয়াইট হাউস*। এ বইয়ে তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিষয়ে নিক্সন প্রশাসনের ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করেন। হার্শই হলেন সেই অনুসন্ধানী সাংবাদিক, যিনি বিদেশি সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা কিংবা তাদের সরকার উৎখাতে সিআইএ তথা মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে আলোড়ন তুলেছিলেন। তবে হার্শ গভীরভাবে একাত্তরে ভারত-পাকিস্তানের ঘটনাবলির দিকে নজর রাখলেও তিনি শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড বিষয়ে বিস্তারিত লেখেননি। লিফশুলজ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়াশিংটনের যেসব চরিত্র চিত্রণে প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁদের অনেককেই হার্শ ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। তিনি তাঁর পেশাগত কারণে তাঁদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন।

---

৩১. *দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার*, পৃ. ৫১।

সেইমুর হার্শের মূল বইয়ে নয়, মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর বইয়ের নোটস পরিশিষ্ট অংশে। সেইমুর হার্শের লেখায় বিষয়টি এসেছে এভাবে, 'একাত্তরের যুদ্ধের বিষয়ে জ্যাক অ্যান্ডারসনের হস্তগত হওয়া কেব্‌লগুলোর সবটাই তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। এমনকি তাতে এমন কিছু দলিলও ছিল, যা তখন তিনি প্রকাশ করেননি। নিক্সন-কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে যে 'ভুয়া আশা' দিয়েছিলেন, জি ডব্লিউ চৌধুরী আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর অব্যাহত অস্ত্র সরবরাহ এবং পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি আগ্রাসন সম্পর্কে প্রমাণের জন্য দেখুন, ১৯৭১ সালের ৫ অক্টোবরে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ লিউস এম সাইমন্সের 'পাকিস্তানের সঙ্গে কেনেডির দুটি অস্ত্রচুক্তি উন্মোচিত'। মোরারজি দেশাই তাঁর *আমার জীবনের গল্প* (এস চান্দ অ্যান্ড কোম্পানি, নিউ দিল্লি, ১৯৭৯) শীর্ষক বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে তাঁর তীব্র অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটান। বিশেষ করে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, ৫৭ পৃষ্ঠা থেকে শুরু 'ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্রকে নিষ্প্রভ করেছেন'। ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস থেকে বইগুলো সহজলভ্য। কতিপয় প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে সংঘটিত তাঁর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একটি আমেরিকান-সংশ্লিষ্টতা ছিল। এ জন্য দেখুন ১৯৭৯ সালের ১৫ আগস্ট *দ্য গার্ডিয়ান*-এ প্রকাশিত লিফশুলজের নিবন্ধ, 'শেখ মুজিবকে উৎখাতে সেনা অভ্যুত্থানের নেপথ্যের চক্রান্ত'।[৩২] হার্শ অবশ্য এ প্রসঙ্গে কাই বার্ডের সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা লিফশুলজের *বাংলাদেশ: দি আনফিনিশড রেভল্যুশন* বইটিরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্ট্যানলি হফম্যান ১৯৮৩ সালের ৩ জুলাই *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ লিখেছেন, মি. হার্শকে সবেচেয়ে বেশি যা মুগ্ধ করেছে এবং তাঁর গবেষণাগ্রন্থের যেটি মূল আকর্ষণ, তা হলো 'ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিরাজনীতি এবং ব্যক্তিগত প্রেষণা—নিক্সন প্রশাসনের ভেতরের এসব অন্ধকার দিক উন্মোচন করা। আর এ ক্ষেত্রে মুখ্য চরিত্রটি হলেন কিসিঞ্জার।' সেইমুর হার্শ তাঁর গ্রন্থে লিফশুলজ ও হিচেন্স-বর্ণিত উল্লিখিত 'ট্রাক-টু' ধারণাকে নিশ্চয় আরও শক্ত ভিত্তি দিয়েছেন। মি.

---

৩২. *The Price of Power, Kissinger in the Nixon White House*, Seymour M. Hersh, Summit Books, 1983 P. 659.

হফম্যান এ বিষয়ে লিখেছেন, হার্শের গল্প অনেক পরিমাণে কিসিঞ্জারকে ছাপিয়ে গেছে। তিনি এমন এক নিক্সন প্রশাসনের চিত্র সামনে এনেছেন, যেটির কার্যক্রম মাফিয়াদের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে কাজ করতে গিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের গলা কাটতে সচেষ্ট। পল নিটজ ছিলেন 'সলট নেগোসিয়েশন' টিমের সদস্য। নিক্সন তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অর্থাৎ কিসিঞ্জারকে এড়িয়ে তিনি যেন সরাসরি তাঁর কাছে রিপোর্ট করেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে পররাষ্ট্র দপ্তরকে কিছুই জানানো হতো না। বায়াফ্রা, চীন ও বার্লিন-বিষয়ক আলোচনায় তাদের অগ্রাহ্য করা হয়। কম্বোডিয়ায় আগ্রাসনের সময় উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বিষয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেলভিন লেয়ার্ডকে অন্ধকারে রাখা হয়। চিলির সালভাদর আয়েন্দের বিরুদ্ধে প্রশাসনের গোপন কৌশল ঠিক করতে তথাকথিত ৪০ কমিটি নামে একটি আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি করা হয়েছিল। কিন্তু নিক্সন প্রশাসনের মুখ্য খেলোয়াড়গণ ওই কমিটিকে প্রায়শ উপেক্ষা করেছেন।' সেইম্যুর হার্শ যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তা হলো, কিসিঞ্জার অব্যাহতভাবে জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশনীতি-সংক্রান্ত সরকারের সমস্ত হাতিয়ার সম্পূর্ণ নিজের কবজায় রাখতেন। নিক্সন আমলাতন্ত্রকে বিশ্বাস করতেন না, তাই তিনি এমন দ্বিমুখী ব্যবস্থাই চাইতেন। আর কিসিঞ্জার তা চাইতেন, কারণ এটাই তাঁর চরিত্র। হার্শ মনে করেন, মিসর-ইসরায়েল যুদ্ধ কিংবা সত্তরের সেপ্টেম্বরের জর্ডান-সংকটের মতো ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধও ছিল এক 'স্থানীয় সংকট'। হার্শ নিক্সন-কিসিঞ্জারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'অথচ এই স্থানীয় সংকটগুলোকে তারা সোভিয়েত-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাতাবরণে যথেষ্ট রং চড়িয়ে দেখেছেন এবং সেভাবেই তা মোকাবিলার প্রয়াস পেয়েছেন।'[৩৩]

পিটার ডেল স্কট একজন সাবেক কানাডীয় কূটনীতিক ও সাংবিধানিক আইনজীবী, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনাও করেছেন। ২০০৮ সালে তিনি লিখেছেন :

> লিফশুলজের 'সতর্ক গবেষণার' ভিত্তিতে হিচেন্স লিখেছেন, ১৯৭৪ সালে

---

৩৩. নিক্সনটেপসডটঅর্গের প্রতিষ্ঠাতা টেক্সাস আ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক ড. লিউক এ নিখটার এবং বর্তমানে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ড. রিচার্ড এ মসের লেখা এক যৌথ নিবন্ধেও বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। এই লেখক তাঁদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন।

কিসিঞ্জারের সংক্ষিপ্ত বাংলাদেশ সফরের পরে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের একটি অংশ গোপনীয়তার সঙ্গে একদল বাংলাদেশি কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করতে শুরু করেন। ওই কর্মকর্তারা মুজিবুরের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন।[৩৪]

লিফশুলজের সঙ্গে বোস্টারের ১৯৭৫ সালের কথোপকথনের বরাত দিয়ে রবার্ট এস অ্যান্ডারসন ২০১০ সালে বলেছেন, 'বাংলাদেশ অভ্যুত্থান সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর যে শঙ্কা ছিল, সেটা অন্যান্য সূত্র থেকেও তিনি পেয়েছিলেন। যেমন তাঁর নিজের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলেছে, সে বিষয়ে তিনি সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকেও ধারণা পেতেন।'[৩৫]

জান্নিকি অ্যারেন্স ১৯৯৭ সালে লিখেছেন, সপরিবারে মুজিব হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি প্রায় নিশ্চিতভাবেই সিআইএর সহায়তায় ঘটেছে।[৩৬]

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ড. পামেলা কে গিলবার্ট ২০০২ সালে লিখেছেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছিল এবং এ অঞ্চলের মানুষ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগের জন্য এটি একটি শান্তির এলাকা হবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু তাদের এই আশাবাদ সিআইএর হাতে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পর্যুদস্ত হয়। সিআইএ মুজিব হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালিদের ব্যবহার করেছিল।'[৩৭]

১৯৭৮ সালে ভারতের ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস তাদের সাময়িকীতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেছে, 'মুজিব তাঁর হত্যাকাণ্ডের আগে তাঁর জন্য ঝামেলা পাকানোর দায়ে সিআইএকে অভিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সে আশঙ্কা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তাঁকে যারা হত্যা করে, তারা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যরা পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পাকিস্তানে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিল।[৩৮]

---

৩৪. *The Road to 9/11 Wealth, Empire, and the future of America* Peter Dale Scott , University of California Press, 2008, P. 43.

৩৫. *Nucleus and Nation : Scientists, International Networks, and Power in India*, By Robert S. Anderson, Page-502-503 and 658, University of Chicago Press, 2010.

৩৬. *Winning Hearts and Minds Foreign Aid and Militarisation in the Chittagong Hill Tracts*, Janneke Arens, *Economic And Political Weekly,* vol. 32, No. 29 (July, 19-25, 1997), P. 1811-1819.

৩৭. *Imagined Londons*, Pamela K. Gilbert, Sunny Press, 2002 P. 164.

৩৮. *IDSA Journal, Vol. II*.

চার্চ ও পাইক কমিটি

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড যে সময়টায় ঘটে সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদেশি নেতাদের হত্যাকাণ্ড সংঘটনের অভিযোগ নিয়ে খোদ মার্কিন কংগ্রেসই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এ সময় সিআইএ ও এফবিআইয়ের গোপন মিশনের তদন্তে দুটি কমিটি হয়েছিল। একটির নেতৃত্ব দেন সিনেটর ফ্রাংক চার্চ। এটি চার্চ কমিটি হিসেবে পরিচিত। ১৯৭৫ সালের ২৭ জানুয়ারি সিনেট এই কমিটি গঠনের পক্ষে ভোট দেয়। অন্য দিকে, ১৯৭৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি হাউস যে একটি সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটি গঠন করেছিল, পাঁচ মাস পর তা-ই 'পাইক কমিটি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসে প্রথম গোয়েন্দা তদারকির জন্য স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এর আগে স্থায়ী কমিটি ছিল না। কংগ্রেসম্যান ওটিজ জি পাইক ১৯৭৫ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সিলেক্ট কমিটি অন ইন্টেলিজেন্সের সভাপতি ছিলেন। চার্চ কমিটির মতো তারাও ওই দুটি শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্তে নামে। এই পাইক কমিটি প্রচণ্ড বিরোধিতার কবলে পড়ে। ১৯৭৬ সালে চার্চ কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ পেলেও পাইক প্রতিবেদন কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

লিফশুলজ তাঁর বইয়ে এই কমিটি দুটির কথা উল্লেখ করলেও তাদের নজরদারিতে মুজিব হত্যাকাণ্ড কোনোভাবে বিবেচ্য ছিল কি না, তা উল্লেখিত হয়নি। অন্যান্য সূত্রেও এ বিষয়ে লেখকের পক্ষে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। কিসিঞ্জার এই কমিটিকে সহযোগিতা করতে এসে যথাসাধ্য তাদের খাটো করার চেষ্টা চালান বলে অভিযোগ ওঠে। এবং কমিটি যাতে নথিপত্র না দেখতে পায়, সে জন্য তিনি সর্বাত্মক তৎপরতায় নিয়োজিত হন। কিসিঞ্জারের সহকারী উইলিয়াম হিল্যান্ডের কথায়, 'পাইক কার্যক্রম চালানো একটা "অসম্ভব" ব্যাপার।' ১৯৭৫ সালের ৪ আগস্ট পাইক শুনানিকালে এই বলে হতাশা ব্যক্ত করেন যে, 'আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, সব জায়গা থেকে সহযোগিতার আশ্বাসসূচক বায়বীয় কথাবার্তা। কিন্তু বিপুল পরিমাণ অসহযোগিতামূলক কার্যক্রম।'[৩৯]

কমিটির অন্য সদস্যরা বলেন, হোয়াইট হাউস বা এজেন্সির কাছ থেকে দলিলপত্র পাওয়া 'দাঁত টেনে তোলা'র শামিল।

---

৩৯. *House Select Committe on Intelligence, US Intelligence Agencies Activities Intelligence Costs* (Washington DC, GPO, 1975, P. 169).

পঁচাত্তরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাইক-সিআইএ সম্পর্ক নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছায়। সিআইএর রিভিউ স্টাফ লক্ষ করেন যে, পাইক কমিটির চাহিদা 'বোকার মতো' এবং তথ্য সরবরাহের জন্য তাদের বেঁধে দেওয়া তারিখ মানা দুঃসাধ্য। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারা সিআইএর গোপন মিশনের 'প্রত্যেক ও সকল নথি' চেয়ে পাঠায়। কোনো কোনো বিষয়ের নথি 'যদি সম্ভব হয় তাহলে আজই' সরবরাহ করতে বলা হয়। সিআইএ যুক্তি দেয়, এমন সময়সীমা তো মানা সম্ভব নয়।

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ধকল মোকাবিলার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১১ মে নিক্সন তাঁর মন্ত্রিসভা রদবদলের সময় এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, সিআইএ পরিচালক জেমস স্লেসিঙ্গার হবেন পরবর্তী প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আর তাঁর শূন্য পদে আসবেন পেশাদার সিআইএ কর্মকর্তা উইলিয়াম কলবি। প্রিন্সটনের স্নাতক ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রিধারী কলবি সিআইএর পরিচালক হিসেবে ১৯৭৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর শপথ নেন। কিন্তু তিনি দায়িত্ব নেওয়ার সপ্তাহ না ঘুরতেই বিদেশে বিভিন্ন মিশন পরিচালনায় এজেন্সির ভাবমূর্তি সংকটে পড়ে। কংগ্রেস ও মিডিয়া অভিযোগ করে যে, সিআইএ বিদেশি রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছে। চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদর আয়েন্দের উৎখাতও তাদের কারসাজির ফল। ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড কলবিকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। তবে দায়িত্ব ছাড়তে কলবির ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৬ লেগে যায়। কারণ, তাঁর উত্তরসূরি জর্জ বুশ (সিনিয়র) এ সময় ছিলেন চীনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত। ৫১ বছর বয়স্ক বুশই ছিলেন সিআইএর ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া পরিচালক। বুশ বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্বে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

সোলার্জের সঙ্গে যোগাযোগ

১৯৮০ সালে লিফশুলজ শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডে মার্কিন সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একসময়ের আলোচিত মার্কিন কংগ্রেসম্যান স্টিফেন জে সোলার্জকে একটি চিঠি দেন। এরপর সোলার্জ ১৯৮০ সালের ৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের লেস এসপিনকে লেখেন, 'বাংলাদেশে সিআইএর কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্তের এখতিয়ার শুধু ইন্টেলিজেন্স-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির হাতেই আছে। এটা পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কমিটির কাজ নয়। তাই

আমি এটা আপনার কাছে প্রেরণ করছি।' সোলার্জ একই তারিখে লিফশুলজকেও লেখেন, 'আমি মনে করি, আপনার আনীত অভিযোগ এই বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট যে, মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএর সম্পৃক্ততার প্রশ্নটি নতুন করে তদন্তের দাবি রাখে।' তবে বাংলাদেশে ওই সময়ে কর্মরত ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন লিফশুলজের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রতিটি পর্যায়ে সত্য গোপন ও আলামত নিশ্চিহ্নকরণে গোয়েন্দা সংস্থার যে বিপুল সামর্থ্য, তার আলোকে বলা চলে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের বৈধ তদন্ত-প্রক্রিয়া কঠিন হবে বলেই মনে হয়।'[৪০]

১৯৮০ সালের শীতকালে লিফশুলজ কংগ্রেস সদস্য স্টিফেন সোলার্জের তরুণ সহকারী স্ট্যানলি রথের কাছ থেকে একটি ফোন পান। তাঁর কথায়, শেখ মুজিবুর রহমান যে অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন, সেই অভ্যুত্থানের ব্যাপারে দুবছর ধরে চালানো আমার অনুসন্ধানের ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্তসার আমি স্টিফেন সোলার্জকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম। ফোনটি তারই জবাব হিসেবে আসে। স্ট্যানলি রথ ১৯৭৯ সালে সোলার্জের পররাষ্ট্রবিষয়ক মুখ্য সহকারী হিসেবে যোগ দেন। এই পদে তিনি ১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেসের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির এশিয়া-বিষয়ক হাউস কমিটিতে স্টাফ কনসালট্যান্ট হিসেবে যোগ দেন।

১৯৯৭-২০০১ সালে তিনি ক্লিনটন প্রশাসনে এশিয়া-বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। '২০ বছর আগে তরুণতর ও সম্ভবত সে জন্য আরও অনুসন্ধিৎসু রথ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বিষয়টি নিয়ে কীভাবে এগোনো যায় বলে আমি মনে করি'—২০০০ সালের এক নিবন্ধে লিখেছেন লিফশুলজ।

পররাষ্ট্র দপ্তর স্পষ্ট জানায় যে পূর্বযোগাযোগ ছিল। ১৯৮০ সালের ৩ জুন সোলার্জ লেখেন, '১৯৭৪-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর জানুয়ারির মধ্যে (মুজিবুর) রহমান সরকারের বিরোধীদের সঙ্গে দূতাবাসের বৈঠকের ব্যাপারে পররাষ্ট্র দপ্তর আবারও অস্বীকার করছে না যে বৈঠক হয়েছিল।'

এসপিনের কাছে চিঠিতে সোলার্জ লেখেন :

> যদিও আমি লিফশুলজের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত করেছি, তবু আমি যেসব উত্তর পেয়েছি তাতে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। বিশেষ করে, ১৯৭৫-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর

---

৪০. *বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভল্যুশন*, পৃ. ১৭৭।

আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে সিআইএর যোগাযোগের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিযোগ স্বীকারের বা খারিজ করে দেওয়ার মতো উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ খুঁজে পেতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি লিফশুলজের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে, এসব পরিকল্পনার কথা যুক্তরাষ্ট্রের আগে থেকেই জানা ছিল কি ছিল না—এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা কংগ্রেসের তলব করার ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে সিআইএর কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত চালানো পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির চেয়েও গোয়েন্দাবিষয়ক স্থায়ী সিলেক্ট কমিটির অধিকারের মধ্যে স্পষ্টভাবে পড়ে বলেই লিফশুলজের দেওয়া তথ্য আপনার কাছে পাঠালাম। আশা করি, আপনি এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।

১৯৮০ সালের ৮ অক্টোবর সোলার্জের চিঠির জবাবে লিফশুলজ লেখেন :

পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাকে যাঁরা জবাব দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত করে আমি বিশ্বাস করি, যে পদ্ধতিতে, যে কায়দায় এবং যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল—সে ব্যাপারে কিছু গোলমাল আছে। এবং আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, পররাষ্ট্র দপ্তরে বেশ কিছু নীরব কর্মকর্তা আছেন, যাঁরা শুধু ১৯৭১-এ যে পদ্ধতিতে এবং যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগগুলো হয়েছিল, তা নিয়েই বিচলিত নন, চার বছর পর ওই একই গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানো পর্যন্ত নতুন করে গোপন যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি নিয়েও বিচলিত। সে জন্য ওই নীরব থাকা কর্মকর্তাদের প্রশ্ন, এই যোগাযোগ আমাদের কেন ছিল? কী উদ্দেশ্যে ছিল?

পররাষ্ট্র দপ্তর এখন ১৯৭৪-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর জানুয়ারির মধ্যে দূতাবাসের বৈঠকের কথা নিশ্চিত করেছে। এই স্বীকারোক্তির গুরুত্ব আমি কীভাবে দেখি তা আমি আগেই জানিয়েছি। আপনার চিঠিতে আপনি লিখেছেন, 'পররাষ্ট্র দপ্তরের দাবি যে, অভ্যুত্থানের আশঙ্কাসহ সেসব বৈঠকের ব্যাপারে (মুজিবুর) রহমানকে জানানো হয়েছিল।' কিন্তু আমাদের সূত্রগুলো যা বলেছে তার সঙ্গে এই দাবি কোনোমতেই মেলে না। এ ব্যাপারে আরও গভীরভাবে তদন্ত চালানোর জন্য আমি আপনার কাছে আরজি জানাচ্ছি। আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমি বহু লোকের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করি এবং এ বিষয়টিতে দেখা যাচ্ছে তারা সবাই একমত। আপনাকে এ ব্যাপারে হয় কৌশলে বিপথে চালিত করা হয়েছে অথবা চিঠির ভাষায় কথার মারপ্যাঁচে মূল বিষয়টিকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়েছে। মোদ্দা কথা হলো, অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে মুজিব সরকারের কাকে জানানো হয়েছিল? মুজিবুর রহমানকে কি এসব বৈঠকের কথা সরাসরি জানানো হয়েছিল? কে জানিয়েছিল? কোন পরিস্থিতিতে জানিয়েছিল? আর মুজিব সরকার এই অভ্যুত্থানের ব্যাপারে যদি

ভালোভাবে ওয়াকিবহালই থাকবে, তাহলে মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের এত সহজে হত্যা করা এবং এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া কি আশ্চর্যের নয়?

সোলার্জের কাছে লেখা চিঠিতে লিফশুলজ আরও উল্লেখ করেন :

আমরা কি এখানে গোয়েন্দা বিভাগের দ্ব্যর্থবোধক শব্দাবলি শুনছি? আর পররাষ্ট্র দপ্তরের জবাবের অর্থ কি এই যে, যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের আশঙ্কা সম্পর্কে মুজিব সরকারের কয়েকজন বিশেষ সদস্যকে জানিয়েছিল? যদি তা-ই হয়, তাহলে এর অর্থ কী দাঁড়ায়, যেখানে বস্তুতপক্ষে সরকারেরই একটি অংশ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে? এই অভ্যুত্থান ছিল মুজিবের নিজের দল, তাঁর মন্ত্রিসভা ও তাঁর নিজস্ব জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কট্টরপন্থীদের অভ্যন্তরীণ কাজ। এদের সকলের আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক অতীত সম্পর্ক ছিল। এখন তাহলে পররাষ্ট্র দপ্তর কি এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, এসব লোকের মধ্যেই একজনকে অভ্যুত্থানের আশঙ্কার ব্যাপারে দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল? এখানে আমার সেই পুরোনো গল্প মনে পড়ছে যে দিয়েম সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ ভাষায় 'বিপদ হতে পারে' বলে হুঁশিয়ার করেছিল, যখন অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারী জেনারেলদের সদর দপ্তরেই কর্নেল ল্যান্ডসডেলের ইউনিটের একজন অফিসার ঢুকে বসেছিলেন। যে ধরনের ঘটনাবলি সম্পর্কে আমরা দিনের পর দিন উদাসীন থাকি তার দীর্ঘ অতীত আছে।

আপনি বলেছেন, অভ্যুত্থানের আশঙ্কাসহ তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে দূতাবাসের বৈঠকের বিষয় মুজিবকে আগেই জানানোর কারণে এই বৈঠকগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম ষড়যন্ত্রের আলোকে দেখা যেতে পারে। পররাষ্ট্র দপ্তরে আমাদের সূত্র এই সরকারি ব্যাখ্যার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে কোনটি সত্য তা উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব এখন কংগ্রেসের। এই বিবাদের ব্যাপারে কোনো তথ্য-প্রমাণ অর্থাৎ দলিল কি আপনি আমাদের দিতে পারেন? ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্টের আওতায় আমাদের এ-সংক্রান্ত তথ্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে, যা কিনা বিষয়টি মীমাংসা করতে পারত।

উল্লেখ্য যে, এই লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও লিফশুলজ বলেছিলেন, অবমুক্ত করা সংশ্লিষ্ট সব মার্কিন নথি তো আপনি দেখেননি। সবটা তাঁরা প্রকাশও করেননি। কিন্তু এখন অনেক তথ্য, বিশেষ করে সিআইএর বেশ কিছু নথিপত্র পাওয়ার পরও কিন্তু বলা যাচ্ছে না যে, বিষয়টি মীমাংসা করার মতো একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ ও ১৬ আগস্টে সিআইএ যেখানে বলছে, কারা অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত, তা-ই

তাদের জানা নেই, সেখানে ভবিষ্যতে কি এমন নথি বেরোবে যা এই বক্তব্যকে নাকচ করে দেবে?

লিফশুলজ অবশ্য সোলার্জকে লিখেছেন :

> এ ছাড়াও আমাদের আশঙ্কা, এ ঘটনার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে জড়িত কিছু সংস্থা ও ব্যক্তি এ-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইতিমধ্যে ধ্বংস করে ফেলে থাকতে পারে। তবে একমাত্র কংগ্রেস পদক্ষেপ নিলে এখনো যা টিকে আছে তা উদ্ধার করা সম্ভব। অপেক্ষাকৃত কম বা বেশি 'ষড়যন্ত্রের আলোকে' দেখার প্রশ্নে আমার কথা হলো, ভাসা ভাসা জবাবের বদলে আমি সবকিছুর খোলাখুলি জবাব চাই। ছোট প্রশ্নের ছোট জবাব জরুরি। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন কোনো অভ্যুত্থানের ঘটনা আমার জানা নেই, যার পেছনে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা ছিল না। সত্যি সত্যিই অনেক অনেক খোলামেলা অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটলে বিশ্বে খুব বেশি না হলেও কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার অন্তত আমরা বহাল রাখতে পারতাম।...
>
> আমার বিশ্বাস, পররাষ্ট্র দপ্তরের জবাব আসল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে বরং আরও অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক চিত্র পাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে (পুরোপুরি অস্পষ্ট হওয়ার বদলে) সংক্ষিপ্ত জবাব : যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুজিব সরকারকে কে তা জানিয়েছিল, মুজিব সরকারের কাকে এবং কখন (তারিখ) তা জানানো হয়েছিল? আমি সাহস করে বলছি, মুখের কাছে পাত্র নিয়ে আসার পর আমাদের বলা হবে যে, এই পানি 'ক্লাসিফায়েড', পানের জন্য নয়।

সোলার্জকে লিফশুলজ আরও লেখেন :

> ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ফিলিপ চেরির সাক্ষাৎকার নিই, অভ্যুত্থানের সময়ে যিনি ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে সিআইএর স্টেশন চিফ ছিলেন। সে সাক্ষাৎকারে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে দূতাবাসে কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা চেরি সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেন। সোলার্জকে আমি লিখলাম, পররাষ্ট্র দপ্তর এখন এসব বৈঠকের কথা স্বীকার করেছে। এদিকে চেরিও হয়তো নিজের মন্তব্যের ব্যাপারে আন্তরিক। তবে এখানে এমন পরস্পরবিরোধী ব্যাপারও থেকে থাকতে পারে যা কংগ্রেসের পুনঃতদন্তের যোগ্যতা রাখে।
>
> যতক্ষণ পর্যন্ত 'ষড়যন্ত্রের আলোকে' বিষয়টিতে গোপন উদ্দেশ্য সাধনের কোনো ব্যাপার থাকবে ততক্ষণ এ ব্যাপারে উদ্বেগ থাকবে। আমি এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে পারি। *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর* দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৭৫ সালে এ অভ্যুত্থানের ব্যাপারে রিপোর্ট করার সময় আমি সঠিকভাবে মুজিব হত্যার সঙ্গে বিদেশি শক্তির [সিআইএর] জড়িত থাকার

ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর বক্রোক্তি ও মস্কোঘেঁষা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির অস্পষ্ট কথাবার্তা খারিজ করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু এ ব্যাপারে তৎকালীন ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত সিনিয়র কর্মকর্তারা এবং অভ্যুত্থানের বিষয়টি ভালোভাবে জ্ঞাত সামরিক ও বেসামরিক বাঙালি সূত্রগুলো নতুন তথ্য দেওয়ার পর আমাদের আগের রিপোর্ট ও তার সিদ্ধান্তগুলো পুনরায় খতিয়ে দেখা জরুরি হয়ে পড়ল। সুতরাং আমরা স্বীকার করতে পারি যে, ১৯৭৫-এর ঘটনার সঙ্গে কোনো রকম ষড়যন্ত্রের কথা আমরাই প্রথম খারিজ করে দিই এবং এ ঘটনাকে ছয়জন জুনিয়র অফিসার ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩০০ সৈন্যের একতরফা কাজ বলে বর্ণনা করি। আমরা ভুল করেছিলাম।

শেষ আরেকটি পয়েন্ট। এমন আর কোনো ভুল-বোঝাবুঝি যেন না ঘটে যা বর্তমান মূল বিবেচ্য বিষয়গুলোকে দূরে ঠেলে দেবে। মুজিব শাসনামলের যাথার্থ্য নিয়ে আমাদের তদন্তসমূহের কোনো মাথাব্যথা নেই। এসব আমরা তাঁর জীবনীকারদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। ১৯৭৪-এ আমি *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর* বাংলাদেশ প্রতিনিধি থাকার সময় কড়া সমালোচনামূলক লেখার জন্য মুজিব সরকার পত্রিকাটি তিনবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এমনকি ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে ঢাকায় এলে মুজিব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আমার সম্পাদককে কার্যত বলেন যে, তাঁর প্রতিনিধিকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি তাঁদের বিবেচনা করা উচিত।

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে সোলার্জ প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর-সম্পর্কীয় উপকমিটির চেয়ারম্যান হন। '৮১-র শরতে ওয়াশিংটনে সোলার্জের এক কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে লিফশুলজকে জানালেন, '১৯৭৫-এর আগস্টে ঢাকায় সংঘটিত ঘটনা তদন্তের টুঁটি খুব কৌশলে চেপে ধরা হচ্ছে।' এর বিবরণ দিয়ে লিফশুলজ লেখেন :

আমি দেখলাম, সোলার্জকে ধরতে পারা একেবারে অসম্ভব। মনে হলো, আমি যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, এ কথাটাই তাঁকে জানানো হবে না। এরকম একটা সময়ে আমি দরজার 'প্রহরীর' সঙ্গে দেখা করলাম। পরিহাসে ভরা সে এক অদ্ভুত মুহূর্ত। জানতে পারলাম, সোলার্জ সম্প্রতি সাবকমিটির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক কাজ দেখাশোনার জন্য উইলিয়াম জে বার্নসকে নিয়োগ দিয়েছেন।

শিয়ালের কাছে কেউ মুরগি পাহারা দিয়ে রেখে যেতে চাইলে বার্নস হচ্ছেন তার উপযুক্ত লোক। সিআইএর দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ হিসেবে বার্নস দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। একাধিক বইয়ে ও অন্যান্য প্রকাশনায় তিনি নিজের সিআইএ অফিসারের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। বার্নস সিআইএর

'বুড়ো খোকার দলের' একজন। আমাদের কথাবার্তার সময় তিনি কোনো ভড়ং করলেন না। সুস্পষ্ট ভাষায় আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, 'পূর্বযোগাযোগ'-এর ব্যাপারে কোনো পুনঃতদন্তে তার আগ্রহ নেই। কারণ, সোলার্জ বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। সর্বোপরি এ ব্যাপারে যাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছিল তাদের অর্ধেকই বার্নসের ব্যক্তিগত বন্ধু। আমি আরও বুঝতে পারলাম যে, সোলার্জ ও তার স্টাফের কিছু আগ্রহী সদস্যের ওপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। এই 'বুড়ো খোকা' ওয়াশিংটনে কেমন খেল দেখাতে পারেন সে ব্যাপারেও তাঁরা কিছু শিক্ষা পেয়েছেন। ওয়াশিংটনে উচ্চপদে আসীন হওয়ার কোনো স্বপ্ন থেকে থাকলে আপনাকে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির নিয়মকানুনে খেলতে শিখতে হবে। সোলার্জের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার আশা ছিল। সত্যি বলতে কি, প্রথমে ক্লিনটন সরকারে এ পদের জন্য তার নাম বিবেচনাও করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে গেলেন স্ট্যানলি রথ।

ঢাকায় সিআইএর তৎকালীন স্টেশন চিফ হিসেবে ফিলিপ চেরির নামটি সুনির্দিষ্টভাবে লিফশুলজ প্রকাশ করেন। লিফশুলজ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্টেট ডিপার্টমেন্টের সূত্র স্বীকার করেছে যে, যে গ্রুপটি মুজিবকে হত্যা করেছে, তাদের সঙ্গে ঢাকার সিআইএ দপ্তর যোগাযোগ রক্ষা করত। আপনার মন্তব্য কী?' চেরির জবাব ছিল, 'আমার জ্ঞাতসারে নয়। আমি তা মনে করি না। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কারা আপনাকে এ কথা বলল?' ১৯৭৮ সালে এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় লিফশুলজ চেরিকে জবাব দেন, 'আমি নির্দিষ্টভাবেই সূত্রগুলোর নাম বলতে পারি। কিন্তু তাঁরা নাম না প্রকাশের জন্য অনুরোধ করাতেই আমি বিরত থাকছি।' লরেন্স লিফশুলজ ও কাই বার্ড চেষ্টা করেও ওই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী, যেমন কিসিঞ্জার ও তাঁর সহকারী হ্যারল্ড এইচ স্যান্ডার্স এবং ভারত ও পাকিস্তানে নিযুক্ত সিআইএর স্টেশন চিফ উইলিয়াম গ্রিমসলি প্রমুখের সাক্ষাৎকার নিতে পারেননি। সিআইএ পরিচালক স্ট্যানসফিল্ড টার্নার (মার্কিন নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল, যিনি ৯ মার্চ ১৯৭৭ থেকে ২০ জানুয়ারি ১৯৮১ পর্যন্ত সিআইএর পরিচালক পদে ছিলেন) ওই কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ নাকচ করে দেন। এ বিষয়ে নিউ ইয়র্কভিত্তিক *দ্য নেশন*-এ লিফশুলজ ও কাই বার্ড যৌথভাবে যে নিবন্ধ লেখেন তার শিরোনাম ছিল 'একটি অভ্যুত্থানের গল্প: বাংলাদেশে কিসিঞ্জারের সাইডশো'। ১৯৮০ সালের ২১ জুনে প্রকাশিত এই নিবন্ধে লিফশুলজ ও কাই বার্ড লিখেছেন, 'বিশ্বে ক্ষমতার শক্তির যে নবতর বিন্যাস কিসিঞ্জার শুরু করেছিলেন, তার জন্য বাংলাদেশ একটি ঝামেলাপূর্ণ হুমকি

হয়ে ওঠে। এ জন্য তিনি আওয়ামী লীগ ভাঙার একটি গোপন কূটনীতি হাতে নেন। দলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পুরোভাগে ছিল।' কিন্তু লিফশুলজ ও কাই বার্ডের এই সিদ্ধান্ত মূলত কলকাতার 'পূর্বযোগাযোগের' ওপর ভিত্তি করে বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁরা বলেন, শেখ মুজিবের সামাজিক গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতে সেই দক্ষিণপন্থী গ্রুপটি সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয় যারা মার্কিন মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সঙ্গে গোপন সমঝোতার 'একাধিক' চেষ্টা চালিয়েছিল। *নেশনে* প্রকাশিত এই নিবন্ধের ক্লিপিং সিআইএর সংগ্রহে ছিল, যা তারা ২০১০ সালের ২৯ জুলাই অবমুক্ত করেছে। সিআইএর আর্কাইভ থেকেই লেখক এটি সংগ্রহ করেন। *দ্য নেশন*-এর সহকারী সম্পাদক কাই বার্ড ১৯৭৯ সালের ১৬ মে মুজিব হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে কিসিঞ্জারকে একটি চিঠি দেন। কিসিঞ্জারের তরফ থেকে তার কয়েক লাইনের জবাব : 'আমি ব্যতিক্রমী কিছুর মিশেল দেওয়া অভিযোগ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনার চিঠির বিষয়বস্তু সত্য থেকে বহু দূরে।'

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবমুক্ত করা মার্কিন গোপনীয় তারবার্তাগুলো থেকে দেখা যায়, মুজিব হত্যায় সিআইএর সম্পৃক্ততার অভিযোগ সম্পর্কে ১৯৭৫ সালে অভ্যুত্থানের পরপরই ভারতসহ বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশের সংবাদপত্রে বেশ কিছু প্রতিবেদন ও নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। কিন্তু তা থেকে মেজর ফারুক রহমান বা মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে আমেরিকান যোগাযোগ ঠিক কবে শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহে ফারুক রহমানের ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে গমন সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত, ঢাকার মার্কিন দূতাবাস তাদের ৩১৭২ ক্রমিকের (যার একমাত্র উল্লেখ এই বইয়ের লেখক এ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাইয়ের ৩১৫৬ ক্রমিকের তারবার্তায় লক্ষ করেন) তারবার্তায় ফারুক রহমানের ওই ইচ্ছা সম্পর্কে ওয়াশিংটনে তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরকে অবহিত করেছিল। ১৯৭২ সালে ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক যে হিমশীতল ছিল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বিকেল চারটায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স একটি তারবার্তা পাঠান ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল হারবার্ট স্পিভাকের কাছে। এ সময়টায় কিসিঞ্জার নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা সহকারী হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছিলেন। রজার্স প্রেরিত একটি বাক্যসংবলিত ওই তারবার্তা ছিল এরকম : 'বিদ্যমান পরিস্থিতির সংবেদনশীলতা ও নাজুকতার কারণে আপনি এখন থেকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আর যোগাযোগ

করা থেকে বিরত থাকবেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা যদি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন, তাহলে আপনি পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে নির্দেশনা নেবেন।' রজার্স।[৪১]

১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকার তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল স্পিভাক ঢাকা০১৫৮ নম্বর তারবার্তায় পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছিলেন যে, 'মুজিব ঘোষণা দিয়েছেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। কিন্তু ভুট্টো এই বাস্তবতা মানছেন না। সে কারণে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। সেটা সকলের নজরেও পড়বে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে সোভিয়েত ও তার মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করবে। তাই যথাশীঘ্র স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তবে আমরা সচেতন রয়েছি যে, এর বিপরীতেও অনেক যুক্তি থাকতে পারে। ঢাকায় বসে আমরা হয়তো তা মূল্যায়ন করতে পারছি না।'

১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল *বোকা রেটন নিউজ* পত্রিকা ইউপিআইর বরাতে জানায়, শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি না দেয়, তাহলে তিনি পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেট বন্ধ করে দেবেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র রবার্ট জে ম্যাকক্লস্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সের নামে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা প্রচার করেন। এই সিদ্ধান্ত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম জটিল সমস্যা ছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

জেনারেল আলেকজান্ডার হেগ প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। নিক্সন আমলে তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপসহকারী। ১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি ডেপুটি এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি রবার্ট এইচ মিলারকে জানান, 'বাংলাদেশের কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে ত্রাণ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কেউ যেন কোনো কথা না বলেন।' এটাও ঠিক যে এর পরপরই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সম্পর্কটা রাতারাতি এমন উষ্ণ হয়নি যে বাংলাদেশ সরকার অস্ত্র নিয়ে দামদস্তুর করতে একজন মেজরকে পাঠাবেন মার্কিন দূতাবাসে।

ফারুক-রশিদের অস্ত্র কেনার মিশন সম্পর্কে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের তৎকালীন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ড্যানিয়েল ও নিউবেরি ১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি বার্তা পাঠান। একই বিষয়ে নিউবেরি আবার লেখেন ১৯৭৩ সালের ২৭ আগস্ট। এসব বার্তা থেকে জানা যায়,

---

৪১. তারবার্তা নং সিক্রেট স্টেট০০১০৪৭।

১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ মার্কিন দূতাবাসে নাটকীয়ভাবে হাজির হন। তিনি এ দিন তথ্য দেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র কিনতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির নাম 'আরমামেন্টস প্রকিউরমেন্ট কমিটি'। কমিটির চেয়ারম্যান সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের তিন দশক পর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অবমুক্ত করা দলিল থেকে এ ধরনের তথ্য এই প্রথম জানা গেল। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ওই সময়ের সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি এই লেখককে বলেন, '১৯৭৩ সালে সেনাবাহিনীর অস্ত্র ক্রয়সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি তিনিই ছিলেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন না। এবং ফারুক-রশিদকে সমরাস্ত্র কেনাকাটা নিয়ে কথা বলতে মার্কিন দূতাবাসে পাঠানোর প্রশ্নই আসে না।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওই কমিটির একটি বৈঠকের কথা তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ে। সেনা সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সে বৈঠকে কর্নেল খালেদ মোশাররফ বসেছিলেন তাঁর ডানে। ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান বসেছিলেন বাঁয়ে। কিন্তু ওই বৈঠকে কিংবা এর আগে বা পরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের কোনো কথাই ওঠেনি। তিনি বলেন, 'ফারুক-রশিদ কোনো মিশনে গিয়ে থাকলে তা নিঃসন্দেহে সেনাশৃঙ্খলা ও আইনের পরিপন্থী বলেই গণ্য হওয়া উচিত।'

উল্লেখ্য, শেখ মুজিবের সাবেক এডিসি ও পরবর্তীকালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী এই লেখককে বলেছেন, ১৯৭৩ সালে ফারুক-রশিদের মার্কিন দূতাবাসে যাওয়াসংক্রান্ত মার্কিন দলিল জাল হতে পারে। সিআইএ অনেক ক্ষেত্রে এমন জাল-জালিয়াতি করে বলেও তিনি দাবি করেন। *প্রথম আলোতে* ২০০৯ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট এ বিষয়ে লেখকের একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপা হয়। এর ওপরে আরটিভি ২০০৯ সালের আগস্টেই একটি টক শোর আয়োজন করে। জেনারেল (অব.) সফিউল্লাহ, মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী ও লেখক এতে অংশ নেন। এ সময় মইনুল হোসেন চৌধুরী মার্কিন দলিলের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, সিআইএর মনগড়া নথিপত্র তৈরি করার রেকর্ড আছে। এসব দলিলকে তিনি ভুয়া বলেও দাবি করেন। জেনারেল সফিউল্লাহ তখন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। উল্লেখ্য যে, তর্কিত দলিলটি সিআইএর নয়, এটি ঢাকার মার্কিন দূতাবাস থেকে প্রেরিত একটি তারবার্তা।

অনির্ধারিত উপস্থিতি

দুই মেজরের অস্ত্র কেনার মিশন যে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে কিছুটা আলোড়িত করেছিল, তা বোঝা যায় ১৯৭৩ সালের ২৭ আগস্ট ড্যানিয়েল নিউবেরির গভীর বিশ্লেষণধর্মী দ্বিতীয় চিঠিটি থেকে। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন কথিত কমিটির পক্ষে দুই মেজরের হাজিরার পর ১৯৭৩ সালের ৩০ জুলাই ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা ক্লিভ ফুলারস ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরকে একটি চিঠি দেন। এতে তিনি দুই মেজরকে তাঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী অস্ত্রসংক্রান্ত কারিগরি তথ্য সরবরাহের পক্ষে মত দেন। ফুলারসের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর এই চিঠিটি পাওয়া যায়নি। তবে ফারুক-রশিদ অস্ত্র কিনতে কথা বলেছিলেন জে ফেরারসের সঙ্গে। তিনি ছিলেন ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মকর্তা।

২৭ আগস্ট ১৯৭৩ নিউবেরি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিকটপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশীয় বিভাগের পরিচালক পিটার ডি কনস্টবেলকে লেখেন, 'প্রিয় পিটার, এই চিঠি বাংলাদেশে মার্কিন সামরিক সরবরাহ-সংক্রান্ত। গত ১৩ আগস্ট লেখা আপনার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতেই এই চিঠি। আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আমি বিষয়টি নিয়ে আমাদের কান্ট্রি টিমের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করেছি।'

নিউবেরি এতটাই হুঁশিয়ার ছিলেন যে তিনি পিটারকে এটাও জানাতে ভোলেননি, 'টিমের সব সদস্য মানে তো আর সবাই নয়। কারণ, সবাই তো এসব তথ্য জানার এখতিয়ার রাখেন না।' এর পরই তিনি কনস্টবেলকে মোক্ষম প্রশ্নটি করেন, 'যেসব অস্ত্র চাওয়া হয়েছে, তা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দরকার আছে কি?'

উল্লেখ্য, রশিদ ও ফারুক—এই দুই ভায়রা ভাই পৃথকভাবে দুই দিন মার্কিন দূতাবাসে উপস্থিত হন। ওই চিঠির বিবরণ অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই রশিদ সেনাবাহিনীর জন্য যেসব অস্ত্র চান, তার মধ্যে ছিল ১০৫ থেকে ১৫৫ মিলিমিটার কামান ও হালকা বিমানবিধ্বংসী কামান। পরদিন ১২ জুলাই জে ফেরারসের সঙ্গে দেখা করেন ফারুক রহমান। এ সময় ফারুক নিজেকে আর্মার্ড কোরের পরিচালক হিসেবে পরিচয় দেন এবং ট্যাংকের খোঁজখবর নেন। তিনি আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার, হালকা ট্যাংক ও অ্যাম্ফিভিয়াস বা উভযান সরবরাহের বিষয়ে কথা বলেন। ফারুক এ সময় ট্যাংক রেজিমেন্টে ফার্স্ট ল্যান্সারে ছিলেন।

'উভয়ে উর্দি পরা অবস্থায় এবং বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে মিশনে আসেন।' এ মন্তব্য করে নিউবেরি আরও লেখেন :

আমরা এখনো পর্যন্ত মনে করি না যে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত মার্কিন সামরিক অস্ত্র সরবরাহ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার সময় এসেছে। যে দুই মেজর অস্ত্র কিনতে এসেছিলেন, তাঁরা আর দূতাবাসে না-ও আসতে পারেন। আর যদি তাঁরা আসেন, তাহলে আমার প্রস্তাব হলো, এ কথা তাঁদের জানিয়ে দেওয়া যে বাংলাদেশের ওপর অস্ত্র সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা এখনো বলবৎ রয়েছে। আর যদি এর কোনো ব্যত্যয় ঘটাতেই হয়, তাহলে মার্কিন দূতাবাসকে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পর্যায় থেকে অনুরোধ পেতে হবে।

এই গোপন দলিলগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে ফারুক-রশিদের পঁচাত্তরের আগের ও পরের 'যোগাযোগের' অনুমান ভিত্তি পেতে পারে। এমনকি ১৯৭২, ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে যেমন, তেমনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার পর মোশতাক সরকারের পক্ষে ফারুক-রশিদ জুটির মার্কিন অস্ত্রসহায়তা চাওয়ার বিষয়টি পূর্বযোগাযোগের দাবিকে আরও জোরালো করে কি না, সেটাও এক প্রশ্ন।

১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাইয়ের ওই বার্তার শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ মিলিটারি শপিং'। মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল ইসলাম চৌধুরী লেখককে বলেন, ওই সময় পদাতিক বাহিনীতে মেজর পদে ঢাকায় কর্মরত একজনই রশিদ ছিলেন এবং তিনিই ফারুকের ভায়রা ভাই, আগস্ট হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে যিনি দণ্ডিত হন। ওই সময় ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন তৎকালীন কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) মইনুল হোসেন চৌধুরী। তিনি বলেন, রশিদ ঢাকার দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারিতে তাঁর অধীনেই ছিলেন।

অস্বাভাবিক তৎপরতা

১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই মেজর রশিদ মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে বলেছিলেন, সেনাবাহিনী ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে। তাই তিনি বিভিন্ন বৈদেশিক মিশন থেকে সমরাস্ত্রের কারিগরি দিক ও তার দাম জানতে এসেছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তিনি তা ওই কমিটির কাছে পেশ করবেন। ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন ব্রিটিশ সামরিক অ্যাটাশের বরাত দিয়ে নিউবেরি অবশ্য লিখেছেন, 'ওই দলটি (ফারুক-রশিদ) একই অনুরোধ নিয়ে ফ্রান্স, জার্মান ও সোভিয়েত দূতাবাসেরও শরণাপন্ন হয়েছিল।'

এ পর্যায়ে নিউবেরি যে মন্তব্য করেন, 'পররাষ্ট্র দপ্তরের স্মরণ থাকবে যে, সৈয়দ ফারুক রহমান একইভাবে অস্ত্র সরবরাহের অনুরোধ নিয়ে ১৯৭২ সালে

মার্কিন দূতাবাসে হাজির হয়েছিলেন।' তবে ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক বিষয় নিয়ে সিআইএ একটি পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন তৈরি করেছিল। সেখানে সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য রাজনৈতিক ভূমিকাও আলোচিত হয়। কিন্তু তাতে ওই অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ নেই।

নিউবেরি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখেছেন :

> প্রশ্ন হলো, সেনাবাহিনী কি নিজেদের পছন্দে বা ইচ্ছায় এসব করছে, নাকি এতে মুজিব সরকারের সায় আছে? কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই এ ধরনের বিষয় নিয়ে সামরিক কর্মকর্তাদের দূতাবাসে চলে আসা কিছুটা অস্বাভাবিক। তবে হয়তো সরকারের সঙ্গে রক্ষীবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সম্পর্কের তুলনায় সেনাবাহিনী পিছিয়ে আছে, তাই তারা নিজেদের মতো করে এভাবে অস্ত্র সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছে।
>
> আরেকটি সম্ভাবনা হচ্ছে, এতে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন থাকতেও পারে। এভাবে তারা হয়তো সেনাবাহিনীকে বোঝাতে চায় যে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়া সহজ নয়। এর চেয়ে বরং সোভিয়েতের কাছ থেকে সহজে লভ্য বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জোগাড়ের দিকে ঝোঁকাটাই উত্তম।

নিউবেরি এরপর নাম উল্লেখ না করে লিখেছেন, দূতাবাসের যে কর্মকর্তা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি তাঁদের কাছে উপমহাদেশে মার্কিন অস্ত্রনীতি ব্যাখ্যা করেছেন। এবং তিনি তাঁদের কোনো উৎসাহ দেননি। বার্তার শেষ বাক্যটি এ রকম : 'আমরা বিষয়টি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য এজেন্সিকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত পররাষ্ট্র দপ্তরের ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দিলাম।'

এখানে উল্লেখ্য, শেখ মুজিবের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড ইউজিন বোস্টারের অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা হতো। শেখ মুজিবুর রহমান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ও পরিকল্পনাসচিব সাইদুজ্জামান একটি সম্মেলনে যোগ দিতে কেনেডি বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতিকালে রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টার ও ঢাকার মার্কিন মিশনের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শেখ মুজিব আমেরিকার প্রতি তাঁর একটি বন্ধুভাবাপন্ন অবস্থান বরাবরই রক্ষা করে আসতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু অবমুক্ত করা প্রাপ্ত দলিলগুলো থেকে এটা বোঝা যায় না যে মেজরদের এ ধরনের 'অস্বাভাবিক তৎপরতার' তথ্য মার্কিন সরকার মুজিব সরকারের কাছে কখনো প্রকাশ করেছিল।

মুজিবকে উৎখাত করতে ফারুক মার্কিন সহায়তা চান

শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার উৎখাত করতে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ১৯৭৪ সালের ১৩ মে সন্ধ্যায় 'উচ্চতম পর্যায়ের বাংলাদেশ সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে' মার্কিন প্রশাসনের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছিলেন। এ ঘটনার পাঁচ মাসের ব্যবধানে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ঢাকা সফর করেন।

চুয়াত্তরে ফারুকের অভ্যুত্থান ঘটানোর এই আগ্রহ প্রকাশের বিষয়টি ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরকে ২১৫৮ নম্বর গোপন তারবার্তার মাধ্যমে ১৯৭৪ সালের ১৫ মে অবহিত করেছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অবমুক্ত করা বার্তা থেকে অবশ্য দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট মার্কিন কর্মকর্তা ফারুক রহমানের সরকার উৎখাতের প্রস্তাব তাৎক্ষণিক নাকচ করেছিল।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে মার্কিন-সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে দীর্ঘ জল্পনাকল্পনার প্রেক্ষাপটে এই প্রথম অন্তত মার্কিন সরকারি দলিলের মাধ্যমেই প্রমাণিত হলো যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত খুনি চক্র মুজিব সরকারকে উৎখাত করতে মার্কিন দূতাবাসের কাছে ধরনা দিয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ১৩ মে থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট—অন্তত এই ১৫ মাস ধরে ফারুক রহমানই খুনিদের সংগঠিত করার কাজে নেতৃত্ব দেন বলে প্রতীয়মান হয়।

অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, ফারুক রহমান প্রচলিত আইন ও সেনাশৃঙ্খলা উপেক্ষা করে একাধিকবার মার্কিন দূতাবাসে ছুটে গেছেন। ধারণা করা যায়,

ফারুক রহমান ও খুনি চক্রের মধ্যে ভারতকে নিয়ে বিরাট শঙ্কা ছিল। ফারুক-রশিদ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঠেকাতে খন্দকার মোশতাক সরকারের পক্ষে দূতাবাসের আরেক কর্মকর্তার কাছেও গিয়েছিলেন।

ফারুকের চুয়াত্তরের মিশন-সংক্রান্ত এই নতুন তথ্য প্রকাশ মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজের এ-সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফলের ওপর নতুন করে আলো ফেলবে। কারণ, ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি অব্যাহতভাবে লিখে আসছেন যে খুনিদের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের 'পূর্বযোগাযোগ' ছিল। লিফশুলজের দাবি অনুযায়ী বোস্টার তাঁকে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন, '১৯৭৪-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর জানুয়ারির মধ্যে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যে লোকগুলো বৈঠক করে, তারা আসলে মোশতাক গ্রুপেরই লোক।' কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, 'পূর্বযোগাযোগ' আরও পুরোনো। মেজর ফারুক রহমান নির্ভয়ে সরকার উৎখাতের নীলনকশা মার্কিন কর্মকর্তার কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

চুয়াত্তরের ১৩ মে ফারুক রহমান মার্কিন দূতাবাসের 'জনসংযোগ কর্মকর্তা' উইলিয়াম এফ গ্রেশামের বাসায় গিয়ে বলেছিলেন, তিনি 'উচ্চপর্যায়ের বাংলাদেশ সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে' মার্কিন সরকারের মনোভাব জানতে এসেছেন। তিনি জানতে চান, অভ্যুত্থান ঘটানো হলে মার্কিন সরকারের মনোভাব কী হবে। বিশেষ করে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ রোধে তারা কোনো ভরসা দেবে কি না। এখানে এই 'বিদেশি হস্তক্ষেপ' মানে নিঃসন্দেহে ভারতের হস্তক্ষেপ।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নিয়ে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ নিশ্চিত করে যে, সে সময় সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়া প্রস্তাবিত অভ্যুত্থান-পরিকল্পনা সম্পর্কে আগেভাগে অবহিত হলেও তিনি তা প্রতিহত করতে কোনো উদ্যোগ নেননি। লরেন্স লিফশুলজ কর্নেল আবু তাহের হত্যা মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চে ১৪ মার্চ ২০১১ একটি বিবৃতি দেন। লিখিত হলফনামায় উল্লেখ না করলেও আদালতকক্ষে তিনি বলেছেন, শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমান পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। কর্নেল ফারুক ও রশিদের সঙ্গে কথোপকথন এবং অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের বই *বাংলাদেশ: আ লিগ্যাসি অব ব্লাড* থেকেও সে বিষয়ে ইঙ্গিত মেলে। লিফশুলজের কথায়, 'জিয়া আগস্ট অভ্যুত্থানের মুখ্য খেলোয়াড়দের অন্যতম। তিনি চাইলে

অভ্যুত্থান হয়তো বন্ধ করতে পারতেন। কারণ, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি আগেই ওয়াকিবহাল ছিলেন।'

লিফশুলজ ২০০৫ সালে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'মেজর রশিদ এক বৈঠকে প্রশ্ন তুললেন, অভ্যুত্থানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব কী হবে? জিয়া ও মোশতাক উভয়েই আলাদাভাবে বললেন, তাঁরা এ বিষয়ে মার্কিনদের মনোভাব জেনেছেন। দুজনের উত্তর একই রকম ছিল। তাঁরা বললেন, এটা (মুজিবকে সরানো) মার্কিনদের জন্য কোনো সমস্যা নয়। আমি তখন অনুভব করলাম, মার্কিনদের সঙ্গে জিয়া ও মোশতাকের আলাদা যোগাযোগের চ্যানেল রয়েছে। পরে আর এ বিষয়ে কথা হয়নি।'

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেজর রশিদ বলেছেন, জিয়া বলেছিলেন, একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি এতে সরাসরি জড়িত হতে চান না। তবে জুনিয়র কর্মকর্তারা যদি প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেন, তাহলে তাঁদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।

লিফশুলজের বিবরণ অনুযায়ী বোস্টার বলেছিলেন, পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে বোস্টার দূতাবাসের সবার প্রতি কঠোর নির্দেশ জারি করেন, কেউ যেন ভবিষ্যতে এই গ্রুপ কিংবা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রকারী আর কোনো গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখে। এর সপক্ষে অবশ্য এখনো পর্যন্ত অবমুক্ত করা কোনো মার্কিন দলিল পাওয়া যায়নি।

১৯৭৪ সালের ১৫ মে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টারের গোপন প্রতিবেদনের পূর্ণ বিবরণ :

প্রাপক : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।
প্রেরক : মার্কিন দূতাবাস ঢাকা।
বিষয় : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের ইঙ্গিত।

১৯৭৪ সালের ১৩ মে সন্ধ্যায় সৈয়দ ফারুক রহমান, যিনি ফার্স্ট বেঙ্গল লেন্সারস অ্যান্ড সেকেন্ড ইন কমান্ড অব আর্মার্স, আগে থেকে না জানিয়ে গ্রেশামের বাসায় হাজির হন। ফারুক বলেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সেনাবাহিনী খুবই অসন্তুষ্ট। বিশেষ করে, প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক একটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। ঘোষণাটি হলো, আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে সেনাবাহিনীকে নিষেধ করে দেওয়া। ফারুক রহমান বলেন, তিনি 'উচ্চপর্যায়ের বাংলাদেশ সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে' এখানে এসেছেন। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে বাংলাদেশে সরকার উৎখাতের যদি কোনো ঘটনা ঘটে, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মনোভাবটা কী হবে।

বিশেষ করে, সে ক্ষেত্রে বিদেশি হস্তক্ষেপের কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র দেখবে কি না। গ্রেশাম মেজর রহমানকে বলেছেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে চলেছে।

২. মন্তব্য : মেজর রহমান গত গ্রীষ্মে আমাদের কাছে একটি অস্বাভাবিক প্রস্তাব করেছিলেন। সেটা ছিল বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রনীতি ও অস্ত্র বিক্রয়সংক্রান্ত। সেনাবাহিনীতে তিনি কোনো অধিনায়ক নন। উপরন্তু তাঁর সাঁজোয়া বাহিনীতেও বর্তমানে কোনো সাঁজোয়া যান নেই। তবে এবারই প্রথম নয়, দুই বছর ধরে আমরা সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের খবর পেয়ে আসছি। দূতাবাসের কাছে অভ্যুত্থানের গুজবও পৌঁছেছে। কিন্তু আগেকার খবরগুলো কোনো ফলাফল বয়ে আনেনি। কিংবা কোনো ধরনের সামরিক অভ্যুত্থান আসন্ন বলেও আমরা অনুমান করি না।

৩. ফারুক রহমানের আগমন এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বর্তমানে পরিচালিত সেনা অভিযানের কার্যক্রম মুজিব নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেনাবাহিনীকে নিরপেক্ষ থাকার মূল আদেশ অনুসারে, বিশেষ করে কুমিল্লায়, উচ্চপর্যায়ের উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক বাঙালি গ্রেপ্তার হয়েছে। এ ঘটনা নিয়ে দলে হইচই হয়। মুজিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দলীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সেনাবাহিনী যেন আওয়ামী লীগের নেতাদের রেহাই দেয়। তিনি (মুজিব) অবশ্য দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী তৎপরতার দায়ে আওয়ামী লীগের মহিলা সাংসদ বেগম মমতাজের বহিষ্কারাদেশ অনুমোদন করেন। এমনকি মুজিব যদি তাঁর সহযোগীদের রক্ষা করা অব্যাহত রাখেন, তাহলেও বলা যায় তিনি সেনাবাহিনীকে এই অভিযান পরিচালনার অনুমতি দিয়ে অধিকতর দুর্নীতিগ্রস্তদের অন্তত একটা শঙ্কায় ফেলে দিয়েছিলেন। বোস্টার।

লক্ষণীয়, বোস্টারের জবানিতে 'দূতাবাসের কাছে অভ্যুত্থানের গুজব পৌঁছার' তথ্য মিললেও সিআইএর তৎকালীন ঢাকা স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরি লিফশুলজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আগস্ট অভ্যুত্থানের আগে মার্কিন দূতাবাস এ ধরনের কোনো তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই জানত না।' ১৯৮০ সালে সোলার্জের কাছে মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর কিংবা তার আগে বোস্টার ও লিফশুলজের কাছে এমন তথ্য প্রকাশ করেননি যে, ১৯৭৪ সালের নভেম্বরের আগেই তাঁরা মুজিব সরকারকে উৎখাতের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা জানতে পেরেছিল।

মোশতাককে স্বীকৃতি দিয়ে কিসিঞ্জার ধন্য

হেনরি কিসিঞ্জারের 'ডান হাত' হিসেবে পরিচিত লেরি ইগলবার্গারের আশীর্বাদে ডেভিস ইউজিন বোস্টার বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রদূত হতে পেরেছিলেন। এবং তিনি আগাগোড়া কিসিঞ্জারের প্রণীত মার্কিন নীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থেকেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। অবশ্য তাঁর আগে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭২-এর ১১ সেপ্টেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশে একজন উঁচু মাপের মার্কিন কূটনীতিককে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিলেন। তিনি হারম্যান ফ্রেডরিক এইলটস। কিন্তু তিনি বাংলাদেশে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর কথায়, 'কিসিঞ্জারের অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত রাষ্ট্রদূতের মধ্যে এইলটস ছিলেন অন্যতম।'

ডেভিস ইউজিন বোস্টার ঢাকায় তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন ১৯৭৪ সালের ১৩ এপ্রিল। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৯ সালে নেওয়া বোস্টারের ওই সাক্ষাৎকারে প্রকল্প পরিচালক চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি বোস্টারকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কীভাবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূতের চাকরিটা পেলেন?'

কর্মজীবনের শুরুতে বোস্টারের সুযোগ হয় পররাষ্ট্র দপ্তর, সিআইএ ও নেভির চাকরি থেকে একটি বেছে নেওয়ার। তিনি কূটনৈতিক পেশা বেছে নেন। বোস্টার ১৯৪৯-৫০ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ বিভাগে, ১৯৫৯-৬১ সালে ব্যুরো অব ইউরোপিয়ান অ্যাফেয়ার্সে সোভিয়েত ডেস্ক কর্মকর্তা এবং ১৯৬৫-৬৭ সালে মস্কোর মার্কিন দূতাবাসে পলিটিক্যাল কাউন্সিলর ছিলেন। একসময় তিনি নেপালেও ছিলেন।

১৯৭৪-৭৬ সালে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে

তিনি অন্তত এক হাজারের বেশি তারবার্তা পাঠান। এসব তারবার্তায় তিনি ওই সময়ের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাতে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

বোস্টার ছিলেন পোল্যান্ডে। ডেপুটি চিফ অব মিশন (ডিসিএম) হিসেবে তিনি যুগোস্লাভিয়ায় যেতে চেয়েছিলেন। বোস্টার বলেন:

> আমি এ সময় আগে থেকে পরিচিত কেরল লেইজের কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। কেরল ছিলেন নেপালে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। কেরল জানালেন, তিনি সবেমাত্র নেপালের ডিসিএম হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করেছেন। তিনি আশা করেন, আমি এটা গ্রহণ করব। আমি তত দিনে প্রথম শ্রেণীর পদে উন্নীত হয়েছি। কিন্তু নেপালের চাকরিটা ছিল তৃতীয় গ্রেডের। সুতরাং ব্যবধানটা বিরাট। আমি যদিও কেরলকে পছন্দ করি, তার পরও তাঁর আমন্ত্রণ আমার মনমতো হলো না। তবে শেষ মুহূর্তে আমি মনস্থির করলাম, কর্তৃপক্ষ যদি আমাকে পাঠায়, তাহলে আমি যাব। পরে আমি গেলাম। ১৯৭০ সালে আমাকে পোল্যান্ডের ওয়ারশতে ডিসিএম করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। তখন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ওয়ালটার স্টোয়েসেল।

স্টোয়েসেল এবং বোস্টার যে সময়টায় ওয়ারশর মার্কিন দূতাবাসে ছিলেন, তখন সেখানে একটা মজার ঘটনা ঘটে, সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্য প্রাসঙ্গিক।

২০০১ সালে জর্ডানে নিযুক্ত (১৯৯০-৯৩) সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রজার জি হেরিসন কথ্য ইতিহাসবিদ স্টুয়ার্ট কেনেডিকে বলেছেন, 'আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের অন্যতম ওয়ালটার স্টোয়েসেল। জেনি বোস্টারের সঙ্গে তাঁর ৩০ বছরের দীর্ঘ সম্পর্ক।' উল্লেখ্য, বোস্টারকে তাঁর সহকর্মীরা জেনি বোস্টার হিসেবেও সম্বোধন করেন।

স্টোয়েসেল ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পোল্যান্ডে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ইয়াহিয়ার প্রতি নিক্সন-কিসিঞ্জারের ঐতিহাসিক পক্ষপাতের অন্যতম বোধগম্য কারণ ছিল উদীয়মান পরাশক্তি চীনের সঙ্গে গোপন দোস্তির চেষ্টা। কিসিঞ্জার সেই ধারাবাহিকতা তাঁর জীবনসায়াহ্নেও অব্যাহত রেখেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও রিপাবলিকান-দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিট রমনি অভিন্ন সুরে চীনের প্রতি বৈরিতা প্রকাশ করলে হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টারে কিসিঞ্জার বলেন, 'উভয় প্রার্থী চীনকে যেভাবে প্রতারক বলছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়' (৩ অক্টোবর ২০১২, এবিসি নিউজ)।

ইয়াহিয়া একটা সময়ে চীনা নেতাদের সঙ্গে নিক্সনদের যোগাযোগের সেতু ছিলেন। পাকিস্তান ছাড়াও এই সময়টাতে বহু উপায়ে চীনের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কিসিঞ্জার। স্টোয়েসেলকে যখন নির্দেশ দেওয়া হলো, তিনি যেন পোল্যান্ডে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেন, তিনি রীতিমতো ভড়কে যান। এমনকি অপারগতাও প্রকাশ করেন। দ্রুত তাঁর ডাক পড়ে ওয়াশিংটনের ওভাল অফিসে। নিক্সন-কিসিঞ্জার তখন তাঁকে কী করে চীনের সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বন্ধুত্ব করতে হবে, তার তালিম দিয়েছিলেন। সুতরাং কিসিঞ্জারের দক্ষিণ এশীয় কূটনীতির সবক বোস্টারের পোল্যান্ডেও কিছুটা প্রত্যক্ষ করার কথা। বোস্টার বলেন, 'প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭২ সালের মে মাসে এক দিনের সফরে পোল্যান্ডে আসেন। আমি ছিলাম সেই সফরে নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা।'

লিফশুলজ বহুদিন বোস্টারের নাম প্রকাশ করেননি। তিনি মুজিব হত্যাকাণ্ডের পরপরই লিখেছিলেন :

> ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানকালে আমি অভ্যুত্থানের সময় ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন, এমন একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করি। ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ভবনে বসে আমি এবং আমার সহকর্মী কাই বার্ডের সঙ্গে আলোচনার সময় এই কর্মকর্তা আমাদের জানিয়েছেন, মুজিবের বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনার কথা সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে মার্কিন দূতাবাসকে জানানো হচ্ছিল। মুজিবের মৃত্যু এই ভদ্রলোককে আহত করে। তিনি দাবি করেছেন, সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টার দূতাবাসে সিআইএর স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কে ছিলেন ওই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, সে কথা লিফশুলজের কাছ থেকেই জানা যায়। ২০০৫ সালের ১৫ আগস্ট *প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার*-এ প্রকাশিত নিবন্ধে লিফশুলজ বলেন :

> অভ্যুত্থানের তিন বছর পর ওয়াশিংটনে আমি এই লোকের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার খবরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে ওঠেন। আমি এ আশায় থাকি যে, তিনি আমাকে এ ব্যাপারে যেসব তথ্য দেবেন তা একদিন অস্বস্তিকর সত্য হয়ে প্রকাশ পাবে এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের জবাবদিহি করতে হবে। ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো আমি তাঁর পরিচয় জানাতে পারি। এতগুলো বছর তাঁর সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকার পরও তাঁর পরিচয় প্রকাশ না করার ব্যাপারে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংযম

> পালন করেছি, সে দায়বদ্ধতা থেকে আমি এখন মুক্ত। ধৈর্য ধরুন, কেন এবং কীভাবে আমি এ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তা বলব।

লিফশুলজ তাঁর জবানিতে বোস্টারের ওপর কতটা নির্ভরশীল ছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর কথায় :

> আমার অপ্রচলিত সূত্রটি মার্কিন দূতাবাসে কাজ করতেন। ওই রাতে তিনিই তাঁর সততা ও দায়বদ্ধতার গুণে বিষয়টির গভীরে যেতে আমাকে উৎসাহিত করেন। ওই সময়কার সরকারি আমলাতন্ত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যদের থেকে আলাদা। অভ্যুত্থান ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি অত্যন্ত হতাশ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সচেতন ব্যক্তি এবং এমন কিছু জানতেন, যা অন্যরা জানতেন না। এ জানাটাই তাঁর বিবেক দংশনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমারটাও ছিল ওই ধরনের নৈতিক দায়িত্ববোধের ব্যাপার, যা আমাকে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার মুখোমুখি করেছিল। একজন তরুণ রিপোর্টারের জন্য যা ছিল খুবই স্মরণীয় ঘটনা।

লিফশুলজ নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি বোস্টারের একটি সাক্ষাৎকার নিতে আগ্রহী ছিলেন। লিফশুলজ ২০০৫ সালে লিখেছেন, 'আমি তাঁকে (বোস্টারকে) বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, তিনি যা জানেন তা প্রকাশ করাটাই শ্রেয়। তিনি আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন না, তবে তাঁর মনোভাব এমন ছিল যে 'আমি (বোস্টার) বেঁচে থাকতে নয়।' এ কথার মাধ্যমে আমি বুঝলাম, তাঁর মৃত্যুর পরই আমি সূত্র হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহার করতে পারব। চলতি বছর আমি ভার্জিনিয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করেছিলাম। গত মাসের (২০০৫ সালের জুলাই) তৃতীয় সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। আগস্ট অভ্যুত্থানের ৩০তম বার্ষিকী সামনে রেখে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করার জন্য তাঁকে রাজি করানোর কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু তা আর হলো না। ইউজেন বোস্টার ৭ জুলাই ২০০৫ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি আবারও মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হারালাম।'

সেদিক থেকে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডিকে দেওয়া বোস্টারের সাক্ষাৎকারটি গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৫ সালের ১৫ আগস্ট লিফশুলজ *প্রথম আলোতে* লেখেন :

> বোস্টার আমাদের চোখে চোখ রাখলেন এবং এমন কিছু তথ্য দিলেন, যা শুনব বলে আমরা আশাও করিনি। আমার মনে হলো বোস্টার একটি বোমা ফাটালেন। পরে বিষয়টি আমরা এভাবে লিখলাম 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, ১৯৭৪ সালের শেষ

দিকে কিছু লোক শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। দূতাবাস সূত্রমতে, ১৯৭৪-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর জানুয়ারির মধ্যে দূতাবাস-কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের কয়েক দফা বৈঠক হয়।... ঊর্ধ্বতন ওই দূতাবাস-কর্মকর্তা আরও জানান, পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে দূতাবাস থেকে আমরা একটি সমঝোতায় আসি যে, আমরা বিষয়টি থেকে এবং এসব লোক থেকেও দূরে থাকব। তবে পঁচাত্তরের জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে এ লোকগুলোর কেউ দূতাবাসে এসেছিল কি না, তা আমি বলতে পারছি না। ওই সময়ের আগে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল।

আমাদের প্রতিবেদনের এ বিশেষ বিবৃতির উৎস ছিলেন ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী এই ডেভিস ইউজিন বোস্টার। বোস্টার সে দিন আমাদের আরও অনেক কথাই বলেছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে, ১৯৭৪-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে দূতাবাস-কর্মকর্তাদের সঙ্গে যে লোকগুলো বৈঠক করে তারা আসলে মোশতাক গ্রুপেরই লোক। বোস্টার আরও বলেন, পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে তিনি দূতাবাসের সবার প্রতি কঠোর নির্দেশ জারি করেন, কেউ যেন আর ভবিষ্যতে এই গ্রুপ কিংবা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রকারী আর কোনো গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখে। এ নির্দেশ সিআইএর স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরি এবং তাঁর সব স্টাফের জন্যও প্রযোজ্য ছিল।

চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডির কাছে বোস্টার তাঁর বাংলাদেশে আসার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এভাবে :

ওয়ারশতে একদিন ফোন বেজে উঠল। ফোনের অপর প্রান্তে রাষ্ট্রদূত ওয়ালটার স্টোয়েসেল। তিনি তখন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ইউরোপ-বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি আমাকে বললেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে হোয়াইটহাউসের কাছে আপনার নাম প্রস্তাব করতে পররাষ্ট্র দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, এ কর্মস্থল আমার পছন্দসই হবে কি না। বাংলাদেশে যাওয়ার প্রস্তাবটা আমার হজম করতে কষ্ট হলো। জানতে চাইলাম, আর কোথাও পদ শূন্য আছে কি না। আমি ও মেরি (বোস্টারের স্ত্রী) যখন কাঠমান্ডুতে ছিলাম, তখন হংকংয়ে অবকাশ যাপনে যাই এক বছরের জন্য। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পিআইএর ফ্লাইটে চড়ব। ঢাকা হয়ে হংকংয়ে যাব। ঢাকা তখন পাকিস্তানের অংশ। সেই সুবাদে স্থানীয় ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার একটা চিত্র আমাদের মনে ছিল। আমরা ঢাকায় এক দিন ছিলাম। পর্যটকদের মতোই সময় কাটিয়েছিলাম। আমি স্মরণ করতে পারি, ঢাকা তখন চিত্তাকর্ষক স্থান ছিল না। আমার

পরিষ্কার মনে আছে, ঢাকায় আমি মেরিকে বলেছিলাম, আমরা কখনো আবার হয়তো এখানে ফিরে আসতে পারি। স্টোয়েসেল বললেন, আর কোনো জায়গা খালি নেই। সুতরাং আমি সম্মত হলাম। ঢাকায় যখন আমাকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়, তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন রজার্স। আমি ওয়ারশ ত্যাগের আগেই তিনি পদত্যাগ করেন।

এখানে উল্লেখ্য, উইলিয়াম পি রজার্স ১৯৬৯ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন। মূলত কিসিঞ্জারের সঙ্গে টানাপোড়েনের কারণেই তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়। কিসিঞ্জার নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হলেও তাঁর ছায়ায় রজার্স ছিলেন যথেষ্ট ম্লান।

বোস্টার বলেন :

রজার্সের জায়গায় এলেন হেনরি কিসিঞ্জার। তিনি এসেই রাষ্ট্রদূত পদমর্যাদায় যেখানে যত ধরনের নিয়োগ-প্রক্রিয়া আছে, তার লাগাম টেনে ধরেন। তিনি বদলি ও কর্মস্থল নির্ধারণের প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা আমাকে ডাকলেন। বললেন, আপনার বাংলাদেশে যাওয়ার বিষয়টি কিছুটা আলোচনায় উঠেছিল। তাঁরা ভেবে দেখেছেন, এটা হয়তো শেষ পর্যন্ত অনুমোদন পাবে। তাই তাঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি যেন ওয়ারশতে আরও কিছুটা সময় থাকি। আমি তা-ই করলাম। আমার পরিবর্তে ওয়ারশতে যাঁর আসার কথা, তিনি ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন। তিনি ছিলেন জন ডেভিস। বর্তমানে (১৯৮৯) তিনি পোল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত। তখন একটা বিব্রতকর অবস্থা তৈরি হলো। পদ একটি। মানুষ দুজন। সে কারণে পররাষ্ট্র দপ্তর আমাকে ওয়াশিংটনে ডেকে নিল। আমি ওয়ারশ ত্যাগ করলাম। গেলাম লন্ডনে, অবকাশযাপনে।

মেরির সঙ্গে আমি এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ালাম। একদিন পুনরায় পেলাম স্টোয়েসেলের ফোন। কিসিঞ্জার জর্জ ভেস্টকে একটা নির্দেশনা দিয়েছেন। জর্জ ভেস্ট হলেন জেনেভায় ইউরোপীয় সিকিউরিটি কনফারেন্সে (সিএসসিইএ) মার্কিন প্রতিনিধিদলের প্রধান। কিসিঞ্জার তাঁকে তাঁর প্রেস মুখপাত্র হিসেবে চেয়েছেন। তার মানে দাঁড়াল, পররাষ্ট্র দপ্তরের এখন এমন একজনকে দরকার, যিনি ভেস্টের শূন্যস্থান পূরণ করবেন। স্টোয়েসেল আমাকে বললেন, আপনি দুপুরের মধ্যে জেনেভায় আসুন এবং মার্কিন প্রতিনিধিদলের দায়িত্ব নিন। সুতরাং আমি জেনেভায় গেলাম এবং প্রায় পাঁচ মাসের জন্য সেই দায়িত্ব পালন করলাম। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে সম্মেলনের বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য আমি ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়েছিলাম। জেনেভায় যাওয়ার পর থেকে ঢাকার রাষ্ট্রদূত হওয়ার বিষয়ে আমার আর কিছুই জানা ছিল না। তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হওয়ার

বিষয়টি কত দূর এগোল, সে বিষয়ে আমি একটু খোঁজ নিলাম। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, আমি যেন লেরি ইগলবার্গারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন কিসিঞ্জারের ডান হাত। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। কথা বললাম আমার ঢাকার পদায়ন নিয়ে। তিনি বললেন, তিনি বিষয়টি দেখবেন। এবং সত্যি বলতে কি, এর পরপরই আমি জানতে পেলাম, আমার ঢাকায় যাওয়া চূড়ান্ত হয়েছে। এভাবেই আমি হলাম বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

উল্লেখ্য, বোস্টার যাঁকে লেরি ইগলবার্গার হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পুরো নাম লরেন্স সিডনি ইগলবার্গার। নানা কারণে তিনি আলোচিত। ভারতীয় লেখক শারদ চৌহান লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই রিচার্ড নিক্সন ২ ডিসেম্বরে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে হার্ভার্ড অধ্যাপক হেনরি কিসিঞ্জারের নিয়োগ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর ১১ ডিসেম্বরে ইগলবার্গারকে সঙ্গে নিয়ে কিসিঞ্জারকে পার্ক অ্যাভিনিউতে দেখা যায়। ইগলবার্গার তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন। সিআইএর দেওয়া কাগজপত্র দেখার আগেই কিসিঞ্জারের কী ধরনের নথি পছন্দ তা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। সিআইএর কাছ থেকে প্রাপ্ত খসড়ার ভিত্তিতে কিসিঞ্জারের জন্য নতুন করে খসড়া প্রস্তুতের দায়িত্ব ছিল ইগলবার্গারের ওপর।[১]

মার্কিন ইতিহাসে ইগলবার্গার একমাত্র পেশাদার কূটনীতিক, যিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি বুশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ইগলবার্গার তাঁর যুগোস্লাভ নীতির জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। সার্বদের প্রতি তাঁর অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য ইউরোপীয় প্রেস 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়ার' আদলে তাঁকে বলত 'লরেন্স অব সার্বিয়া'। ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিসিঞ্জারের নির্বাহী সহকারী। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নেও তিনি ছিলেন কিসিঞ্জারের বিশ্বস্ত সহযোগী। পরে কিসিঞ্জার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলে ইগলবার্গারের বহুবিধ পদোন্নতি ঘটে। ইগলবার্গার ২০১১ সালের ৪ জুন তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিসিঞ্জারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কিসিঞ্জারের ল ফার্ম 'কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েটস'-এরও অন্যতম অংশীদার ছিলেন।

কথ্য ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি এরপর বাংলাদেশ-সংক্রান্ত মূল

---

১. *Inside CIA: Lessons in Intelligence*. By Sharad Chauhan, P. 530 APH Publishing, 2004.

প্রসঙ্গে আসেন। বোস্টারকে তিনি প্রশ্ন করেন, 'ঢাকায় আপনি কখন পৌঁছালেন? ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে সেখানে পরিস্থিতি কেমন ছিল?'

ডেভিস বোস্টার বলেন :

> তখন সময় খুব খারাপ। বাংলাদেশের অনেকগুলো সমস্যা ছিল। জনসংখ্যার আধিক্য এক নম্বর। জনসংখ্যার অনুপাতে ন্যূনতম যেটুকু সম্পদ থাকা উচিত, তা তাদের ছিল না। ইতিমধ্যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। সেই সঙ্গে ছিল অনাহার-দুর্ভিক্ষ। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস মার্কিন সাহায্যের দেখভাল করত। সাহায্য বিতরণ নিয়েই তারা সময় কাটাত। আমি যত দূর স্মরণ করতে পারি, মার্কিন দূতাবাসের লোকবলের চেয়ে এইড মিশনের লোকবল ছিল বেশি। এ থেকেই অবস্থাটা বোঝা যাবে। পিএল ৪৮০ কর্মসূচির আওতায় আমাদের বড় ধরনের খাদ্যসহায়তা কর্মসূচি ছিল। তার আওতায় বাংলাদেশকে আমরা বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য দিয়েছি। সেখানে আমাদের বৈদেশিক নীতির স্বার্থ ছিল অপরিহার্যভাবেই মানবিক।

কিন্তু খাদ্যসাহায্যের সেই মানবিক নীতি যে কীভাবে অমানবিক হয়ে উঠেছিল, তা বোস্টার জানতেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেননি। চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি বোস্টারের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, 'কিন্তু তারও আগে একটা পর্ব ছিল, যখন আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছিলাম। আপনি যখন সেখানে ছিলেন, সেই সময় কি এই বিষয়ে সেখানকার জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখেছেন?'

বোস্টার বলেছেন, 'এই বিষয়টি মাঝেমধ্যে উল্লেখ করা হতো। প্রত্যেকের কাছেই নানা গল্প ছিল। কিন্তু সেসব দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলেনি। সেটা সত্যি ভালো ছিল। তারা আমাদের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। কিসিঞ্জার দিল্লি ও ইসলামাবাদ সফর করলেন। তাঁর সে সফর খুবই সফল হয়েছিল। ঢাকায় তিনি এবং শেখ মুজিব বেশ সুন্দরভাবে সময় কাটালেন। সেটা ছিল এক দিনের সফর। কিন্তু শেখ মুজিবের দেওয়া নৈশভোজে কিসিঞ্জার এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দিলেন। সুতরাং পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো ও নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির জন্য তা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল।'

উল্লেখ্য, হেনরি কিসিঞ্জার যাতে ঢাকা সফর করেন, সে ব্যাপারে মুজিব সরকার খুবই জোরালো উদ্যোগ নিয়েছিল। মিসেস কিসিঞ্জারও যাতে আসেন এবং ঢাকায় তাঁর সময় যাতে ভালো কাটে, সে ব্যাপারে সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছিল। এমনকি সাংবাদিকদের সামনে যাতে কিসিঞ্জারকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে না হয়, সে বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। ২৩

এপ্রিল ১৯৭৪ বোস্টার ওয়াশিংটনে পাঠানো এক তারবার্তায় উল্লেখ করেন, 'আজ দুপুরে আমাকে পররাষ্ট্র দপ্তরে ডেকে নেওয়া হয়। তাঁরা খুব চান কিসিঞ্জার যাতে ঢাকা সফর করেন।' সেই সফর হয়েছিল। কিসিঞ্জার মুজিবকে বললেন, 'মার্কিন জনগণের হৃদয়ে আপনার জন্য বিরাট জায়গা।' (পরিশিষ্ট ৫)। এরপর বোস্টারের বার্তা থেকেই দেখা যায়, শেখ মুজিব প্রশাসন চিন্তিত। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যাবেন মুজিব। তখন তাঁকে ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানানো হবে কি না। না হলে বাঙালিরা তা অপমানজনক মনে করবে। বোস্টার তাই সরকারকে পরামর্শ দেন যে নিউ ইয়র্কে মুজিবের যাওয়ার আগেই ঢাকায় কিসিঞ্জারকে আমন্ত্রণ জানানো উত্তম। তা-ই হয়। মুজিব সে-বার ইরাকেও গিয়েছিলেন। তবে বোস্টার বার্তা পাঠালেন, 'ঢাকায় ফিরে মুজিবের প্রতিক্রিয়া এমনই যে তিনি তাঁর ইরাক সফরকে ওয়াশিংটনের চেয়ে বেশি সাফল্যজনক বলে বিবেচনা করছেন।'

চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি প্রশ্ন করেন, শেখ মুজিব সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কী ছিল?

বোস্টার বলেন :

> তিনি খুবই ক্যারিশমেটিক বা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এক বিস্ময়কর লোক। আপনি শুধু তাঁর দিকে তাকানোমাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে পছন্দ করবেন। অভিভূত না হয়ে আপনার উপায় থাকবে না। আপনি যদি তাঁকে দেখতে যান, তাহলে আপনি দেখবেন অবাক দৃশ্য। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা লোকজন তাঁকে দেখতে ভিড় করে আছে। আমি নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অভিভূত হয়েছি। ওই সমাজে আসলে এভাবেই সবকিছু ঘটে থাকে। এমনকি তাঁর নিজের বাড়িতেও একই রকম দৃশ্য দেখতে পাবেন। তাঁর বাড়িটি ঢাকার বাড়িঘরের তুলনায় বড়সড় বলতে হবে। কিন্তু তাই বলে সেটা এত বড় বাড়ি নয়, যাতে একজন প্রেসিডেন্টের থাকা উচিত। ঢাকার কূটনৈতিক সম্প্রদায় ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে মুজিব সম্পর্কে একটা সাধারণ মতৈক্য রয়েছে, সেটা হলো সবার চোখে তিনি ফাদার ফিগার বা পিতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর একটি বিশিষ্ট অবস্থান রয়েছে। মুজিব হলেন বাংলাদেশের জর্জ ওয়াশিংটন, যিনি বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয় কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, ব্যবস্থাপনাগত সেই মেধা তাঁর ছিল না। তার জন্য অধিকতর ব্যবস্থাপনাগত মেধাবী ব্যক্তিদের দরকার ছিল। মুজিব ছিলেন একটি রাজনৈতিক সাফল্য এবং একটি ব্যবস্থাপনাগত ব্যর্থতা।

মুজিবের বাকশাল গঠনের পর বোস্টার ঢাকা থেকে প্রেরিত একটি বার্তায় মন্তব্য করেছিলেন, তিনি [মুজিব] 'স্বৈরশাসকের চিরায়ত বৈকল্যে' ভুগতে শুরু করেছেন।

> স্টুয়ার্ট কেনেডি : ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপনি কীভাবে সম্পর্ক বজায় রাখছিলেন? তাঁদের সঙ্গে তো সন্দেহাতীতভাবে মুজিব সরকারের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।
>
> বোস্টার : ঢাকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং তাঁদের লোকজনের সঙ্গে আমাদের খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমার অবস্থানকালে যতই দিন যাচ্ছিল, ভারতীয় ও বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতীয়রা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সে কারণে কেউ একজন হয়তো ভাবতে পারে যে, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক দীর্ঘ মেয়াদে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবে। সত্যি বলতে কি, তেমনটা ঘটেনি। তাদের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ ছিল এবং সেটা ছিল বেশ ঝামেলাপূর্ণ। এবং তা সহজে সমাধানের নয়। দুই সরকারের মধ্যে সম্পর্ক বেশ উত্তেজনাকর হয়ে পড়েছিল।
>
> চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি : আমরা কি সেই উত্তেজনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলাম?
>
> বোস্টার : বাংলাদেশ সরকার (খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন) আমাদের কাছে ভারতের নানাবিধ অবন্ধুত্বসুলভ আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করত। কিন্তু আমরা কোনো মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করিনি।

কিন্তু ইতিমধ্যেই অবমুক্ত করা মার্কিন গোপন দলিলগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, এ অঞ্চলের মার্কিন কূটনীতিকেরা সেই উত্তেজনা থেকে নিজেদের একেবারে দূরে সরিয়ে রাখেননি। ভারতীয়দের কাছ থেকে তাঁরা জানার চেষ্টা করেছেন, মোশতাকের বাংলাদেশে ভারতীয় হস্তক্ষেপ হবে কি হবে না।

মার্কিন দলিলগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, খন্দকার মোশতাক ও জিয়া সরকার যাতে টিকে থাকে, সে জন্য বোস্টার তৎপরতা চালিয়েছেন। অবশ্য কেউ বলতে পারেন, তিনি পেশাদারি তরিকা অনুসরণ করেছেন মাত্র। পঞ্চাশের দশকে বোস্টার প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেসের জুনিয়র সহকারী ছিলেন। ডালেস সিআইএর নকশায় ১৯৫৩ সালে ইরানের মোসাদ্দেক ও পরের বছর গুয়াতেমালার নির্বাচিত সরকার উৎখাতে বড় ভূমিকা রাখেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বোস্টার যদিও মনে করেন, ডালেস পররাষ্ট্র দপ্তরে বিরাট শ্রদ্ধার পাত্র।

বোস্টার স্টুয়ার্ট কেনেডিকে বলেন, 'যে-ই আসুক না কেন, মুজিব হত্যার

পরের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল।' তবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিভিন্ন দলিল থেকেই অকাট্য প্রমাণ মিলছে যে, কিসিঞ্জার মোশতাক সরকারকে দ্রুত স্বীকৃতি দিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। খুনিদের প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান কিসিঞ্জার। ফারুক রহমানরা সে কারণে ব্যাংককে গিয়েও মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বৈঠক করেন।

২০ আগস্ট, ১৯৭৫। ওয়াশিংটন সময় সন্ধ্যা ছয়টা ১১ মিনিট। কিসিঞ্জার ও হ্যারল্ড স্যান্ডার্সের মধ্যকার টেলিফোন।[২]

হ্যারল্ড স্যান্ডার্স ছিলেন দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া-বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। টেলিফোনে তিনি কিসিঞ্জারকে বলছেন :

> ঢাকা থেকে একটা বার্তা পেলাম। তারা [মোশতাকের নতুন সরকার] আমাদের নৈতিক সমর্থন চাইছে। আমরা কি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ উত্তর দিতে পারি?
>
> কিসিঞ্জার : আমি বলতে চাই, আমরা তাদের [মোশতাক সরকার] স্বীকৃতি দিতে পেরে ধন্য মনে করছি। কালকের সংবাদ সম্মেলনে একটি প্রশ্ন সাজাতে পারবেন না?
>
> স্যান্ডার্স : আমিও তা-ই মনে করি এবং প্রশ্নটা তোলাতে পারব।
>
> কিসিঞ্জার : এর উদ্দেশ্য হবে বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে বার্তা পৌঁছানো, যাতে তারা ভরসা পায় যে, আমরা তাদের চাহিদার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকব। তাদের স্বীকৃতি দেব। আমি জানি, মার্কিনপন্থী হিসেবে পরিচয় জাহির করতে তাদের [মোশতাক সরকার] অক্ষমতা রয়েছে।

বোস্টার বাংলাদেশে কর্মরত থাকা অবস্থায় কিসিঞ্জারের ওই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে গেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। যদিও যুক্তরাষ্ট্র সরকার পঁচাত্তরের আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দেয়নি। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডে মার্কিন সরকারের জড়িত না থাকাসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক অস্বীকৃতিকে ক্রিস্টোফার এরিক হিচেন্স নিতান্ত 'প্রচলিত আচার' বলে বর্ণনা করেন।

চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘটনায় তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনের ভূমিকার বিষয়ে ডেভিস ইউজিন বোস্টার এবং পঁচাত্তরে মার্কিন

---

২. দেড় মিনিটের এই টেলিফোন আলাপচারিতার (টেলিকন) সংগ্রহ জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকে। এটি জাতীয় আর্কাইভের সম্পদ নয়। কিসিঞ্জার নিজেই এক গোপন আড়িপাতা যন্ত্র বসিয়েছিলেন। সেই যন্ত্রে ধারণ করা টেলিকন তিনি একটি চুক্তির আওতায় নিক্সন লাইব্রেরিতে দান করেন। সেই সুবাদে এটি পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরে বাংলাদেশ ডেস্কের দায়িত্বে থাকা ও পরে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসার স্টিফেন আইজেনব্রাউনকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁরা তার জবাবও দিয়েছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার গোড়া থেকেই নানাভাবে আলোচিত। আইজেনব্রাউন ওই সময় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বাংলাদেশ ডেস্কে কর্মরত ছিলেন। এই দুজনই শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন বলে আইজেনব্রাউনের দাবি।

ডেভিস ইউজিন বোস্টার ১৯৮৯ সালের ২০ অক্টোবর চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেই হিসেবে লিফশুলজকে দেওয়া তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যের ১০ বছরের ব্যবধানে তিনি স্টুয়ার্ট কেনেডিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎকার দেন। আইজেনব্রাউনের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ২০০৪ ও ২০০৫ সালে ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য অভ্যুত্থান বা মুজিবের জীবন হুমকিগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খবর ছিল। আইজেনব্রাউন আদিষ্ট হয়ে ঠিক করে দেন, মুজিবকে এ বিষয়ে বোস্টার কী বলবেন। আর বোস্টার তা মুজিবকে পৌঁছে দেন। বিষয়টি এসেছে আইজেনব্রাউনের জবানিতে। বোস্টারের ১৯৮৯ সালের ওই সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য নেই। বোস্টার শুধু বলেছেন, 'ওটা ছিল একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওই হত্যাকাণ্ডকে অনুমোদন দেয়নি।' ওই বিষয়ে বোস্টারের সঙ্গে মুজিবের কথোপকথন জানা যায়নি।

যোগাযোগ করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ সমিতির কথ্য ইতিহাস সংগ্রহ প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মেরিলিন বেন্টলি ২০১০ সালের ১৩ আগস্ট এই লেখককে জানান, 'এই প্রকল্পের আওতায় নেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত মতামত অবশ্যই সাবেক কূটনীতিকদের ব্যক্তিগত মত বলে গণ্য হবে। একে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বা কূটনীতি অধ্যয়ন সমিতির কোনো মতামতের প্রতিফলন হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।'

১৯৮৬ সালে কথ্য ইতিহাস প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ পেশাদার মার্কিন কূটনীতিক। ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র সার্ভিসে কাটিয়ে তিনি মিনিস্টার কাউন্সিলর হিসেবে অবসর নেন। এর আগে তিনি মার্কিন বিমানবাহিনীতেও ছিলেন। একজন কথ্য ইতিহাসবিদ হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নিক্সন-কিসিঞ্জারের 'ঐতিহাসিক পক্ষপাত' ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক চড়াই-

উতরাইয়ের বিষয়ে কিছু ধারণা রাখেন। তবে এই লেখক চেষ্টা করলেও, তিনি বাংলাদেশ বিষয়ে কোনো সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা জানান। ২০১০ সালের ৩০ আগস্ট চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি এক ই-মেইলে লেখককে বলেন :

> আমি আপনার চিঠির বিষয়ে চিন্তা করেছি এবং স্থির করেছি যে, বাংলাদেশ বিষয়ে আমি কোনো সাক্ষাৎকার দেব না। বাংলাদেশে যেসব কূটনীতিক কাজ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের আমি সাক্ষাৎকার নিয়েছি মাত্র। এখন আমি কিছু বললে সে বিষয়ে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। ইতিহাসে তা ইতিবাচক কিছু যোগ করবে না। তার চেয়ে বরং সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের বক্তব্য তাঁদের মতো করেই দাঁড়িয়ে থাকতে দিন।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান সম্পর্কে স্টুয়ার্ট কেনেডি ও ইউজিন বোস্টারের কথোপকথন নিচে তুলে ধরা হলো :

> স্টুয়ার্ট কেনেডি : আপনি যখন বাংলাদেশে ছিলেন, তখন একাধিক অভ্যুত্থান হয়। মুজিব নিহত হন। বাংলাদেশে তখন কী ঘটেছিল?
>
> বোস্টার : সেটা এক ভয়ংকর বিয়োগান্ত ঘটনা। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাঁর বাসভবনে আসে। সেই বাড়ি আমাদের বাসভবন থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কিছু নারী ছুরির আঘাতে হত্যার শিকার হন বলে জানা যায়। মুজিবসহ বহু লোককে হত্যা করা হয়। তাঁরা মুজিব পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন। সেটা ছিল নিষ্ঠুর ব্যাপার। ভবিষ্যতে যাতে মুজিব পরিবারের কেউ ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যেই তারা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।
>
> স্টুয়ার্ট কেনেডি : অভ্যুত্থানের সময় দূতাবাসের ভূমিকা কী ছিল?
>
> বোস্টার : অভ্যুত্থানের গুজব শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওয়াশিংটনে একটি তারবার্তা পাঠাই। আমাদের পাঠানো তথ্য হয়তো খুব সঠিক ছিল না। আমি ও আমার স্ত্রী বন্দুকের গর্জনে সচকিত হয়েছিলাম। এর পরই আমি আমাদের দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশনের কাছ থেকে ফোন পাই। তিনি বলেন, একটি অভ্যুত্থান হয়েছে এবং আমার দূতাবাসে আমার আসা উচিত। আমরা তখন নতুন গ্রুপটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিকে নজর দিলাম। নতুন সরকারের সঙ্গে আমরা অব্যাহত সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং তাদের সহযোগিতা দিতে শুরু করলাম। নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার বিষয়টি খুবই জটিল ছিল। তারা খুব অভিজ্ঞ গ্রুপ ছিল না। তারা অবশ্য খুব বেশি দিন টেকেনি।
>
> স্টুয়ার্ট কেনেডি : আমাদের কি কোনো উল্লেখযোগ্য স্বার্থ ছিল, যাতে বাংলাদেশ সরকারের অস্থিতিশীলতা দীর্ঘায়িত হয়?
>
> বোস্টার : না, আমাদের তা ছিল না। যা ঘটেছিল তা ভয়ংকর। আমরা তা

অনুমোদন করিনি। কিন্তু সেটা ঘটেছিল এবং দেশ শাসনে যারাই থাকুক, তাদের সহযোগিতা করতে হয়েছিল।

রাষ্ট্রদূত বোস্টারের এই মনোভাব খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের আলোকেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

বোস্টার-মোশতাক প্রথম বৈঠক

১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বোস্টারের প্রথম বৈঠক হয়। এ সম্পর্কে ২০ আগস্ট প্রেরিত তারবার্তায় বোস্টার লিখেছেন :

> মোশতাকের সঙ্গে আমার প্রথম বৈঠকের উদ্যোক্তা মোশতাক নিজেই। তাঁর অনুরোধে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। বাংলাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে তিনি আমাদের সহায়তা চাইলেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে বললেন, ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অবিলম্বে স্বীকৃতি প্রয়োজন। তিনি প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের কাছে তাঁর শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে অনুরোধ জানান।
>
> এক ঘণ্টার নোটিশে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। স্থান বঙ্গভবন। বেলা তিনটা। আমি আমার সঙ্গে পলিটিক্যাল কাউন্সিলরকে নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বললেন, তিনি আমার সঙ্গে একান্তে বসতে আগ্রহী। গত সপ্তাহে অভ্যুত্থানের আগে এক নৈশভোজে আমি তাঁকে বলেছিলাম, ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। ফিরে আসব এ মাসের শেষে। মোশতাক সে কথা স্মরণে করিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, কখন ঢাকা ছাড়ছি। বললাম, আমাকে যেতে হচ্ছে না। আমাকে ঢাকায়ই থাকতে বলা হয়েছে। খন্দকার মোশতাক বললেন, এটা জেনে তিনি আনন্দিত এবং তিনি এমনটাই আশা করেছিলেন।
>
> এরপর তিনি আমার সঙ্গে মূল বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। বারবার তিনি আমার হাত চেপে ধরছিলেন। বললেন, যে সুযোগ একাত্তরে হারিয়েছি, তা এবার আর হাতছাড়া করা যাবে না। ১৯৭১ সালে কলকাতায় মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সমঝোতার বিষয়ে মোশতাকের উদ্যোগের বিষয় নিয়ে গত মে মাসে আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনা [এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি] হয়েছিল। তিনি বলেন, আমরা যেন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নিই। তাঁর নিজের সম্পর্কে অবন্ধুসুলভ যেসব মন্তব্য ভারতীয় পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে, মোশতাক তার উল্লেখ করেন। মনে হলো, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তিনি সক্ষম হবেন। দেশে ইতিমধ্যে কোনো রক্তপাত

ছাড়াই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। মোশতাক অকপটেই বললেন, ভারত যদি স্থল কিংবা আকাশপথে আক্রমণ করে, বিশেষ করে যদি আকাশপথে হামলা চালানো হয়, তাহলে তিনি প্রতিরক্ষাবিহীন হয়ে পড়বেন। তিনি আরও জানালেন, তিনি একটি প্রতিবেদন পেয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, যেসব বাঙালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তাদেরই নাকি উদ্বাস্তু অভ্যর্থনাকেন্দ্রে হাজির করা হয়েছে। মোশতাকের আশঙ্কা, ১৯৭১ সালে ভারতীয় ও বাঙালিরা যৌথভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে কৌশল সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে, এবারেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে। মোশতাক আমাকে বললেন, 'আপনার লোকেরা, যেখানে যা ঘটে চলেছে, অবশ্যই সবকিছু জানেন।' আমি বললাম, আমি ভারতীয় বিবৃতিতে দেখেছি, তারা ঢাকার বিষয়কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলেই মনে করে এবং তারা ভিন্নতর কিছু করে বসবে, তা ভাবার কারণ নেই। মোশতাক বললেন, তিনিও তা-ই আশা করেন।

খন্দকার মোশতাক এ পর্যায়ে স্বীকৃতি নিয়ে আমাদের অবস্থান জানতে চাইলেন। আমি তা ব্যাখ্যা করলাম। গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করলাম, আমরা তাঁর সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। তবে 'স্বীকৃতি'র বিষয়টি যথারীতি এড়িয়ে গেলাম, এর ওপর জোর দিলাম না। তিনি বললেন, সাংবিধানিক আইনের দিক থেকে তিনি বিষয়টি বুঝতে পারছেন। তবে নতুন সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বীকৃতি' মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বললেন, আমাদের প্রয়োজনীয়তা বিচার করে দেখতে হবে। স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সম্ভাব্য ভারতীয় কোনো পদক্ষেপ ঠেকানোর জন্য। মোশতাক এ সময় প্রায় মরিয়া হয়ে বললেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিটা আসলে এখনই দরকার, সম্ভব হলে আজই দিলে ভালো। আমি বললাম, তাঁর এই অভিপ্রায় আমি ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দেব। তিনি আশা প্রকাশ করলেন, এ বিষয়ে আমি যদি কোনো জবাব পাই, তাহলে তা যেন তাঁকে অবিলম্বে জানিয়ে দিই। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর সরকারের নতুন পথচলা সম্পর্কে, তিনি কিছু বলতে পারেন কি না, তখন তিনি ৬১ জেলা কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের কথা উল্লেখ করেন। বলেন, এ কাজটা পুরোপুরি হয়ে গেছে। এটি ছিল একদলীয় বাকশালব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং এখন তিনি আসলে জননীকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে শিশুটিকেও হত্যা করতে উদ্যত। আমি বললাম, এ কথার মানে কি এই যে তিনি বাকশালব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে বহুদলীয় ব্যবস্থায় ফিরে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, তিনি ঠিক তা-ই করছেন। গত রাতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং যখনই দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, তখনই এ সিদ্ধান্ত

কার্যকর হবে। এবং তা অর্জনে আমাদের অবশ্যই সাহায্য করা উচিত।

আমি আমাদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে বললাম, আমি আপনার নতুন দায়িত্ব পালনে সাফল্য কামনা করছি। তিনি অবশ্য ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আথারটনের আশ্বাসের কথা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, বাংলাদেশে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখব। এবং আশা প্রকাশ করলাম, পরিস্থিতি মোকাবিলায় এটা সহায়ক হবে। মোশতাক বললেন, বঙ্গভবনে যখনই খুশি চলে আসতে আমি যেন কোনো দ্বিধা না করি। আর আমি যেন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের কাছে তাঁর শুভেচ্ছা পৌঁছে দিই। তবে এখনই সেটা কূটনৈতিকভাবে উচিত কি না, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন। তবে তেমনটাই হওয়া উচিত বলে মত দিলেন। আমি বললাম, তাঁর শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে পারলে আমি আনন্দিত হব।

মন্তব্য : গতকাল রাষ্ট্রদূত সিদ্দিকীর প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় নিলে এটা স্পষ্ট যে নতুন সরকার আমাদের কাছ থেকে 'স্বীকৃতি' লাভের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। এবং প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করেন, ভারতীয় সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ ঠেকাতে এই স্বীকৃতি একটি প্রতিসাম্য তৈরি করবে। আমি আমাদের নীতিগত অবস্থান যেভাবে বুঝতে পারি, কোনো একটি পর্যায়ে আমরা স্বীকার করব, স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে চাই। যা-ই হোক, আমি বিশ্বাস করি, নতুন সরকারকে সহানুভূতি দেখাতে এটাই হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও সহজতম উপায়। এই সরকারের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এমন পরিবর্তন আনবেন, যা আমরা দেখতে আগ্রহী। তাই আমি জরুরি ভিত্তিতে সুপারিশ রাখছি, সিদ্ধান্তটা এখনই নেওয়া উচিত, সন্দেহাতীতভাবে যা কয়েক দিনের মধ্যে আমরা নেবই। গণমাধ্যমকেও জানিয়ে দিতে হবে, আমরা নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছি। যুক্তরাজ্য, জাপান, বার্মা ও অন্যরা তো ইতিমধ্যেই এ পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে আমি অবশ্য এটাও মনে করি, এতে কিছু ঝামেলা তো আছেই। বোস্টার।

মুজিবকে সতর্ক করার দাবি

সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের বিষয়ে শেখ মুজিবকে সতর্ক করা নিয়ে নানাবিধ ভাষ্য রয়েছে। ১৯৭৭ সালে কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কিংবা অন্য কোনো গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সম্পর্কে অস্পষ্টতম কোনো সূত্র থেকেও অবহিত ছিল না। সত্যি বলতে কি, তখন থেকে সঞ্জয় গান্ধী রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (RAW)-এর নামকরণ করেন 'রিলেটিভ অব ওয়াইভস অ্যাসোসিয়েশন'।[১]

ভারতীয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৯৮৭ সালে লেখেন, 'ওই অভ্যুত্থান সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে আগাম তথ্য থাকা সত্ত্বেও তারা মুজিবকে বাঁচাতে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ১৯৭৭ সালের ৩০ নভেম্বর আমি ইন্দিরাকে তাঁর বাসভবনে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমরা জানতাম কিছু একটা ঘটতে চলেছে।'[২]

'র'-প্রধান রমেশ্বর নাথ কাও সংক্ষেপে আর এন কাও (১৯১৮-২০০২) নামে পরিচিত। বন্ধুরা তাঁকে জানতেন রামজি নামে। ১৯৮৮ সালে ভারতীয় ইংরেজি সাময়িকী *সানডে* এক নিবন্ধে উল্লেখ করে যে, 'র' ১৯৭৫ সালে ব্যর্থ হয়েছিল। এর কুশলীবরা এখন দাবি করছেন যে, মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তাদের কাছে আগাম তথ্য ছিল। কিন্তু তা প্রতিহত করতে তারা কিছুই করেনি।' ওই নিবন্ধের আরও দাবি, 'মুজিব হত্যাকাণ্ডে হতাশ হয়ে কাও ও

---

১. *The Judgement Inside story of the emergency in India*, Kuldip Nayar, Vikas Pub House, 1977, P. 82.
২. *Midnight Massacare in Dacca*, Sukharanjan Dasgupta, Vikas, 1978, P. 75.

শঙ্করণ নায়ার জিয়াউর রহমানকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্র করেন। কংগ্রেস সরকারের পতনলগ্নে এই ষড়যন্ত্র অনেকটা এগিয়ে ছিল।'

এ বিষয়ে সাবেক 'র'-প্রধান *সানডে*র ২৩-২৯ এপ্রিল ১৯৮৯ সংখ্যায় লিখেছেন :

> শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণনাশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সদস্যের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমরা আগাম তথ্য পেয়েছিলাম। আমি বিষয়টি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলি। তাঁকে আমরা বলি যে, এ-সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি। এসব সূত্রের পরিচয় যেকোনো মূল্যে গোপন রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে আমি ঢাকা সফর করেছিলাম। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার শেষ বৈঠকের এক পর্যায়ে আমি তাঁকে বঙ্গভবনের [সম্ভবত গণভবন] বাগানে একান্তে কিছু সময় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। সেখানে আমি তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা নিয়ে আমাদের জানা তথ্য তাঁকে অবহিত করি। কিন্তু তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বাহু দুলিয়ে বলেন, 'তারা আমার নিজের সন্তান, তারা আমার ক্ষতি করবে না।' আমি তাঁর সঙ্গে তর্কে যাইনি। শুধু এটুকু বলেছিলাম, এসব তথ্য নির্ভরযোগ্য এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি তা আমরা তাঁকে অবহিত করব। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের মার্চে আমি আমাদের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলাম। তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এবং তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক ও অশ্বারোহী ইউনিট তার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত শেখ মুজিব এসব সতর্কতা অগ্রাহ্য করেছিলেন।

জেনারেল জিয়াউর রহমানকে হত্যা করতে র-এর চক্রান্তের অভিযোগ সম্পর্কে কাও বলেন, 'এ ব্যাপারে আমি কিংবা আমার পরের দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শঙ্করণ নায়ারের জড়িত থাকার অভিযোগ এক দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত মিথ্যাচার।'

ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ভারতীয় লেখক পুপুল জয়কার ১৯৯২ সালে লিখেছেন :

> শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে ১৯৭৪ সাল থেকেই অবগত ছিলেন ভারতের শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড উইংয়ের প্রধান রমেশ্বর নাথ কাও। যেসব গোপনীয় প্রতিবেদন তাঁর হস্তগত হয় তাতে উল্লেখ ছিল যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘনিয়ে উঠছে।[৩]

---

৩. *Indira Gandhi An intimate biography*, by Pupul Jayakar, Pantheon Books, 1992, P. 220.

একই কথা কাওয়ের মৃত্যুর পর ইন্দোর মালহোত্রা ২৪ জানুয়ারি ২০০২ *দ্য হিন্দু* পত্রিকায় লিখেছেন। 'ক্যাপিটাল টক   এ রেটিসেন্ট স্পাইমাস্টার' শীর্ষক নিবন্ধে মালহোত্রা অবশ্য এই তথ্যও দেন যে, 'সিনিয়র বুশ যখন সিআইএর পরিচালক ছিলেন, তখন থেকেই বুশকে কাও ভালোভাবেই জানতেন।'[৪]

১৯৯৫ সালে আরেক ভারতীয় লেখক ভাশ্যাম কাস্তুরি লিখেছেন, 'র' ১৯৭৪ সালে মুজিবকে সতর্ক করেছিল।[৫]

মুজিবকে 'র'-এর সতর্ক করার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করেছেন মার্কিন মিশনারি ডাক্তার ও শল্যচিকিৎসক ড. ভিগো অলসেন। ১৯৬৬ সালে তিনি চট্টগ্রামের চকোরিয়ায় 'মালুমঘাট মেমোরিয়াল ক্রিশ্চিয়ান হসপিটাল' প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৩ বছর বাংলাদেশে থাকার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ড. অলসেন স্বাধীনতাযুদ্ধকালে মালুমঘাটে ছিলেন এবং তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস* তাঁকে 'ড. লিভিংস্টোনের ঐতিহ্যের ধারক' হিসেবে বর্ণনা করেছে। ড. অলসেন তাঁর বইয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন। আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তিনি ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম ভিসা (০০১) তাঁর নামেই ইস্যু করা হয়েছিল। তাঁর বাড়ি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলাইনায়।

১৯৯০ সালে *ডাক্তার-টু* নামে তাঁর একটি বই বের হয়। তাঁর লেখা বইয়ে তাঁকে 'ডিপ্লোম্যাট অব অমেরিকান বোর্ড অব সার্জারি' বলা হয়েছে। *ডাক্তার-টু* বইয়ের ২৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

> ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' প্রতিবেশী বাংলাদেশের ঘটনাবলির ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রেখে চলছিল। এটা তাদের পক্ষে সহজেই সম্ভব, কারণ সমগ্র দেশজুড়ে শীর্ষ পদগুলোতে তাদের গুপ্তচর নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। ১৯৭৫ সালের গোড়ায় 'র' ইঙ্গিত পায় যে বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের একটা চেষ্টা হতে পারে। এবং তারা এটাও লক্ষ করে যে, 'অন্য কতিপয় দেশের গোয়েন্দা সংস্থা ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 'র' তাদের সন্দেহ সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবহিত করেছিল। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। ১৯৭৫

---

৪. *Dynasties of India and beyond: Pakistan, Srilanka, Bangladesh*, Inder Malhotra, Haper Collins Publishers, India, 2004, P. 205.

৫. *Intelligence Services Analysis, Organization and Functions*, By Bhashyam Kasturi, Laneer Publishers, 1995, P. 44.

সালের মধ্য-জুনে 'র' মেজর ফারুক ও মেজর রশিদের নাম জানতে পেরেছিল। এবং তাদের কাছে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, জেনারেল জিয়ার সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়েছে।' ফারুক-রশিদ ও জিয়া—এঁদের মধ্যে কেউ একজন কাগজের একটা টুকরোয় কিছু একটা লিখেছিলেন বা আঁকিবুঁকি করে থাকবেন এবং নিশ্চিন্তে সেটি ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেন। 'র'-এর একজন এজেন্ট চাতুর্যের সঙ্গে সেই কাগজের টুকরোটি কুড়িয়ে নেন এবং ভারতে তাঁদের সংস্থার সদর দপ্তরে সেটি পাঠিয়ে দেন। সেই লেখা বা চিত্র 'র'-এর উচ্চপর্যায়কে নিশ্চিত করে যে, বাংলাদেশে একটি অভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে। মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 'র'-এর পরিচালক আর এন কাও নিজেই পান ব্যবসায়ী সেজে ঢাকায় আসেন। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে মুজিব বেশ কৌতুক বোধ করেন। গোয়েন্দা তথ্যকে তিনি গুরুত্ব দেননি। যদিও 'র'-প্রধান তাঁকে সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্য থেকে কয়েকটি নামও অবহিত করেন। ড. অলসেন অবশ্য এ প্রসঙ্গে ভারতীয় লেখক অশোক রায়নার বরাত দিয়েছেন।[৬]

এখন সুনির্দিষ্টভাবে জানা যাচ্ছে, মার্কিন প্রশাসনও মুজিবকে সতর্ক করেছিল। 'শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের খবর ওয়াশিংটনে পৌঁছার পর পররাষ্ট্র দপ্তরের বাংলাদেশ ডেস্কের সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। যদিও সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার মুজিবকে সতর্ক করেছিলেন।' এই তথ্য যিনি প্রকাশ করেন তিনি স্টিফেন আইজেনব্রাউন। তিনি পঁচাত্তরের আগস্টে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্মরত বাংলাদেশ ডেস্ক কর্মকর্তা এবং পরে দুবার ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে যথাক্রমে পলিটিক্যাল অফিসার (১৯৭৬-৭৮) ও পলিটিক্যাল কাউন্সিলর (১৯৯৬-৯৮) ছিলেন।

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় নেওয়া আইজেনব্রাউনের সাক্ষাৎকারের এই বক্তব্য সিআইএর স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরির দাবিকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। লরেন্স লিফশুলজ চেরির কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'অভ্যুত্থান কীভাবে ঘটল বলে আপনি মনে করেন?' জবাবে চেরি বলেন, 'সেটা এক কৌতুকপ্রদ কাহিনি। ঘটনা ঘটার পর আমরা বিষয়টি বুঝতে সচেষ্ট হই। তবে এটা যে ঘটতে যাচ্ছে সেই ইঙ্গিত আমরা আগে থেকে পাইনি। আমি যত দূর জানি, অভ্যুত্থান যে ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে দূতাবাসে আমাদের কাছে কোনো তথ্য ছিল না। আমরা কোনো

---

৬. *DAKTAR II :* Viggo Olsen, M. D. Moody Press, Chicago, 1990, P. 245.

পূর্বসতর্কতা সংকেত পাইনি। এ ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তি ছিল। ঘটনাটির পর আমি কিছু কানাঘুষা শুনেছি। তবে টাইম জোনের পরিবর্তনের কারণে বার্তাটি পররাষ্ট্র দপ্তর বিকেলের খবরে প্রচার করে। এ ব্যাপারটি বহু লোককে এ মর্মে সন্দিহান করে তোলে যে, মার্কিন দূতাবাস অভ্যুত্থানের বিষয়টি আগেভাগে জানত। আমি আপনাকে বলতে পারি যে, আমরা আগে থেকে জানতাম না।' লিফশুলজ পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'ঢাকায় সিআইএ স্টেশন চিফ ছিলেন আপনি। অথচ একটা অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনার আগে থেকে বিন্দুবিসর্গও জানা ছিল না?' চেরির উত্তর: 'একজন পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে আমার আগে থেকে জানা ছিল না যে, একটা অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক।'

আইজেনব্রাউন ঘনিষ্ঠভাবে বাংলাদেশকে জানার সুযোগ পেয়েছেন। পঁচাত্তরের গ্রীষ্মে ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ (আইএনআর)-এর বাংলাদেশ ডেস্ক দিয়ে আইজেনব্রাউনের কূটনৈতিক জীবনের শুরু। তিনি বাংলা ভাষায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ২০০২ সালে তিনি অবসরে যান।

স্টিফেন আইজেনব্রাউনের সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার ধারণ করা শুরু হয় ২০০৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর। প্রায় ১ লাখ শব্দের এই সাক্ষাৎকারে স্টিফেন আইজেনব্রাউন উল্লেখ করেন, বোস্টার সম্প্রতি মারা গেছেন। এ থেকে ধারণা করা যায়, তাঁর সাক্ষাৎকার ধারণ ২০০৫ সালের ৭ জুলাই বোস্টারের মৃত্যুর পরও অব্যাহত ছিল। তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায় যে তিনি বাংলাদেশের বহু ঘটনার সাক্ষী।

বোস্টারের সাক্ষাৎকার ধারণ করার এক যুগের বেশি সময় পর স্টুয়ার্ট কেনেডি আইজেনব্রাউনের সাক্ষাৎকার নেন।

সাক্ষাৎকারে আইজেনব্রাউন বলেছেন, শেখ হাসিনা যদিও মনে করেন, তাঁর বাবার হত্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত থাকতে পারে, কিন্তু তা ঠিক নয়। তাঁর ভাষায়, 'আমরা অবশ্যই মুজিব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত ছিলাম না।' আইজেনব্রাউনের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হাওয়ার্ড বি শেফার। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ওয়াশিংটন ডিসিতে তিনি তাঁর বাসভবনে এই লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, লরেন্স লিফশুলজের লেখা বই তিনি পড়েননি কিন্তু মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তাঁর দাবি সত্য নয়। ওই হত্যাকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র বা সিআইয়ের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। এই বক্তব্য তাঁর স্ত্রী শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত

তেরেস্তা শেফারও সমর্থন করেন।

যোগাযোগ করা হলে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে ১২ আগস্ট ২০১০ নিশ্চিত করেন, আইজেনব্রাউন বর্তমানে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন এবং কংগ্রেস অনুমোদিত অন্যান্য মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ক বা প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সতর্ক করা

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় সকাল আটটা (বাংলাদেশ সময় ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা সাতটা)। হেনরি কিসিঞ্জারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠক করছেন। এ সময় বাংলাদেশের অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে নিকটপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া-বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলফ্রেড আথারটন বলেন, এটা হচ্ছে উল্লেখযোগ্যভাবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত একটি অভ্যুত্থান। [চুয়াত্তরের অক্টোবরে কিসিঞ্জারের সফরসঙ্গী হিসেবে আথারটন শেখ মুজিব ও ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন] এর পরই কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন, 'গত বছরে আমরা কি তাঁকে (শেখ মুজিব) বলিনি?'

আথারটন : মার্চেই আমরা বেশ আলামত পেয়েছিলাম।

কিসিঞ্জার : আমরা কি তাঁকে তা জানাইনি?

আথারটন : আমরা তাঁকে বলেছিলাম।

কিসিঞ্জার : কে বা কারা এটা করতে পারে, সে বিষয়ে একটা ধারণা কি তাঁকে আমরা দিইনি?

আথারটন : আমরা তাঁকে নামধাম বলেছিলাম কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

হিল্যান্ড : এ বিষয়ে তাঁর কাছে আমরা কিছুটা অস্পষ্ট ছিলাম।

আথারটন : তিনি (মুজিব) তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন। বলেন, তাঁর সঙ্গে এমন কিছু কেউ করতেই পারে না।

কিসিঞ্জার : তিনি (মুজিব) ছিলেন বিশ্বসেরা বোকাদের অন্যতম।

কিসিঞ্জার এর পরই নির্দিষ্টভাবে অভ্যুত্থানকারীদের পরিচয় জানতে চান। আথারটন বলেন, 'তাঁরা সবাই সেনা কর্মকর্তা। মধ্যম ও জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের—সাধারণভাবে যাঁরা আগের নেতৃত্বের চেয়ে কম ভারতপন্থী; বরং মার্কিনপন্থী ও সোভিয়েতবিরোধী। কিসিঞ্জার বলেন, 'অবশ্যই এটা অনিবার্য!' একটু বাদে বলেন, 'না, ঠিক মার্কিনপন্থী হবেই, তা আমি বলতে চাইনি।'

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকের বিবরণ এবং ১৯৭৪ সালের উল্লিখিত তারবার্তা থেকে দেখা যায়, হেনরি কিসিঞ্জার যখন বলছেন, 'আমরা কি মুজিবকে জানাইনি', তখন তাঁর প্রশাসনের অবশ্যই জানা যে, মুজিব হত্যাকাণ্ডের অন্যতম কুশীলব ফারুক রহমান চুয়াত্তরের অক্টোবরে কিসিঞ্জারের ঢাকা সফরের আগেই অভ্যুত্থান ঘটানোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

পঁচাত্তরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্মরত স্টিফেন আইজেনব্রাউন মার্কিন কথ্য ইতিহাস প্রকল্পকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, 'মুজিবকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু কাদের পক্ষ থেকে হুমকি আসতে পারে, সে বিষয়ে তাঁকে বলা হয়নি।'

এমনকি আইজেনব্রাউন দাবি করেন, 'অভ্যুত্থানকারীদের পরিচয় জেনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর অবাক হয়েছিল।' ১৯৭৫ সালের ১৫ ও ১৬ আগস্ট সিআইএর দলিলেও দেখা যায়, তারা অভ্যুত্থানকারীদের পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। অথচ ফারুকের অভ্যুত্থান-পরিকল্পনা মার্কিন কর্মকর্তা গ্রেশামের কাছে প্রকাশ করার পাঁচ মাস পর কিসিঞ্জার বাংলাদেশের 'উষ্ণ আমন্ত্রণে' ঢাকায় আসেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন। আর তত দিনে (১৯৭২-৭৪) অন্তত তিনবার মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৈয়দ ফারুক রহমানের সাক্ষাৎ ঘটে।

স্টুয়ার্ট কেনেডির এক প্রশ্নের জবাবে আইজেনব্রাউন বলেন, 'পঁচাত্তরের গ্রীষ্মে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বনিয়োজিত প্রেসিডেন্ট। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় বীর। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধের প্রতীক। যদিও তিনি যুদ্ধকালে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। বাহাত্তরের গোড়ায় যখন তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বীরোচিত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন না, যা বাংলাদেশের জন্য খুবই দরকারি ছিল। তিনি সব ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করলেন। বাংলাদেশ নিপতিত হলো একটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়। আমি অনুমান করতে পারি, পঁচাত্তরের গ্রীষ্মে বাংলাদেশের রাস্তায় দাঁড়ানো ছিল সত্যি ভয়ংকর। মুজিব তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী গড়ে তোলেন। সেই বাহিনী ভিন্নমত দমনে ব্যবহৃত হতো। মুজিবের নিরাপত্তা বাহিনীর নাম ছিল রক্ষীবাহিনী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীকে অপমানিত করে গঠিত হলো রক্ষীবাহিনী। সুতরাং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অভ্যুত্থানের

নীলনকশা তৈরি হতে থাকল। এমনকি মুজিবের জীবনের প্রতিও এল হুমকি। বাংলাদেশের লোকজন এ নিয়ে দূতাবাসকে বলাবলি শুরু করল। ওয়াশিংটনে এ ব্যাপারে প্রতিবেদন আসতে থাকল এবং সেটা ছিল এতটাই তীব্র ধরনের যে কিছুদিনের মধ্যে স্পষ্ট হলো, এসব কথাবার্তা নিতান্তই খোশগল্প নয়। শেখ মুজিবের জীবন সংকটাপন্ন বলেই প্রতীয়মান হলো।'

কে বলতে পারবে?

১৯৯৭ সালের আগস্টে লরেন্স লিফশুলজ লিখেছিলেন, 'প্রকৃত ঘটনাটি কে আমাকে খুলে বলতে পারবে? আমার মনে হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের কোনো সদস্য হয়তো বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য বের করে আনতে পারবেন। এ পর্যায়ে আমি কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি তখন কংগ্রেসের এশিয়া-বিষয়ক সাবকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সোলার্জের স্টাফদের মধ্যে তখন এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে প্রকৃত সত্য বের করে আনতে আগ্রহী ছিলেন।'

লিফশুলজ আরও উল্লেখ করেন, 'পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে একটি সাধারণ এবং সরাসরি প্রশ্ন রাখার জন্য আমি স্টিফেন সোলার্জকে বলি, যার উত্তরও হতে হবে সহজ ও সরাসরি অর্থাৎ কেবল 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। আমার প্রশ্ন ছিল : '১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতদের কারও সঙ্গে কি মার্কিন দূতাবাসের কোনো কর্মকর্তার যোগাযোগ ছিল?' প্রস্তাবিত প্রশ্নের সরাসরি জবাব চাওয়ার একটা কারণও ছিল। সেটা হলো এই যে, আমার আশঙ্কা ছিল, কূটনৈতিক পদ্ধতিতেই এর উত্তরটি চাপা দেওয়ার একটা চেষ্টা চলবে। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসীয় কোনো কমিটির কাছে কৌশলে মিথ্যা বলা সম্ভব। আর এ রকম ঘটনা ঘটেছেও। অবশ্য এতে সংশ্লিষ্টদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনাও থাকে।'

তাঁর বর্ণনায়, 'এ প্রসঙ্গে "হ্যাঁ" সূচক উত্তর পাওয়া গেছে। পররাষ্ট্র দপ্তর এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে, আগেই যোগাযোগ হচ্ছিল। তবে পররাষ্ট্র দপ্তর দাবি করে, মার্কিন দূতাবাস এই যোগাযোগের ব্যাপারে মুজিব সরকারকে অবহিত করেছিল। আমি সোলার্জের স্টাফদের বলেছিলাম, এভাবে সতর্ক করে দেওয়া নিছকই রহস্যজনক, কারণ হত্যাকারীরা তো মুজিবের সরকারেরই লোক। আমি বলেছিলাম, মুজিব সরকারের ঠিক কাকে

এ বিষয়ে "অবহিত" করা হয়েছিল, সেটা সোলার্জের স্টাফরা অনুসন্ধান করে দেখুক। কারণ, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে, তিনি কি চেরির গোয়েন্দা বাহিনীর কেউ ছিলেন, নাকি সেই লোকটি ছিলেন মোশতাক নিজেই। এর কোনো সরাসরি জবাব আমি পাইনি। আমি যা পেয়েছি তা স্পষ্ট তো ছিলই না, বরং ছিল কথার মারপ্যাঁচে ধোঁয়াটে।'

এখন যদিও জানা যাচ্ছে যে, বোস্টার মুজিবকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু লিফশুলজ-বর্ণিত রহস্যজনক অবস্থার তাতে যথেষ্ট হেরফের ঘটেছে বলা যায় না। লিফশুলজের একটি প্রশ্নের উত্তর মিলেছে আইজেনব্রাউনের কথায়। তিনি ইতিহাস প্রকল্পকে বলেন, 'আমি স্মরণ করতে পারি যে ওই সময়ে পররাষ্ট্র দপ্তরে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কথা উঠেছিল, শেখ মুজিবের জীবন যে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না। আলোচনায় মত এসেছিল, হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমাদের দায়দায়িত্ব রয়েছে; এবং আমাদের রাষ্ট্রদূত সেটা পালন করেছিলেন।'

> স্টুয়ার্ট কেনেডি : কে ছিলেন আমাদের রাষ্ট্রদূত?
>
> আইজেনব্রাউন : ডেভিস ইউজেন বোস্টার। সম্প্রতি (২০০৫) তিনি মারা গেছেন। তিনি মুজিবের কাছে গিয়েছিলেন। সময়টা সম্ভবত পঁচাত্তরের জুলাই মাসের শেষ দিক কিংবা আগস্টের গোড়ায়। বোস্টার মুজিবকে কী বলবেন, সেটা সম্ভবত আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটার ধরন কী ছিল, তা আমি এখন হলফ করে বলতে পারব না। যা-ই হোক, বোস্টার মুজিবকে কী বলবেন, সেটা জানাতে সে সম্পর্কে তাঁর ওপর যে নির্দেশনা ছিল তার মূল কথা ছিল, 'আমরা অভ্যুত্থান সংঘটনের নানা হুমকির কথা শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি আপনার (মুজিব) বিরুদ্ধে অনেক হিংসাত্মক পরিকল্পনার কথাও।' তবে কারা এর সঙ্গে জড়িত, বোস্টার তাদের নাম বলেননি। তিনি শুধুই সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মুজিবকে সতর্ক করেছিলেন। আমি যত দূর স্মরণ করতে পারি, মুজিব সে বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দেননি। দায়সারা ভাব দেখিয়েছিলেন। মুজিব এমনকি বোস্টারকে বলেছিলেন, 'দেখুন, উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি আমার লোকদের চিনি। তারা আমাকে ভালোবাসে এবং সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

শেখ মুজিবুর রহমানের তৎকালীন রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ ৯ অক্টোবর ২০১০ লেখককে বলেন, 'আমার যত দূর মনে পড়ে, পঁচাত্তরের জুলাইয়ের শেষে বোস্টার বর্তমান গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তবে সেটা ছিল সৌজন্য সাক্ষাৎকার। ওই বৈঠক

যথারীতি কেবল দুজনের মধ্যেই হয়েছিল।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তোফায়েল মন্তব্য করেন: 'সম্ভাব্য অভ্যুত্থান বিষয়ে বোস্টার বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করেছিলেন, এমনটা আমি জানি না। কখনো শুনিনি। বোস্টার কোনো অভ্যুত্থান সম্পর্কে বললে সেটা তো একটা সাংঘাতিক কথা। তাহলে তো বঙ্গবন্ধুর মুখে একটা চিন্তার ছাপ পড়ত। সে রকম কিছু দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। বোস্টার এরকম কিছু বললে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে আমার অন্তত জানার কথা।' তিনি বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। তিনি আমাকেও তা বলেছিলেন। এবং পরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রধান কাও আমার কাছে একই রকম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।' তবে এ প্রসঙ্গে তোফায়েল স্মরণ করেন যে, 'পঁচাত্তরের ১৪ আগস্ট বিকেলে গণভবনের চত্বরে আমরা পায়চারি করছিলাম। বঙ্গবন্ধু ছাড়া আমি, সাংবাদিক এবিএম মূসা ও মহিউদ্দিন আহমদ [জনাব আহমদ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের একজন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগদান করে এর জ্যেষ্ঠ সভাপতি মনোনীত হলেও তার পরও তিনি 'ন্যাপের মহিউদ্দিন' নামে পরিচিত ছিলেন। মুজিবের বিশেষ বন্ধু।] ছিলাম। ওই সময় চিলির আয়েন্দে হত্যাকাণ্ড নিয়ে বঙ্গবন্ধু আলোচনা করেছিলেন।' লেখকের সঙ্গে আলোচনায় এবিএম মূসা বিষয়টি সমর্থন করেন।

স্টিফেন আইজেনব্রাউন তাঁর ওই সাক্ষাৎকারে স্মৃতিচারণা করেন যে, 'বাংলাদেশ ডেস্কে আমার অ্যাসাইনমেন্টের শেষ কর্মদিবস ছিল শুক্রবার ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। আমি রীতি অনুযায়ী আমার সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সকালে আমার কাজ ছিল শুধু অফিসে এসে সহকর্মীদের কাছে বিদায় নেওয়া। কারণ, পরবর্তী সোমবার সকালেই আমার ক্লাস। ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটে বাংলা ভাষার ওপর প্রশিক্ষণ। অ্যান গ্রিফিন ছিলেন ডেস্ক অফিসার। এক দিন আগে তিনি দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। সে কারণে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সকালে আমি একেবারেই আয়েশি ভঙ্গিতে অফিসে পৌঁছলাম। কিন্তু এসে দেখলাম, সবাই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করছেন। কারণ, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই শেখ মুজিব এবং তাঁর পরিবারের সব সদস্য নিহত হয়েছেন। হ্যাঁ, সেটা ছিল এক চরমতম নৃশংসতা। মধ্যম সারির কতিপয় সেনা কর্মকর্তা মুজিবের বাড়িতে এসেছিলেন মধ্যরাতে। তাঁরা মুজিব, তাঁর স্ত্রী, শিশুসহ সম্ভবত এক ডজনের বেশি লোককে হত্যা করেছিলেন।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : আপনি কি জানেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে কি না?

আইজেনব্রাউন : না। সাধারণভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সহিংসতা নেই। কিন্তু ১৯৭০-এ শুরু হওয়া স্বাধীনতাসংগ্রাম থেকে এখানে উল্লেখযোগ্য সহিংসতা বিরাজ করছে। মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। আমি অনুমান করি, দক্ষিণ এশিয়াজুড়েই সময়ে সময়ে বড় ধরনের বিক্ষিপ্ত সহিংসতার ইতিহাস রয়েছে। উত্তেজনা যখন বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখনই এসব ঘটে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড তেমনি একটা প্রেক্ষাপটে ঘটেছিল।

শেখ হাসিনা অসন্তুষ্ট

স্টিফেন আইজেনব্রাউন মন্তব্য করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শেখ হাসিনার তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। কারণ, তিনি মনে করেন, তাঁর বাবার হত্যাকাণ্ডে হয় যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল, নচেৎ তারা আগেভাগেই জানত। কিন্তু তারা ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ঠেকাতে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যাচ্ছে, ঢাকায় নিযুক্ত সাবেক রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল ব্যক্তিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের ফিরিয়ে দিতে আন্তরিক ছিলেন। আইজেনব্রাউন ইঙ্গিত দেন যে বাংলাদেশের ত্রুটিপূর্ণ আইনি ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতন চালানোর রেকর্ড থাকার কারণে তাতে বিঘ্ন ঘটে।

উল্লেখ্য, আইজেনব্রাউন তাঁর সাক্ষাৎকারে মুজিব হত্যাকাণ্ডে মার্কিন ভূমিকা ও সে বিষয়ে শেখ হাসিনার মনোভাব ব্যাখ্যা করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। ২০০০ সালের মার্চে বিল ক্লিনটন ঢাকা সফর করেন। এ সময় লরেন্স লিফশুলজ *প্রথম আলো*তে লেখেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই ইস্যু তোলার জন্য এখন অত্যন্ত উপযুক্ত অবস্থানে আছেন। ২৫ বছর আগে তাঁর মা, বাবা, ১২ বছরের ভাইসহ পরিবারের অনেক সদস্য নিহত হয়েছেন। সে জন্য শেখ হাসিনা ও অন্যদের জানার অধিকার আছে, প্রকৃতই কী ঘটেছিল।'

আইজেনব্রাউন তাঁর সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের কতিপয় বন্ধুর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের অন্যতম সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী। আইজেনব্রাউন আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০০ সালের মেয়াদে বঙ্গবন্ধুর দণ্ডিত ঘাতকদের দেশে আনার প্রচেষ্টার বিবরণ দেন। আবুল হাসান চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমার

মনে আছে, ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলেন, তারা (অভিযুক্তরা) এ দেশে থাকুক তা আমি দেখতে চাই না।' এ সময় সাবেক পররাষ্ট্রসচিব শফি সামি ও মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল রেনো জেনেট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের ত্রুটিপূর্ণ আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এই যুক্তি আমরা মেনে নিতে অপারগ।' শেখ হাসিনার অসন্তোষ থাকা প্রসঙ্গে আবুল হাসান চৌধুরীর মন্তব্য : 'আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, তাঁর যদি একটা ক্ষোভ থেকেও থাকত, বাস্তবতার নিরিখে সেখানে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে মার্কিন প্রশাসন যথেষ্ট উদ্যোগ না নিলেও সেখানকার দুই বড় দলেই মুজিবকে শ্রদ্ধা করার মতো প্রচুর লোক রয়েছেন। তাই সেদিক থেকে আমি বলব, আইজেনব্রাউনের উক্তি একটু বেশি তীব্র।'

মার্কিন কথ্য ইতিহাসবিদ চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডির নেওয়া উক্ত সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নিচে অবিকল তুলে ধরা হলো :

> স্টুয়ার্ট কেনেডি : আমি আসলে মুজিব পরিবারের কথা ভাবছিলাম। আমি বলতে চেয়েছি—
>
> আইজেনব্রাউন : না। এটা কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে নেই। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে অভ্যুত্থানকারীরা প্রত্যেককে হত্যা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডটা ১৯১৮ সালে রাশিয়ার রাজকীয় পরিবারের হত্যাকাণ্ডের থেকে তেমন আলাদা নয়। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বাংলাদেশিরা যতটা বিস্মিত হয়েছে, প্রায় ততটাই হতবাক হয়েছে মার্কিনরা। আমি এটা বললাম এ কারণে যে মুজিব পরিবারের বেঁচে যাওয়াদের একজন হলেন শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি তখন দেশে ছিলেন না। ১৯৯৬ সালে আমি যখন চাকরিসূত্রে দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলাম, তখন শেখ হাসিনাই ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এবং আমি জানি, তিনি বিশ্বাস করেন যে, মার্কিনরা আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আগেভাগেই জানতে পেরেছিল। কিন্তু তা প্রতিহত করতে তারা ভূমিকা রাখেনি। উপরন্তু, তাঁর এমন বিশ্বাসও রয়েছে যে এই হত্যাকাণ্ডে হয়তো মার্কিনদের হাত রয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ ডেস্কে কর্মরত একজন ব্যক্তি হিসেবে আমি বলতে পারি, যুক্তরাষ্ট্র শেখ মুজিবকে সতর্ক করে দিয়েছিল, যার বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি। যুক্তরাষ্ট্র খুব বিস্মিত হয়েছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে এই অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের পরিচয় জেনে। আমাকে বিশ্বাস করুন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বাংলাদেশ ডেস্ক শোকাহত হয়েছিল।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : শেখ মুজিব কি তখন জনপ্রিয় ছিলেন? আমি বলতে চাইছি যে তিনি কি এমন পর্যায়ে গিয়েছিলেন যে আমরা চাইছিলাম তিনি বিদায় নিলেই ভালো হয়? কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, সেই সময়ে তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণা কেমন ছিল?

আইজেনব্রাউন : হ্যাঁ, শেখ মুজিবের তখন কোনো প্রশাসনিক সামর্থ্য ছিল না। এবং তখন তিনি কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তর করেছিলেন এবং দেশের ভয়ানক হয়ে ওঠা অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে নজর দিচ্ছিলেন না।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : তা আমরা তাঁর প্রতি কেমন মনোভাব পোষণ করছিলাম? আমি বোঝাতে চাইছি, কাউকে প্রলুব্ধ করা কিংবা আমরা কি আশা করছিলাম যে সেখানে অন্য কেউ এসে পড়বে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবে? আমি আসলে বোঝাতে চাইছি, সেই সময়ে বাংলাদেশের প্রতি আমেরিকার অনুভূতি কী ছিল, সেটা আমি উপলব্ধি করতে চাইছি।

আইজেনব্রাউন : রাষ্ট্রদূত বোস্টার যুক্তরাষ্ট্রকে মুজিবের কাছ থেকে কিছুটা তফাতে রাখতে চাইছিলেন। কারণ, মুজিব ক্রমাগতভাবে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠছিলেন। মৌলিক অধিকার স্থগিত করেছিলেন। এবং বাস্তবে তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত বাহিনি গড়ে তুলছিলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ছিল অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের সম্পর্ক। আমরা সেখানে যথেষ্ট সম্পদের জোগান দিয়েছিলাম। খাদ্যসাহায্যের পরিমাণটা যথেষ্টই ছিল বলতে হবে। তবে বাংলাদেশের প্রয়োজনটা ছিল সীমাহীন। যুদ্ধের অব্যবহিত আগে তারা একটি প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। এরপর এল নয় মাসের গৃহযুদ্ধ ও গণহত্যা, মানবিক চাহিদা ছিল অসীম। এবং আমরা উদারতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছিলাম। তবে ওই সময় আমরা অর্থনৈতিক সহায়তা এবং রাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিলাম। মুজিব সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। এবং সোভিয়েতদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল বাংলাদেশে। তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন, যা ওয়াশিংটন সুনজরে দেখত না। তবে সমাজতন্ত্র বিষয়ে তিনি যা বলতেন, তা ছিল অবশ্যই বাগাড়ম্বরপূর্ণ। আমি এমন কিছুই জানি না যে তিনি নির্দিষ্টভাবে এমন কোনো নীতির বাস্তবায়ন করেছিলেন, যাকে সমাজতান্ত্রিক বলতে পারেন। তাঁর সরকারের কাঠামোতে সমাজতন্ত্রের কোনো ছাপ ছিল না। সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশিরা একটি সরকারের মধ্যে সবাই একত্র হয়েছিল। সুতরাং রাজনৈতিকভাবে আমাদের সম্পর্ক ছিল শীতল। এবং তখন শেখ মুজিবের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কিসিঞ্জারের হাতে কোনো সময় ছিল না।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : ১৯৯৬-তে আপনি যখন বাংলাদেশে গেলেন, তখন

সেখানে পরিস্থিতি কেমন ছিল?

আইজেনব্রাউন : সেটা ছিল বেশ চমকপ্রদ। রাজনৈতিক দিকটায় আমি নজর দিয়েছিলাম। গত ২০ বছরে বাংলাদেশ কতটা এগিয়েছে? যেসব পরিবর্তন আমি লক্ষ করলাম, তার সবটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ১৯৭৫ সাল এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমি আগে যা বলেছিলাম, ১৯৯৬ সালেও লক্ষ করি যে সেটা প্রাসঙ্গিক। তার কারণ, মুজিবের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যা সত্তরের দশকে নিন্দিত হয়ে পড়েছিল, সে দলটির পুনর্জন্ম ঘটেছে। মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা সদ্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। জেনারেল জিয়া, যিনি তাঁর নিজ দল বিএনপি সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর পত্নী বেগম খালেদা জিয়াকে শেখ হাসিনা পরাজিত করেছেন। ১৯৭৮ সালে সৌভাগ্যবশত বিএনপিরও জন্ম আমি দেখেছিলাম।

আমি যেমনটা বলছিলাম, ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড-উত্তর সময়ে আওয়ামী লীগ ছিল নিন্দিত। এবং বহু বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার তেমন ভূমিকা অনুভূত হয়নি। শেখ হাসিনা দেশের বাইরে ছিলেন। দেশে থাকলে তিনিও হত্যার শিকার হতেন। ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে আমি যখন ঢাকায় পৌঁছাই, তখন তিনি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মত অনুযায়ী, সে নির্বাচন ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের সম্ভবত ১০ দিন পরই আমি ঢাকায় পৌঁছাই। সেটা ছিল একটা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক ইতিহাসে সেটা এক স্মরণীয় ঘটনা।

শেখ হাসিনা দীর্ঘকাল ধরে এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে তাঁর পিতার হত্যাকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল কিংবা আসন্ন অভ্যুত্থান সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র জানত। কিন্তু তাঁর পিতাকে হুঁশিয়ার করে দিতে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ভূমিকা রাখেনি। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর মনে তীব্র অসন্তোষ রয়ে যায়। যেমনটা আমি আগেই বলেছি, আমরা শেখ মুজিবকে সতর্ক করেছিলাম যে তাঁর হত্যাকাণ্ড আসন্ন। কিন্তু তিনি তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমরা অবশ্যই তাঁর হত্যাকাণ্ডে কোনো ভূমিকা পালন করিনি।

আইজেনব্রাউন বলেন :

১৯৯৬ সালে আমি যখন বাংলাদেশে গেলাম, আমলাতান্ত্রিক ইতিহাস [১৯৭৫ সালের] দূতাবাস এবং ডেস্ক থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের ঘটনাবলি যাঁরা দেখাশোনা করতেন, তাঁরা ইতিমধ্যে অবসরে গেছেন কিংবা মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং ১৯৯৬ সালে এসব বিষয় যাঁরা দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁরা সেই মুহূর্তে তাঁদের সামনে উপস্থিত ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিলেন।

ঢাকায় তখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ডেভিড এন মেরিল। তিনি আগে ছিলেন একজন সাহায্য কর্মকর্তা। তিনি ছিলেন সক্রিয়, সুদক্ষ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বাংলাদেশিদের তিনি পছন্দ করেছিলেন এবং তাদের রাজনৈতিক উদ্বেগের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। মেরিল যখন জানলেন যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমির কিছুটা আমি জানি, তখন তিনি তা জানতে আগ্রহী হলেন। সেই পটভূমিটা সামনে এল যখন শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত তাঁর পিতার খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন।

মুজিব হত্যাকাণ্ডের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের রেহাই দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এসেছিলেন সেনাবাহিনী থেকে। তাঁরা মধ্যম সারির কর্মকর্তা। তাঁদের অধিকাংশই সেনাবাহিনী থেকে অপসারিত হওয়ার পর বিদেশে কূটনৈতিক চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁরা যাতে দেশের বাইরে থাকেন, সেটাই ছিল লক্ষ্য। ২০ বছর পর দেখলাম, খুনিদের অনেকে ঢাকায় বসবাস করছেন। আর অল্পসংখ্যক সন্দেহভাজন বাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে।

আইজেনব্রাউন আরও বলেন :

শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে আগের পর্বের (১৯৯৬-২০০১) মতোই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নেন। এই পর্বের ফলাফল সম্পর্কে উইকিলিকস সূত্রে কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। তবে হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এবং ওয়াশিংটনের অবস্থানের মধ্যে একটা তফাত আইজেনব্রাউনের মন্তব্যে কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আইজেনব্রাউন তাঁর সাক্ষাৎকারে তথ্য দেন :

ঢাকার তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল শেখ হাসিনার ইচ্ছাপূরণে সম্পূর্ণরূপে আগ্রহী ছিলেন। এক সন্ধ্যায় তিনি আমার সঙ্গে বসলেন। বললেন, 'কল্পনা করুন, কেনেডি হত্যাকাণ্ড লি হারভে [কেনেডির ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত—১৯৬৩ সালে ডালাসের রাস্তায় ফেরারি অবস্থায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।] অন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁদের সম্পৃক্ততা আমরা শনাক্ত করেছিলাম। আমরা জানতে পেরেছিলাম যে সন্দেহভাজনেরা বাংলাদেশে প্রকাশ্যে বাস করছেন। আমরা কি তখন আশা করতাম না যে, তাঁদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকার আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা দেবে?' এই ইস্যু যখন প্রথমে এল, তখন মেরিল সন্দেহভাজনদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আনতে নিবেদিতচিত্তে কাজ করেছিলেন। তবে আমার মনে হয় না যে আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনো একজনকেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

শেখ হাসিনার সঙ্গে এক দিন

আইজেনব্রাউনের সঙ্গে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তবে আলোচ্য বিষয়ে তখন তাঁদের মধ্যে কোনো কথা হয়েছিল কি না তা তিনি উল্লেখ করেননি। আইজেনব্রাউনের বর্ণনায় :

> কংগ্রেসম্যান বিল রিচার্ডসন ঢাকায় এসেছিলেন। রাষ্ট্রদূত মেরিল তাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁদের সঙ্গী হলাম। মেরিল আলোচনার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন, 'আইজেনব্রাউন বাংলা বলতে পারেন।'
>
> কুড়ি বছরের অনভ্যাসে বাংলা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। প্রধানমন্ত্রী বাংলায় বললেন, 'কীভাবে আপনি বাংলা শিখলেন?' আমি বাংলায় জবাব দিলাম। বললাম, 'কুড়ি বছর আগে আমি ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে এসেছিলাম।' তিনি বললেন, 'আপনি কি পরিবারসহ এসেছেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী এবং তিন সন্তানের মধ্যে দুজন সঙ্গে আছে।' বললেন, 'বাংলাদেশ কেমন দেখলেন? আপনার কি জায়গাটা পছন্দ?' বললাম, 'দেশটি খুবই সুন্দর।' প্রধানমন্ত্রীর জিজ্ঞাসা, 'আপনি কি কোনো ভিন্নতা খুঁজে পেলেন?' বললাম, 'নিশ্চয়ই। বিপুল মানুষ। বড় বড় দালানকোঠা। সুপ্রশস্ত রাজপথ।' শেখ হাসিনা আমার সঙ্গে কথা শেষ করলেন এই বলে যে, 'আপনি ঢাকায় ফিরে আসায় আমরা খুশি।'

ভারতীয় হস্তক্ষেপের আশঙ্কা

শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরে বাংলাদেশে ভারতের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে শঙ্কিত ছিল খন্দকার মোশতাক আহমদ ও পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সরকার। সে কারণে ভারতের মনোভাব বুঝতে পঁচাত্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক জেনারেল জে এফ আর জ্যাকবের ওপর বিশেষ নজর রাখছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল ডেভিড এ কর্ন। কিসিঞ্জার প্রশাসন তাঁকে এ কাজে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল।

১৭ আগস্ট ১৯৭৫ 'বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সম্পর্কে জেনারেল জ্যাকব' শীর্ষক এক সংক্ষিপ্ত তারবার্তায় ডেভিস ইউজিন বোস্টার লিখেছিলেন :

> জ্যাকবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনে কনসাল জেনারেল কর্নকে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হোক। আমরা বিশ্বাস করি, এই মুহূর্তে পাল্টা অভ্যুত্থান বা প্রতিরোধের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। বাংলাদেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্র হয়নি, ভারতকে এটা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে তারা ভুল না বোঝে।

ডেভিড কর্ন ১৯৮৮ সালে টোগোয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে অবসর নেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৩। কর্ন ওয়াশিংটনে বসবাস করছেন বলে তাঁর স্ত্রী রবার্টো কোহেন (ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের জ্যেষ্ঠ ফেলো) এ লেখককে নিশ্চিত করেন। পঁচাত্তরে ভারতীয় সামরিক অভিযানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কর্নের মূল্যায়ন জানতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ২০০৯ সালে তিনি লেখককে এক সংক্ষিপ্ত ই-মেইলে বলেন, 'জ্যাক জেকবের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর সঙ্গে মতপার্থক্যে যেতে চাই না।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অবমুক্ত করা দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, ডেভিড কর্ন সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়ে তথ্য জানতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক জেনারেল জ্যাক জ্যাকবের ওপর অনেকটাই নির্ভর করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে জেনারেল জ্যাক জ্যাকব লেখককে বলেন, 'ওই সময় যখনই দেখা হয়েছে, সব সময় মি. কর্নের একটাই জিজ্ঞাসা ছিল, আমরা কি বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছি?'

একটি তারবার্তায় বোস্টার লিখেছেন, ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের বাঙালি রাজনৈতিক কর্মীর ভগ্নিপতি একজন কর্নেল। ঢাকা সেনানিবাসের অর্ডন্যান্সে কর্মরত। তাঁর কাছ থেকে তিনি জেনেছেন, বাংলাদেশ রাইফেলসের সীমান্ত চৌকি পশ্চিমে হিলি ও পূর্বে কুমিল্লার সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী শক্তি বৃদ্ধি করেছে বলে খবর এসেছে। ওই কর্নেলের বক্তব্য অনুযায়ী, 'সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যকে অবস্থান নিতে বলা হয়েছে।'

বার্তায় বোস্টার লেখেন :

> কর্নেলের ওই বক্তব্য আমরা এখনো যাচাই করতে পারিনি। তবে যদি তা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর তৎপরতাকে ভারতীয় সেনা চলাচলের পাল্টা সাড়া হিসেবেই দেখা যেতে পারে। কর্নেল যেহেতু সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স বিভাগের, তাই বিষয়টি তাঁর জানার কথা।

বোস্টারের ওই বার্তা ওয়াশিংটনে পৌঁছানোর পর কিসিঞ্জার তা 'অগ্রাধিকার' ভিত্তিতে কাঠমান্ডু ও কলম্বোর মার্কিন দূতাবাসকে অবহিত করেন।

সীমান্তে শক্তি বৃদ্ধি

১৮ আগস্ট রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম স্যাক্সবি দিল্লি থেকে ওয়াশিংটনকে জানান :

> কলকাতার কনসাল জেনারেল বাংলাদেশ সীমান্তে বসবাসকারী একটি সূত্রের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন যে, ভারতীয় সীমান্ত পুলিশ এবং সম্ভবত নিয়মিত সেনাবাহিনী সীমান্ত এলাকায় শক্তি বৃদ্ধি করছে। এর উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে হিন্দু উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ মোকাবিলা করা। কলকাতায় বহু গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। তবে মোটামুটি এই ধারণাই সঠিক যে, সীমান্তে যে ধরনের সামরিক তৎপরতাই দেখা যাক না কেন, এর মূল উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুদের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ ঠেকানো। এটা বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের কোনো প্রস্তুতি নয়।

উইলিয়াম স্যাক্সবি ১৯৭৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭৬ সালের ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ভারতে আসার আগের এক বছর তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল। তার আগে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত স্যাক্সবি ওহাইয়ো থেকে নির্বাচিত সিনেটর ছিলেন।

কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেলের পৃথক আরেকটি প্রতিবেদনেও অবশ্য ওই একই ইঙ্গিত মিলেছে। ১৫ আগস্ট কলকাতার শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেন, উদ্বাস্তুদের প্রতিহত করতেই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। মি. রায় সম্পাদকদের অনুরোধ করেন, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশে সম্ভাব্য হিন্দু-মুসলমান সংঘাত বিষয়ে তাঁরা যেন তাঁদের পত্রিকায় কিছুই প্রকাশ না করেন। এবং বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করার বিষয়টিকেও যাতে তাঁরা ইস্যুতে পরিণত না করেন।

এরপর স্যাক্সবি লিখেছেন :

> এম্বাসি ডিএওর প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার কোনো তৎপরতাই দিল্লিতে চোখে পড়ছে না। কনসাল জেনারেলের এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল জ্যাকব ১৬ আগস্ট বলেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেয়নি।

১৮ আগস্ট ১৯৭৫ ডেভিড কর্ন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো তারবার্তায় উল্লেখ করেন :

> ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় এক নৈশভোজের আসরে জেনারেল জ্যাকব আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিলেন। জানতে চাইলেন, বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে আমার কাছে কী খবর আছে। আমি বললাম, তেমন কোনো বিরোধিতা ছাড়াই অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত। শুনে জ্যাকব বললেন, ঢাকায় নয়, তবে এর আশপাশের জেলায় 'উল্লেখযোগ্য লড়াইয়ের' খবর তাঁর কাছে এসেছে।

কর্ন আরও উল্লেখ করেন :

> এই অভ্যুত্থান নিন্দনীয়। বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা থাকবে না। পাল্টা অভ্যুত্থান ও লড়াইয়ের খুবই আশঙ্কা রয়েছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের বরাতে জেনারেল জ্যাকব বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আমি বললাম, 'বাংলাদেশ থেকে কি ভারতে হিন্দু উদ্বাস্তু আসতে শুরু করেছে?' জ্যাকব বলেন, 'না, এখনই এটা হওয়ার নয়।'

আমি জানতে চাইছিলাম ভারতীয় সেনাবাহিনী কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে কি না। জ্যাকব খুব তথ্যভিত্তিক জবাব না দিয়ে বললেন, 'তেমন কিছু নয়।'

২৩ আগস্ট ১৯৭৫। ডেভিড কর্নের বাসভবনে নৈশভোজে যোগ দিতে এসেছেন মেজর জেনারেল হরি শিঙ্গাল। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ, জ্যাকবের ঠিক পরই তাঁর অবস্থান। ডেভিড কর্ন এ দিনের কথোপকথনের বিবরণ দিয়ে ২৬ আগস্ট ওয়াশিংটনে এক তারবার্তা পাঠান। কর্ন লিখেছেন :

> হরি শিঙ্গালের কাছে বাংলাদেশ বিষয়ে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ঢাকার অভ্যুত্থান সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করতে পারে কি না, তা ভেবে তাঁরা গোড়াতে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিশেষ করে, নতুন সরকারের দেশের নাম পাল্টে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' করার উদ্যোগ ভীষণ অস্বস্তিকর। কিন্তু এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই আমরা বেশ আশ্বস্ত হয়েছি। যতক্ষণ কোনো উদ্বাস্তু ভারতে না আসছে, ততক্ষণ ওখানে কী ঘটল তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে চাই না। যদি উদ্বাস্তু আসা শুরু হয়, তাহলে আমরা কিছু একটা করব। ভারতের পক্ষে কয়েক লাখ উদ্বাস্তুর বোঝা বহন করা সম্ভব নয়।

কর্ন এরপর লেখেন, 'হরি শিঙ্গাল আমার কাছে কিছু জানতে চাননি। তবে বলেছেন, বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কাছে সামান্য তথ্যই আছে। তিনি জানালেন, "বাংলাদেশ নিয়ে জ্যাকব আপনার সঙ্গে শিগগিরই কথা বলবেন।"'

কর্ন বলেন :

> ২৪ আগস্ট সকালে শিঙ্গালের ফোন পেলাম। জ্যাকব কথা বলতে চান। আমি তাঁর কাছে গেলাম। জ্যাকব বললেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। তবে খবরের কাগজ ছাড়া অন্য সূত্রে ঢাকার খবর তিনি তেমন জানতে পারছেন না। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেয়নি। আমি বললাম, আমাদের কনস্যুলেট অবশ্য সেনা চলাচলের গুজব শুনতে পেয়েছে। 'মোটেই ঠিক নয়,' জ্যাকব বললেন; কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সেনা সদর দপ্তরের বিশেষ নিরাপত্তা ছাড়া এই এলাকার জন্য কোথাও তাঁর আর সেনা নেই। তাঁর সেনাদের সবাই উত্তরে, জ্যাকবের ভাষায়, 'বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কয়েক মাইল্ দূরে।' আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, ২৪ আগস্টের সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে, বাংলাদেশের সীমান্তজুড়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। জ্যাকব বলেন, 'হ্যাঁ, সে কথা সঠিক। কিন্তু এরা সেনাবাহিনীর ইউনিট নয়।'

ডেভিড কর্ন লিখেছেন, 'জ্যাকব বলেন যে ঢাকায় অভ্যন্তরীণভাবে তারা কী

করছে তা নিয়ে আমরা ভাবি না, সেটা তাদের বিষয়। কিন্তু ভারত দুটো বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন থাকবে : ক. সাম্প্রদায়িক বিভেদ কিংবা পশ্চিমবঙ্গে কোনো হিন্দু উদ্বাস্তুর প্রবেশ। খ. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পশ্চাদ্‌মুখী পরিবর্তন আনা।' জ্যাকব স্বীকার করেন যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ক্রমশ শান্ত হচ্ছে এবং নতুন শাসকেরা যে ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়, তা বোঝাতে তাদের চিন্তাভাবনা আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে জ্যাকব বলেন, 'যা হোক, ভারতে প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদের পাকিস্তান ও চীনপন্থী হিসেবে পরিচিতি রয়েছে এবং সেটাই পীড়াদায়ক।'

কর্ন লিখেছেন :

> জ্যাকব এ পর্যায়ে আমাকে প্রশ্ন করেন যে নতুন সরকারের স্থিতিশীলতার প্রশ্নে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কী। আমি বললাম, আমার সব তথ্য জানা নেই। কিন্তু অভ্যুত্থানের বিরোধিতা হয়েছে সেখানে সামান্যই এবং পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বাংলাদেশের বিশাল সমস্যার সমাধানের নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। কিন্তু নতুন সরকারকে সামর্থ্যবান ও উত্তম চিন্তাভাবনারই বলে মনে হয়।

কর্ন লিখেছেন, 'আমি গুরুত্বারোপ করলাম যে বাংলাদেশে মার্কিন স্বার্থ হলো মানবিক এবং আমরা বাংলাদেশে বা উপমহাদেশের অন্য কোথাও বিশেষ অবস্থান তৈরির ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী নই। জ্যাকব বললেন, বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে মার্কিন-সংশ্লিষ্টতাসংক্রান্ত খবরাখবরকে তিনি কখনো গুরুত্ব দেননি।' লেখকের সঙ্গে আলোচনায় কর্নকে যে এ কথা বলেছিলেন, জ্যাকব তা স্মরণ করতে পারেন।

কর্ন লিখেছেন, 'আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে এলে তিনি আবারও বাংলাদেশে সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রসঙ্গ তোলেন। জ্যাকবের কথায়, কোনো উদ্বাস্তুপ্রবাহ সৃষ্টি হলে তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ওপর পড়তে পারে।'

ডেভিড কর্নের দুটি তারবার্তা থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনি জেনারেল জ্যাকব ও মেজর জেনারেল শিঙ্গালের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রক্ষার বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ১৮ আগস্টের তারবার্তায় তিনি জ্যাকবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি চেয়েছিলেন। ২৬ আগস্টের তারবার্তায় তিনি লেখেন :

> জেনারেল জ্যাকব ও শিঙ্গালের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সুরক্ষা দরকার। তাই অনুরোধ হলো, আমাদের যোগাযোগ বা আলাপচারিতার বিষয়টি যেন

> ভারতীয় কিংবা অন্য বৈদেশিক কর্মকর্তাদের কাছে প্রকাশ করা না হয়। পরবর্তী সেনাপ্রধান হওয়ার জন্য জ্যাকবের অভিলাষ রয়েছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমাদের সঙ্গে বড় বেশি বন্ধুত্ব বজায় রাখার কারণে তিনি সমালোচিত। তাই আমাদের কথোপকথন যদি দিল্লি বা ভারতীয় কর্মকর্তাদের কানে যায়, তাহলে তিনি বিব্রত হবেন।

এ ধরনের তথ্যের ওপর মন্তব্য চাওয়া হলে ২০০৯ সালের ২৭ এপ্রিল জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব এই লেখকের কাছে দিল্লি থেকে পাঠানো ই-মেইলে তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

> তিনি [ডেভিড কর্ন] মেজর জেনারেল শিঙ্গালকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এর লক্ষ্য ছিল, আমার সঙ্গে তাঁর একটি বৈঠকের আয়োজন করা। আমি যত দূর স্মরণ করতে পারি, তিনি অব্যাহতভাবে ও পৌনঃপুনিকভাবে আমাকে বলেছেন যে আমরা বাংলাদেশে অভিযান চালাতে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা যে তা চাইনি, সে কথা তাঁর বিশ্বাস হয়নি। পরে তিনি সরকারিভাবে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বহুবার অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি তা রক্ষা করিনি।

সেনাপ্রধান হওয়ার বিষয়ে জ্যাকব বলেন, 'আমি জানি না, তিনি কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। এটাই রেওয়াজ যে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সেনা অধিনায়ক সেনাপ্রধান হন। আমার চেয়ে জ্যেষ্ঠ অন্যরা ছিলেন এবং সে কারণে আমার সেনাপ্রধান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।' 'পাশ্চাত্য অনুরাগ' সম্পর্কে জেনারেল জ্যাকবের মন্তব্য : 'পশ্চিম ও সোভিয়েত উভয়ের সঙ্গেই আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। এ সবই আসলে তাঁর মাইন্ডসেটের ইঙ্গিতবহ।' জ্যাক জ্যাকবের এসব মন্তব্য লেখক ই-মেইলে অবহিত করেছিলেন ডেভিড কর্নকে।

১৯৭৫ সালের ২২ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রস্তুত এক গোপন দলিল থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে ভারতের সামরিক অভিযানের আশঙ্কার বিষয়ে পাকিস্তানের যে ধারণা ছিল তা যে ঠিক নয়, তা তারা স্বীকার করে নিয়েছে। মি. রবিনসনের সই করা এই তারবার্তায় বলা হয়, পাকিস্তানিরা ইসলামাবাদে নিযুক্ত সুইস রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছে, তারা তাদের আগের অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করেছে। আর তা হলো : 'প্রথমত, ২১ আগস্ট বাংলাদেশে ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিল, তা ছিল অতিরঞ্জিত। দ্বিতীয়ত, সম্ভবত ভারতীয় সামরিক ও নৌবাহিনীর মুভমেন্টের উদ্দেশ্য হলো ঢাকার নতুন সরকারকে একটি সংকেত দেওয়া। নতুন সরকার যেন তার পূর্বসূরি সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি থেকে খুব বেশি দূরে সরে না যায়।'

১৬ আগস্ট উইলিয়াম বি স্যাক্সবি ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে (ঢাকা ও ইসলামাবাদেও যার অনুলিপি যায়) পাঠানো এক তারবার্তায় জানান, ১৬ আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমেরিকা ডেস্কের উপসচিব জে বড়ুয়ার সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তারা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এই তারবার্তা থেকে ধারণা করা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহেই ওই বৈঠক হয় এবং এটাও মনে হয়, শুধু বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দিরার কাছে মোশতাকের বার্তা

১৯৭৫ সালের ২৬ আগস্ট রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি এক তারবার্তায় জানান, দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ২৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি এ সময় প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের একটি বার্তা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাইকমিশনারের বৈঠক সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রদত্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দুই দেশের যৌথ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের উল্লেখ করা হয়। বার্তায় দুই দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করে বলা হয় যে এই সম্পর্ককে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ গভীরভাবে গুরুত্ব ও মূল্য দিয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্ট মোশতাক দুই দেশের বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় 'ট্রিটিজ অ্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্ট'-এর প্রতি সম্মান দেখিয়ে চলার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি উভয় দেশের মধ্যেকার 'বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব এবং কোনো প্রকারের দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা মুক্তভাবে শান্তি বজায় রাখার' নীতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট দুই দেশের মধ্যেকার সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পাঁচ মৌল নীতির প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে তাঁর দেশ অব্যাহতভাবে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ এবং উপমহাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার বজায় রেখে চলবে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার অনুভূতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা আমাদের সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাস করি এবং সহযোগিতার উন্নয়ন ও উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সুসম্পর্কের জন্য আমরা আমাদের ভূমিকা নিশ্চিতরূপে পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।'

বিকল টেলিফোন

ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার ১৯৭৫ সালের ২৭ আগস্ট এক তারবার্তায় লিখেছেন, ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব রণেন সেনের অনুরোধে ২৬ আগস্ট তাঁর সঙ্গে মার্কিন দূতাবাস-কর্মকর্তারা মিলিত হন। সেন এ সময় তাঁকে প্রায় সাদামাটা একটা বার্তা পৌঁছে দেন। বার্তাটি হলো বাংলাদেশে ভারতের একমাত্র স্বার্থ হলো স্থিতিশীলতার সুরক্ষা। সেন উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে কী ধরনের সরকার থাকবে কিংবা বাংলাদেশ কী প্রকৃতির অর্থনীতি অনুসরণ করবে, সে বিষয়ে ভারতের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ভারত গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হবে, যদি বাংলাদেশের হিন্দুরা হুমকিগ্রস্ত হয় এবং সে কারণে যদি তারা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা চালায়।

বোস্টার লিখেছেন :

> আমাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার সময় ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব 'পৌনঃপুনিকভাবে স্থিতিশীলতা' কথাটির উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে : ক. অভ্যুত্থান সংঘটনের ঘটনায় ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হয়েছে। খ. অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় প্রহরে ভারতীয় হাইকমিশন কার্যালয় ও তার স্টাফদের বাসভবনের সকল টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।[১] গ. ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয়রা অভ্যুত্থানের সংগঠনগত চমৎকারিত্ব বিবেচনায় সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে "কতিপয় বিদেশি শক্তি" অভ্যুত্থানের সঙ্গে অবশ্যই জড়িত ছিল। (ভারতীয় সংবাদপত্রে সিআইএর সংশ্লিষ্টতা-সংক্রান্ত খবর সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সেন ত্বরিত স্বীকার করেন যে এসব খবর সেন্সরের বেড়াজাল পেরিয়ে যাওয়ার কথা নয়। সে কারণে এর প্রতি ভারত সরকারের কৌশলগত অনুমোদন রয়েছে বলে গণ্য করা চলে। সেন অবশ্য তাঁর বক্তব্যে এই 'বিদেশি শক্তি' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন, তা উল্লেখ করেননি)।

বোস্টার এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন :

> ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয়রা ভারতের ব্যাপারে বাঙালিদের ভয়ভীতির গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবং তাঁরা এটাও জানেন যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এখানে জল্পনাকল্পনা অব্যাহত রয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, বাঙালিদের ওই ভয়ভীতি প্রশমন করতেই সেন আমাদের কাছে ওই মতামত তুলে ধরেছেন। তাঁরা জানেন, বাঙালিরা অব্যাহতভাবে

---

১. ১৯৯২ সালে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ফারুক রহমান জানান, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট মুজিব বিদেশি মিশনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। তাঁর কথায়, 'শুধু ভারতের সঙ্গে লাইন ডাউন ছিল। এটাও আমরা করিনি। আল্লাহ করেছেন।'

> আমাদের কাছে ভারতীয়দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা কথাবার্তা বলে আসছেন। এবং সম্ভবত এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তারা বাঙালিদের আশ্বস্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্য

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি ২৮ আগস্ট ১৯৭৫ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে যে তারবার্তাটি পাঠান তার শিরোনাম : 'বাংলাদেশের নতুন সরকারকে ভারত সরকারের স্বীকৃতি এবং মিসেস গান্ধীর মন্তব্য'। স্যাক্সবি লিখেছেন, ঢাকার নতুন সরকার সম্পর্কে ২৭ আগস্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র যে মন্তব্য করেছেন তা নিচে দেওয়া হলো :

> ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশকে আমরা যার ভিত্তিতে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম, সেই একই ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক আমরা বজায় রেখে চলেছি। ২০ আগস্ট ঢাকায় আমাদের হাইকমিশনার বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। পরে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। বাংলাদেশের হাইকমিশনার ২৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এর আগে পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গেও দেখা করেন। আমাদের সংশ্লিষ্ট মিশনের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছি। মাত্র কয়েক দিন আগেই একটি বাংলাদেশি প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লিতে ছিল। এসবের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হবে যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির বিষয়টি আমরা অব্যাহত রেখেছি।

স্যাক্সবি এরপর লিখেছেন, ২১ আগস্ট মিসরের *আল আহরাম* পত্রিকার বৈদেশিক সম্পাদকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে, 'এটা আমাদের ঐকান্তিক আশাবাদ যে বাংলাদেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাবেন। যেমনটা তাঁরা তাঁদের প্রথম ঘোষণায় ব্যক্ত করেছিলেন। এবং তাঁরা সেই সব আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবেন, যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ জাতির সৃষ্টি হয়েছিল।' ভারতের দিক থেকে তার সরকারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে বাংলাদেশ এবং অন্য সব প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখতে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের দেশ স্বাভাবিকভাবেই অন্য দেশের বিশেষ করে তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করে না। কিন্তু রাজনৈতিক

হত্যাকাণ্ড সর্বদাই অনুশোচনীয়। এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং জাতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতীকী ব্যক্তিত্বের হত্যাকাণ্ড দ্বিগুণভাবে নিন্দনীয়।' ইন্দিরা গান্ধী বলেন, বাংলাদেশের ঘটনাবলি বৃহত্তর এশীয় প্রেক্ষাপটের ওপর কী প্রভাব ফেলবে, সে সম্পর্কে এখনই মন্তব্য সমীচীন নয়। তাঁর ভাষায় 'আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে কোনোক্রমেই পরিস্থিতি জটিল করা তাদের উচিত হবে না।' মিসেস গান্ধী বলেন, 'এশিয়ার অন্যত্রও এমন কিছু ঘটনা ঘটছে, যা সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো, জাতিসমূহের আপন ভাগ্য গড়ার জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা ও নিজেদের ভাগ্য গড়ার সুযোগ। এ ক্ষেত্রে কোনোভাবেই বৈদেশিক উপস্থিতির কোনো যৌক্তিকতা নেই।'

ভারতকে ভয়

১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল ডেভিড কর্ন পরিবেশিত একটি বার্তা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন। এই তারবার্তার শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশে অভ্যুত্থান : পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন'। এতে বলা হয় :

> কলকাতার সংবাদপত্রে ২৪ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব মি. গুপ্তের একটি ঘোষণা ছাপা হয়েছে। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ তার সীমান্ত ফাঁড়ি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাড়িয়েছে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ১৩০০ মাইল দীর্ঘ সীমান্তের নিরাপত্তা শক্তিশালী করেছে।' কলকাতার সংবাদপত্র বলেছে, মি. গুপ্ত ২৩ আগস্ট কলকাতায় বিএসএফের মহাপরিচালক অশ্বিনী কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশ থেকে যাতে ভারতে কোনো অননুমোদিত লোক প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। মি. গুপ্ত উক্ত বার্তায় উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশ সীমান্তজুড়ে বিএসএফের অতিরিক্ত কিছুসংখ্যক ব্যাটালিয়ন মোতায়েনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষীদের সমন্বয়ে 'সেকেন্ড লাইন অব চেকিংয়ের' ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গুপ্ত বলেছেন, বাংলাদেশও ইতিমধ্যে ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত সিল করে দিয়েছে। এবং আমাদের দিক থেকেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি অবশ্য উল্লেখ করেন যে

> বাংলাদেশের তরফে পশ্চিমবঙ্গে কোনো প্রকারের অস্বাভাবিক যাতায়াতের খবর পাওয়া যায়নি।

'বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের বিষয়ে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক এক তারবার্তায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন কর্মকর্তা ১৫ আগস্টের ঘটনার পরপরই বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মি. বড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলেন। ওই তারবার্তায় মার্কিন কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ নাম উল্লেখ করা হয়নি।

স্যাক্সবি লিখেছেন :

> মি. বড়ুয়া এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মূল্যায়ন জানতে চাইলে এনইএ/আইএনএ কর্মকর্তা ন্যাক পররাষ্ট্র দপ্তরের ১৫ আগস্ট-সংক্রান্ত গাইডলাইন অনুযায়ী তা ব্যাখ্যা করেন এবং বড়ুয়াকে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ জানান। বড়ুয়া বাংলাদেশের নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মোশতাকের 'সুপরিচিত' অবস্থান উল্লেখ করে তিনি বলেন, '১৯৭১ সালে তিনি ইসলামাবাদের সঙ্গে একটি আপস চেয়েছিলেন এবং এখন সন্দেহাতীতভাবে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাবেন।

ভারতের কাছে খবর

এই পর্যায়ে খন্দকার মোশতাকের নতুন বিদেশনীতির সমর্থনে ন্যাক মন্তব্য করেন, 'এ ধরনের নীতি গ্রহণের ফলে উপমহাদেশে বিদ্যমান উত্তেজনা হ্রাস পাবে এবং তা তিন দেশেরই উপকারে আসবে।' এখানে লক্ষণীয় যে ভারতীয় কূটনীতিক বড়ুয়া ত্বরিত তাঁর সঙ্গে একমত হন এবং মন্তব্য করেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে স্বতঃসিদ্ধভাবে ভারতের জন্য নেতিবাচক ধরে নেওয়ার অবকাশ নেই।' এটা অবশ্যই এভাবে ঘটা উচিত নয়, বড়ুয়া জোর দিয়ে বলেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, বড়ুয়া এ দিন মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছে তথ্য প্রকাশ করেন, 'পঁচাত্তরের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা থেকে আসা একজন ভারতীয় কূটনীতিক তাঁকে বলেছিলেন, বাংলাদেশে একটি অভ্যুত্থানের আশঙ্কা নিয়ে কয়েক মাস ধরে বাতাসে কথাবার্তা ভাসছে। খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে একদল অসন্তুষ্ট রাজনীতিবিদ ও সামরিক কর্মকর্তা এবং একজন "ক্যাপ্টেন" (বড়ুয়া তাঁর নাম স্মরণ করতে পারেননি), মুজিব যাকে সম্প্রতি চাকরিচ্যুত করেন, তাঁরা এই ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছেন।' বড়ুয়া এ সময় এ কথাও জুড়ে দেন যে 'মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখন ঢাকার নতুন সরকারের নীতিগুলোর বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে গভীর আগ্রহ দেখাবেন।' উল্লিখিত ওই ক্যাপ্টেন সম্ভবত মেজর ডালিম।

উইলিয়াম স্যাক্সবির এই তারবার্তা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের নৈশভোজে যোগ দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁর চোখ-কান সজাগ রেখেছিলেন। এবং ওই নৈশভোজের বিবরণই ছিল ১৬ আগস্টের উক্ত তারবার্তার উপসংহার। স্যাক্সবি লিখেছেন, '১৫ আগস্ট রাষ্ট্রদূতের জন্য আয়োজিত নৈশভোজে পররাষ্ট্রসচিব কেওয়াল সিং এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পৃথ্বীনাথ ধর (১৯১৮-২০১২) বাংলাদেশের ঘটনাবলির প্রতি শিথিল মনোভাব দেখালেন বলেই প্রতীয়মান হলো।' মি. ধর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সরকারের মুখ্য সচিব এবং একাত্তরে মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে মুখ্য সমন্বয়কারী ছিলেন।

১৯৭২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ভারতের পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন কেওয়াল সিং। এরপর তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহর পাঠানোর বিষয়টি বেশ আলোচিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার ধারাবাহিকতা এর পরও দীর্ঘকাল অব্যাহত রেখেছে। ভারতের অভিযোগ : দিয়াগো গার্সিয়া-ভিত্তিক মার্কিন রণতরি ভারতীয় সমুদ্রসীমায় 'নাক গলিয়েছে'। ২০১১ সালের ৯ নভেম্বর *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* এক প্রতিবেদন নতুন দিল্লি ডেটলাইনে অবমুক্ত করা সরকারি নথির বরাতে বলেছে, ১৯৭৫ সালের ২১ নভেম্বর প্রতিরক্ষাসচিব ডি আর কোহলি পররাষ্ট্রসচিব কেওয়াল সিংকে লিখেছেন, '১৯৭৪-৭৫ সালে ইউএস অরিয়নস আমাদের রণতরির ওপর উৎপীড়নমূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল যা ছিল, গুরুতর।' সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকারীরা কী প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় মার্কিন সামরিক সাহায্য পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সেটা বিবেচনায় এ ধরনের তথ্য বিচার্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে।

স্যাক্সবি লিখেছেন, 'ঢাকার অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা (কেওয়াল সিং ও ধর) এই রসিকতার মধ্যেই তাঁদের মন্তব্য সীমাবদ্ধ রাখলেন যে কীভাবে 'সব পুরোনো পাপী' আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে!'

স্যাক্সবির প্রতিবেদনের পুনশ্চ ছিল এ রকম : '১৫ আগস্টে একটি প্রেস সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিষয়ে কোনো সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশের ওপর ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।'

অক্টোবরে অস্ত্র চান ফারুক-রশিদ

পঁচাত্তরের ২১ অক্টোবর বোস্টার ফারুক-রশিদকে ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আখ্যা দিয়ে লেখেন, তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলর তাঁর বাসভবনে তাঁদের সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ২১ অক্টোবরের সন্ধ্যায় বৈঠক করেন। দুই মেজর কুশলাদি বিনিময়ের পর ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে কীভাবে হুমকিগ্রস্ত তার বিবরণ দেন। তাঁরা বলেন, তাঁদের কাছে এমন খবর রয়েছে যে, ভারতীয়রা মোশতাক সরকারকে বিপদে ফেলতে চাইছে। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেন, 'ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন প্রচার করছেন যে, সরকার নতুন করে অভ্যুত্থানের মুখোমুখি। ১৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সঙ্গে বৈঠকের আগে কতিপয় সাংসদকে টেলিফোনে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যেন তাঁরা বৈঠকে যোগ না দেন। ওই বৈঠক যাতে সবাই বর্জন করেন, তার জন্য ভারতের মদদ ছিল। চট্টগ্রামে সোভিয়েত কনসাল জেনারেল ও ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার সক্রিয় রয়েছেন, যাতে অস্ত্র সমর্পণের সরকারি উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়। এ জন্য এমনকি তাঁরা বাঙালিদের প্ররোচিত করে অবৈধ অস্ত্র কিনে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চাইছেন। ভারতীয় মদদেই টাঙ্গাইলের ঘটনা ঘটে। মেজররা বলেন, সোভিয়েত উসকানিতে ভারতীয়রা মোশতাক সরকারকে নাস্তানাবুদ করতে এ ধরনের উসকানিমূলক ঘটনা আরও ঘটাবে। মেঘালয়ের তুরায় একটি ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। ওই স্থান থেকে কাদের সিদ্দিকী ও তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন তৎপরতা চালাচ্ছেন। গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনে যে প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছে, তা প্রতিহত করতে ভারত সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত।

মেজররা উল্লেখ করেন, তাঁরা মনে করেন না যে, চীন কিংবা পাকিস্তানের কাছে সাহায্য পাওয়া গেলেও তা ভারতীয় হুমকি নস্যাৎ করতে পর্যাপ্ত বলে গণ্য হবে। মেজররা জানতে চান, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবে কি না। এই সাহায্য তারা সরাসরি কিংবা তৃতীয় কোনো দেশের মাধ্যমেও দিতে পারে।

বোস্টার তাঁদের ১৯৭৩ সালের মিশন সম্পর্কে উল্লেখ না করে লিখেছেন :

> যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র সরবরাহ প্রশ্নে অতীতে কেমন মনোভাব পোষণ করত, সেটা পাকিস্তান আর্মিতে থাকতে তাঁরা দেখেছিলেন। তাই মেজররা বলেন, তাঁরা অস্ত্র চাইছেন না, কিন্তু হেলিকপ্টার ও সড়কযান দরকার। তাঁরা অবশ্য

উল্লেখ করেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করছেন না। কিন্তু এসব সামরিক সরঞ্জাম প্রয়োজন, কারণ, তাঁদের ভাষায়, ভারতীয়দের দ্বারা উৎসাহিত ও সমর্থিত কোনো অভ্যন্তরীণ ও গুরুতর নিরাপত্তার হুমকি মোকাবিলায় এর দরকার হতে পারে।

মার্কিন পলিটিক্যাল কাউন্সিলর ফারুক-রশিদকে বলেন, তাঁদের অনুরোধ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার অবস্থানে তিনি নেই। এ ধরনের অনুরোধ ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে করা উচিত বলে তিনি মত দেন। মেজররা তখন জানতে চান, এ ধরনের অনুরোধ আনুষ্ঠানিকভাবে করা হলে তাতে সম্ভাব্য মার্কিন মনোভাব কী হতে পারে? তাঁরা ইঙ্গিত দেন যে, মার্কিন সরকারের মনোভাব যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুরোধ জানাবে না। এ পর্যায়ে পলিটিক্যাল কাউন্সিলর পুনরায় তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য করতে অপারগ। তবে অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার উৎসাহী। তখন মেজর ফারুক উত্তর দেন, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি বর্তমান হুমকি মোকাবিলা করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে ধরনের উন্নয়নের সুফল বাংলাদেশ যে ভোগ করতে পারবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

বোস্টার এ পর্যায়ে নিজস্ব মন্তব্য জুড়ে দেন, যা অবিকল এরূপ :

> মেজররা এটা উল্লেখ করেননি যে, তাঁরা যে পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের সঙ্গে বৈঠক করলেন তাতে প্রেসিডেন্টের সায় আছে কি না। তাঁরা যেহেতু অতীতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কথা বলেছেন, এবারও হয়তো তেমনই ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে মৎস্য শিকারে বেরিয়েছেন। যেভাবেই তাঁরা এ উদ্যোগ নিন না কেন, পলিটিক্যাল কাউন্সিলরকে মেজররা বলেছেন যে, তাঁরা আর খেয়ালখুশিমাফিক কোনো সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নন, যেমনটা আগে দেখা গেছে। এবার সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার হুমকির বিষয়ে বিচলিত হয়েই তাঁরা তাঁদের একান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, বাংলাদেশের অখণ্ডতা ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা হুমকিগ্রস্ত। ভারত কী করছে, সে বিষয়ে আমরা মন্তব্য করতে সক্ষম নই। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ভারত করছে বলে যা ধরে নিচ্ছে তার চেয়ে হয়তো বিষয়টি অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ।

বোস্টার এ পর্যায়ে লিখেছেন, 'তবে আমরা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের চালিত করছি যে, মেজররা যদিও তরুণ, অনভিজ্ঞ এবং সম্ভবত

অর্বাচীন কিন্তু তাঁরা দায়িত্বহীন নন। এবং তাঁরা তেমন আশঙ্কারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, যা সরকারের মধ্যকার অন্যদের মধ্যেও রয়েছে।'

বোস্টার নিজের জবানিতেই এই তারবার্তার উপসংহার টানেন এই বলে যে, 'রাষ্ট্রদূত ইতিপূর্বে সেনাবাহিনীর প্রধান জিয়াউর রহমানকে মার্কিন সামরিক সহায়তার সম্ভাবনার প্রশ্নে নিরুৎসাহমূলক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।'

বোস্টার ওই বার্তায় বলেন, 'পররাষ্ট্র দপ্তর যদি মেজরদের আলোচনার বিষয়ে সরাসরি কোনো কিছু জানানোর প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে দয়া করে অনুরূপ নির্দেশনা দিন। যদিও মেজরদের কাছে পলিটিক্যাল কাউন্সিলর এমনভাবে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, যাতে আমরা ইচ্ছা না করলে এ বিষয়ে তাঁদের আর কিছু বলার দরকার পড়বে না।'

অভিন্ন জিজ্ঞাসা

ফারুক-রশিদ তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির পক্ষে ১৯৭৩ সালে মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলেন। এ ঘটনার ২৪ মাসের মধ্যে মুজিববিহীন বাংলাদেশে সম্ভাব্য ভারতীয় হামলা প্রতিহত করতে ফারুক-রশিদ ও জিয়াউর রহমান আলাদাভাবে সেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই সামরিক সহায়তার জন্য ধরনা দেন। জিয়া পঁচাত্তরের অক্টোবরের আগে সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মার্কিন সাহায্য চান। তখন তিনি নেপথ্যের নায়ক। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে ১৯৭৪ সালের ১৩ মে ফারুক রহমান যেমন উইলিয়াম এফ গ্রেশামের বাসায় যান, তেমনি ১৯৭৫ সালের ২১ অক্টোবরের সন্ধ্যায় মার্কিন পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের বাসায় যান ফারুক ও রশিদ। অক্টোবরেও তাঁরা আগের মতোই সম্ভাব্য 'বিদেশি হস্তক্ষেপ' এবং মার্কিন অস্ত্র মিলবে কি না, তা নিয়ে কথা বলেন। 'ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে কীভাবে হুমকিগ্রস্ত' তার বিবরণও দেন তাঁরা। তাই চুয়াত্তরে এবং অভ্যুত্থান-পরবর্তী পঁচাত্তরের সন্ধ্যায় ফারুকের অভিন্ন প্রশ্ন, ভারত হস্তক্ষেপ করে বসলে আমেরিকা পাশে থাকবে কি না।

পাকিস্তানি প্রয়াস

পঁচাত্তরের ১৬ আগস্ট। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ফোন করেন ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত (১৯৭৩-৭৭) হেনরি আলফ্রেড বাইরোডকে। এ সম্পর্কে বাইরোড ১৭ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তরকে এক তারবার্তায় লিখেছেন, 'ভুট্টো গত রাতে আমাকে টেলিফোন করেন। কথার শুরুতেই তিনি বললেন, "আমি জানতাম, আপনারা খারাপ লোক নন, বাংলাদেশে অভ্যুত্থান ঘটাবেন না। কিন্তু সোভিয়েতেরা অন্য রকম ভাবছে বলে মনে হয়।"' মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি জোসেফ জন সিসকো বাইরোডের এই তারবার্তার গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৮ আগস্ট ১৯৭৫ তা দিল্লি এবং ঢাকা, কাবুল ও মস্কোর মার্কিন দূতাবাসে পৃথকভাবে পাঠান। ওই তারবার্তায় বাইরোড আরও লেখেন, 'আমি তাঁকে (ভুট্টো) বললাম, আমি যখন খবরের কাগজে পড়েছি বাংলাদেশের নতুন প্রেসিডেন্ট পাশ্চাত্যপন্থী এবং রুশদের পছন্দের নন, তখনই আমি ধরে নিয়েছি যে সোভিয়েতেরা এমন একটি অভিযোগ করবেই। (আমি অবশ্য তাঁকে বলিনি, ভারতীয়রাও তেমনই ভাবতে পারে।)'

এই বার্তা ও অন্যান্য তারবার্তা সাক্ষ্য দেয় যে, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর ঢাকা-ইসলামাবাদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়তে যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি খন্দকার মোশতাকের কাছে পাঠানো এক বার্তায় বাংলাদেশের নাম পাল্টে তাকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন এবং শিশু ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাতে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আবেদন জানান। পাকিস্তানি জনগণ ও সৌদি আরবকে তিনি মোহাবিষ্ট করেছিলেন

এই ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কল্পিত বুলি দিয়ে। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের নাম পাল্টানোর প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অবমুক্ত করা ও তাদের সূত্রেই পাওয়া পঁচাত্তরের এসব গোপনীয় দলিল থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক অভিযান হতে পারে—এই ধারণা যাতে ব্যাপক প্রচার পায় তার জন্য ইসলামাবাদ সুপরিকল্পিতভাবে ভূমিকা রেখেছিল। ঢাকার অভ্যুত্থানকারীদের সেই প্রচারণা মনঃপূত হয়েছিল। ঢাকা ও ইসলামাবাদ এ সময় যে ওই বিষয়ে ওয়াশিংটনের কান ভারী করার জোর চেষ্টা চালিয়েছিল, দলিলগুলোতে তা স্পষ্ট।

১৬ আগস্ট মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিসকো ইসলামাবাদ মিশনে একটি বার্তা পাঠান। সিসকো পাঁচজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়াদে পররাষ্ট্র দপ্তরে কাটিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের জুলাইয়ে কিসিঞ্জারের প্রধান উপসহকারী হিসেবে সাইপ্রাস সংকটে ভূমিকা রেখে তিনি আলোচিত হন। ৮৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে লেখা এক নিবন্ধে (২৫ নভেম্বর ২০০৪) *ওয়াশিংটন পোস্ট* উল্লেখ করে যে, তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নেগোশিয়েটর হিসেবে একাত্তরে পাক-ভারত যুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইসলামাবাদ মিশনে প্রেরিত ওই বার্তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সিসকো এতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও মোশতাক সরকারের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে তার ওপর গুরুত্ব দেন।

মি. সিসকো তাঁর ওই বার্তায় লেখেন :

> ১. পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে প্রচণ্ডভাবে আগ্রহী থাকবে। তাই পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের জানা উচিত যে আমরা অব্যাহতভাবে বাংলাদেশ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় করতে চাই। সে কারণে এখানকার পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি এবং আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানি তা তাদের জানিয়ে দিচ্ছি।
>
> ২. আপনি ঢাকার দূতাবাসের সঙ্গে যেভাবে ভালো মনে করেন সেভাবে যোগাযোগ ও মতবিনিময় করতে পারেন।

বার্তায় তিনি আরও লিখেছিলেন, 'এ বিষয়ে আমাদের প্রাথমিক মূল্যায়ন পাকিস্তানকে জানিয়ে দিন। নতুন সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভবিষ্যতে কেমন সম্পর্ক রাখবে সে বিষয়ে আপনি অবশ্যই ইঙ্গিত দেবেন।'

উল্লেখ্য যে, এই 'ইঙ্গিত'টা কী রকম হবে তা এই বার্তায় স্পষ্ট নয়। এটা এক পৃথক বার্তায় প্রেরণ করা হয়। যাতে বলা হয় ঢাকায় সরকার পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র জরুরি ভিত্তিতে ইসলামাবাদকে অবহিত রাখছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে স্বীকৃতির প্রশ্ন প্রটোকলের বিচারে এখনো আসেনি। 'তবে ইত্যবসরে আমরা স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রস্তুত।'

সিসকো এ দিনই ভারতের মার্কিন দূতাবাসকে জানিয়ে দেন :

> বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার কোনো উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে বিশ্বাস করবেন না। যদি ভারত সরকারের পক্ষে কেউ বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী হয় তাহলে ঢাকায় দূতাবাসের প্রেরিত তথ্যের ওপর নির্ভর করবেন। নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে যাবেন না।

এখানে লক্ষণীয়, ইসলামাবাদের রাষ্ট্রদূতকে বলা হচ্ছে, মোশতাকের প্রতি মার্কিন দরদ প্রকাশ করতে আর দিল্লির রাষ্ট্রদূতকে বলা হচ্ছে 'ভারতকে জানান দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের নীতি হলো আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিকাশের চেষ্টার উন্নয়ন ঘটানো। ভারত যদি ঢাকায় অভ্যুত্থান নিয়ে কোনো আলোচনায় যেতে চায়, তাহলে প্রেস গাইডলাইন অনুসরণ করবেন।'

১৬ আগস্ট বোস্টার পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো এক বার্তায় লিখেছেন, 'ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশনার আমাকে বলেছেন, তিনি নতুন সরকারের বিষয়ে তাঁর পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, নতুন সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নে লন্ডন প্রথম কাতারের দেশগুলোর সঙ্গে থাকতে চাইবে।'

১৬ আগস্ট রাষ্ট্রদূত বাইরোড বাংলাদেশের অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া ওয়াশিংটনকে জানান, তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো স্থানীয় সময় ২৩.০০টায় বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে প্রচারিত বিবৃতি প্রকাশ করেন।' লক্ষণীয় যে পাকিস্তান এই বিবৃতি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে না জানিয়ে প্রকাশ করেনি। বাইরোড লিখেছেন, 'পররাষ্ট্রসচিব আগা শাহি মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে জানানোর কিছুক্ষণ পরই ওই ঘোষণা দেওয়া হয় এবং যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তা ছিল এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ। তবে ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাস যে খসড়া আমাদের দিয়েছিল তা থেকে ঈষৎ ভিন্নতর।'

পাকিস্তানের প্রথম প্রতিক্রিয়া

২৯ জানুয়ারি ১৯৭৩। কিসিঞ্জারের দপ্তর, হোয়াইট হাউস। মধ্যাহ্নভোজ। উপস্থিত আছেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত লক্ষ্মী কান্ত ঝা এবং মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এনএসসি) সহকারী পিটার ডব্লিউ রডম্যান। সিমলা চুক্তি সই হয়েছিল ২ জুলাই ১৯৭২। নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রির উদ্যোগ নিলে ভারত তাতে আপত্তি তোলে। এই প্রেক্ষাপটে ঝা বলেন, সিমলা চুক্তির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া হতো, তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে এমন একটি সময়ে যখন দেশটি নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন, 'পাকিস্তান কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না? এটাই কি ব্যাপারটাকে আটকে রাখছে?' উত্তরে ঝা বলেন, 'হ্যাঁ। যুদ্ধবন্দী প্রকৃতপক্ষে কোনো সমস্যা নয়। তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। একমাত্র সমস্যা হলো, এটা মুজিবের মুখে একটা চপেটাঘাত হানবে। তাঁর মুখরক্ষা হবে না। তারা [পাকিস্তান] বাংলাদেশ ও আমাদের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। পাকিস্তান যদি কিছু একটা পদক্ষেপ নেয়, তাহলে এর দ্রুত সুফল মিলবে। এর পরিবর্তে ভুট্টো প্রেস-প্রচারণা শুরু করেছেন। যদিও আমরা তাতে সাড়া দিচ্ছি না।' জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, 'আমি এই ধারণা পেয়েছি যে, ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে চান। কিন্তু অভ্যন্তরীণ চাপে তা করতে পারছেন না।' ঝা বলেন, 'তিনি এক ধূর্ত ব্যক্তি। তিনি যেদিকেই জনমত নিতে চান, তিনি সেটা পারেন। সমর্থনও পেতে পারেন। তিনি যদি স্বীকৃতি দিতে চাইতেন, তাহলে তাকে অনতিক্রম্য জটিলতার সম্মুখীন হতে হতো না।'

১৯৭৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রেরিত এক তারবার্তায় বলা হয়, 'ভুট্টো সাম্প্রতিক কালে চীনকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের বাইরে রাখতে সফল হন। সৌদি আরব ও জর্ডানের মতো পাকিস্তানের ঐতিহ্যগত মিত্র দেশগুলোকে উপেক্ষা না করে ভুট্টো আলজেরিয়া ও লিবিয়ার মতো মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, যুদ্ধবন্দী ফেরত এবং ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের মতো প্রশ্ন ঝুলে থাকছে।'

৮ মার্চ ১৯৭৩। বিকেল সাড়ে চারটা। ড. কিসিঞ্জারের দপ্তর। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর বিশেষ দূত গোলাম মোস্তফা খার, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমাদ, রাষ্ট্রদূত সুলতান খান, কাউন্সিলর

ইকবাল, হেনরি কিসিঞ্জার, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ হ্যারল্ড জে স্যান্ডার্স আলোচনায় মিলিত হন। স্যান্ডার্স ও ইকবাল ছাড়া বাকিরা নিক্সনের সঙ্গে দুপুরে বৈঠকও করেন।

কিসিঞ্জার আজিজ আহমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশে কী ঘটতে পারে? উত্তরে আজিজ বলেন, 'মুজিব নির্বাচনে জিতবেন। যুদ্ধবন্দী ফেরত ও যুদ্ধাপরাধীদের (১৯৫ জন) বিচার বন্ধ করলে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। তবে মুজিব যেকোনো ভবিষ্যদ্বাণীর বাইরেই থেকে যাবেন। থেকে যাবেন অবিশ্বস্ত। যদি তিনি বোঝেন যে, আপনি খুশি হবেন, তাহলে তিনি আকাশস্পর্শী প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু এরপর তিনি তা রক্ষা করবেন না। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভের আগে ভুট্টোর কাছে তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর দিক থেকে স্বতঃস্ফূর্ত। ভুট্টো তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতির কোনো কিছুই রক্ষা করেননি।'

কিসিঞ্জার কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি এ পর্যায়ে বাংলা-ভারত ও চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক কেমন হবে তা জানতে চান। ৮ মার্চ ১৯৭৩ স্যান্ডার্স লিখেছেন, কিসিঞ্জার এই বৈঠকের সমাপ্তি টানেন এই বলে যে, তিনি জানেন প্রেসিডেন্ট কী চান। প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উষ্ণতা বজায় রাখতে সচেতন। তবে তার বাইরেও এই অঞ্চলে সোভিয়েত কৌশল তিনি বোঝেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করবেন। কিসিঞ্জার এদিন তাঁদের এ মর্মে সতর্ক করেন যে, দুপুরে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁদের 'যেসব বিষয়' নিয়ে আলোচনা হলো তা যেন তাঁরা মার্কিন আমলাতন্ত্রের সঙ্গে আলোচনা না করেন। কিসিঞ্জার বলেন, এসব বাস্তবায়ন করতে সময় লাগবে।[১]

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। বিকেল সাড়ে চারটা। দলিলে স্থান উল্লেখ নেই। আজিজ আহমাদ সাক্ষাৎ করেন কিসিঞ্জারের সঙ্গে। কিসিঞ্জার এ দিন শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এ দিন জনাব আজিজের সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রদূত সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ও ইকবাল রিজা। মার্কিন পক্ষে ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আলফ্রেড এল আথারটন, এনএসসির রবার্ট ওকলে এবং এনইএর পিটার ডি কনস্টেবল।

আজিজকে কিসিঞ্জার বলেন, 'আমি আজই প্রথম মুজিবকে দেখলাম।

---

১. আলোচনা স্মারক, ৮ মার্চ ১৯৭৩।

তিনি বলে চলছিলেন, "আমার তেল", "আমার খাদ্য", "আমার জনগণ"। তিনি বলেছেন পাকিস্তানের কাছ থেকে তিনি কিছু সম্পদ চান।' এ কথা শুনে আজিজ বলেন, 'ভুট্টোর ঢাকা সফরকালে মুজিব অবিলম্বে পাকিস্তানের জাহাজ ও বিমানের ৫৬ ভাগের বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চান।' কিসিঞ্জার : 'মুজিব বলেছেন, আমার কাছে তিনি পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবেন। আমি এর আগে কখনো ঢাকা যাইনি। তিনি চান, আপনি ৬৭ হাজার বিহারি পরিবারকে ফিরিয়ে নিন।' আজিজের মন্তব্য : 'মুজিবের কথা নিতান্ত গোঁয়ারের মতো। এটা প্রতিশোধপরায়ণতা।' তিনি আরও বলেন, 'আমি গতকাল প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর ফোন পেয়েছি। তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন যে, আপনি একাত্তরে বলেছিলেন ভারতকে এমন একটা সমুচিত শিক্ষা দেবেন যে তারা কখনো তা ভুলতে পারবে না।'

১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দী নিরাপদে ফিরে গেল পাকিস্তানে। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেননি ভুট্টো। বরং তিনি যেন আশায় ছিলেন মুজিব টিকবেন না। ছয় মাসের ব্যবধানে তাঁর প্রতিক্রিয়াটি ছিল লক্ষণীয়।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫। বেলা আড়াইটা। স্থান ব্লেয়ার হাউস। কিসিঞ্জার-ভুট্টোর প্রায় ঘণ্টাকালের বৈঠক। আজিজ আহমাদ, পররাষ্ট্রসচিব আগা শাহি, সাহেবজাদা ইয়াকুব খান প্রমুখ আছেন। আছেন জোসেফ জন সিসকো, আলফ্রেড এল আথারটন, পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি এ বাইরোড। নোট নেন পিটার ডি কনস্টেবল। পাকিস্তান সফরে কিসিঞ্জার দম্পতির মধুর অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা আলোচনার শুরুতেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। কিসিঞ্জারের ভাষায়, মিসেস কিসিঞ্জার পাকিস্তানের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। এ সময় সিসকো বলেন, 'মি. সেক্রেটারি, প্রধানমন্ত্রী তো আপনাকে রাজকীয় সংবর্ধনা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের চেয়ে অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা আপনারই প্রাপ্য।' বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এ দিন কিসিঞ্জারই তোলেন আগে।

> কিসিঞ্জার : মি. প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকে আপনার জন্য বার্তা রয়েছে। তারা কোনো শর্ত ছাড়াই আপনার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত। আমাকে তারা এটা আপনাকে বলতে বলেছে।
>
> ভুট্টো : ধন্যবাদ। আমি সহযোগিতা দিয়ে খুশি হব।
>
> কিসিঞ্জার : বাংলাদেশের পরিবর্তনে [বাকশাল] আপনি কি অবাক হয়েছেন?
>
> ভুট্টো : না।

কিসিঞ্জার : আমার নিজের ধারণা, মুজিবের মেধা সরকার পরিচালনার চেয়ে বাগ্মীতায় বেশি। ১৯৭১ সালে আমি পূর্বাভাস দিয়েছিলাম যে, বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক 'বাস্কেট কেস' হবে।

ভুট্টো : বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্য ও কবিতা। মুজিব কবিতা দিয়েছেন। কিন্তু জনগণের দারিদ্র্য রয়েছে। তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিসিঞ্জার : মুজিব কি টিকতে পারবেন?

ভুট্টো : আমি এতে সন্দেহ করি।

কিসিঞ্জার : তখন কী হবে? সেনাবাহিনী আসবে?

ভুট্টো : হ্যাঁ। আর তখন তারা ক্রমবর্ধমানভাবে ভারতবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

কিসিঞ্জার : গত অক্টোবরে আমার দক্ষিণ এশিয়া সফরের পর আমার নীতিনির্ধারণী কমিটির প্রধান বলেন, ভারতকে দেখার পর তাঁর মনে হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়কে পারমাণবিক অস্ত্র দেওয়া! (হাসি)

সিসকো : আমি সেদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হোসেন আলীকে বলেছি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হবে এক স্বাভাবিক মিত্র।

ভুট্টো : আমরা যদি একটি কনফেডারেশন হতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো।

আজিজ আহমাদ : তাদের অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিয়ে হলেও।

ভুট্টো এই আলোচনায় কিসিঞ্জারকে বলেন যে, 'চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে চায় এবং এ নিয়ে তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা তাদের তা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেছি। দাউদের ভাই নইম যখন পিকিং যাচ্ছিলেন এবং আমি মস্কো সফরে ছিলাম সেই সময়ে চীনকে এটা আমরা বলি। সময়টা [বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষে] অনুকূল মনে হয়নি।'

চুয়াত্তরের ২৯ অক্টোবরে কিসিঞ্জার ভারত সফরে ছিলেন। এ দিন তিনি সাউথ ব্লকের বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শরণ সিংকে বলেছিলেন, ভুট্টো তাঁকে বলেছেন যে, তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন। তবে তার আগে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে একটা বিরোধ মেটাবেন। এর পরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন, যেটা তিনি করেছিলেন। শরণ সিং এ সময় কিসিঞ্জারকে বলেন, 'কিন্তু আপনার উচিত হবে না এ ধরনের নীতির প্রতি উৎসাহ জোগানো।' যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত টি এন কাউল বলেন, সিমলা চুক্তির পর ভুট্টো বলেছিলেন যে, বাংলাদেশকে তিনি দুই সপ্তাহের মধ্যে স্বীকৃতি দেবেন। কিসিঞ্জার বলেন, 'হ্যাঁ', অর্থাৎ তিনি এ বিষয়ে অবগত আছেন।

সেই স্বীকৃতি পাকিস্তান দিয়েছে যেন শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে। ভুট্টো তাঁর আবেগ প্রকাশে ছিলেন অকপট।

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাইরোড ১৬ আগস্ট ওয়াশিংটনে পাঠানো এক তারবার্তায় (১৯৭৫ইসলামা০৭৫০৪) বলেন, পাকিস্তান তাদের স্থানীয় সময় বেলা দুইটার দিকে প্রেসকে তাদের বিবৃতি সরবরাহ করে। ঢাকার প্রতি এমন উষ্ণতম বিবৃতি এই প্রথম। এতে বলা হয় :

> বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি আমাদের প্রথম ও স্বতঃস্ফূর্ত শুভেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমি পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ৫০ হাজার টন চাল, ১ কোটি গজ কাপড় (লং ক্লথ) ও ৫০ লাখ গজ সুতি কাপড় উপহার হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাংলাদেশের ভাইদের প্রয়োজনের মুহূর্তে এসব জিনিসই আমাদের জনগণের অকিঞ্চিৎকর অনুদান এবং আমাদের মধ্যকার সংহতির প্রতীক, আর এই সংহতি ধ্বংস হওয়ার নয়; যা এমনকি ১৯৭১ সালের বিয়োগান্ত ঘটনায়ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি।
>
> আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য বৃহত্তর ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত। কারণ বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে আমরা অভিন্ন জাতিসত্তা ও ভবিষ্যতের বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্ববাসী জানুক যে আমরা সুখে-দুঃখে ঐক্যবদ্ধ।
>
> আমরা ইসলামি সম্মেলনের সদস্যদের প্রতি ইসলামি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমরা তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের প্রতি একই অনুরোধ জানাই। আমাদের এই আবেদন বেদনামথিত অনুভূতিতে সিক্ত। যে অনুভূতি আমাদের অনুভবে সারাক্ষণ জাগরূক তা হলো, কীভাবে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশকে বিভক্ত করা হয়েছিল।
>
> শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিয়োগান্ত পরিণতির ঘটনায় আমি দুঃখ প্রকাশ করি।

ভুট্টোর বার্তা এখানেই শেষ। এরপর বাইরোড লিখেছেন :

> 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'নতুন সরকার আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় স্বীকৃতি লাভের সব শর্ত পূরণ করেছে। সরকারের কর্তৃত্ব কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। বরং বাংলাদেশের জনগণ তাকে গ্রহণ করেছে।
>
> পাকিস্তান সরকার সারা দিন উদ্বিগ্ন হয়ে ও ঘনিষ্ঠভাবে ঢাকার ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করেছে। আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র

> মন্ত্রণালয় সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখে। তারা রেডিও বাংলাদেশের খবর মনিটর করে ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত বার্তার দিকে নজর রাখে। আমরা লক্ষ করি, ঊর্ধ্বতন ও ওয়ার্কিং পর্যায়ের কর্মকর্তারা ভারত সরকারের ও সোভিয়েত প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তাদের মস্ত বড় দুশ্চিন্তার কারণ ছিল ঢাকার নতুন সরকারকে এত দ্রুত স্বীকৃতিদানের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। তবে তারা যে সর্বাগ্রে স্বীকৃতি দিল এবং ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে তাদের অনুসরণ করতে বলল তার মুখ্য কারণ হলো ভারতীয় সামরিক অভিযানের আশঙ্কা দূর করা।
>
> মোশতাক আহমদের নেতৃত্বের প্রতি পাকিস্তানের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। যদিও তাদের মধ্যে একটা সংশয় রয়েছে যে শেষ পর্যন্ত নতুন সরকারের কার্যকর নেতা হিসেবে কার অভ্যুদয় ঘটে? পাকিস্তানের বিবেচনায় মোশতাক উদার, চতুর, ঠান্ডা, দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক। তারা এটাও মনে রেখেছে যে মোশতাক হলেন মুজিবনগর সরকারের সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি পাকিস্তানের সঙ্গে একটি আপসরফায় পৌঁছাতে সচেষ্ট ছিলেন। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তাঁকে সেচমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল। এসব ঘটনা প্রমাণ দেয় যে তিনি ভারতের বন্ধু নন। পাকিস্তানিরা মোশতাক সরকারকে যে উষ্ণতম স্বীকৃতি দিল, সহায়তার ঘোষণা দিল, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকার নতুন সরকারের সঙ্গে সম্ভাব্য মধুরতম সম্পর্কের সূচনা ঘটানো। তারা আশাবাদী যে এই সরকারের সঙ্গে তারা মুজিবের চেয়ে ঢের বেশি বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কাজ করতে সক্ষম হবে। উভয়ের মধ্যকার মতপার্থক্য দূর করতে পারবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যা সম্ভব হয়নি।

ওই বার্তা থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত তখনো পর্যন্ত 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ ঘোষণা' সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাননি। সে কারণে তিনি লিখেছেন, নতুন সরকার নিজেকে নিজে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছে। এবং কথিতমতে জানা গেছে যে 'আগে যেসব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, তাদের কাছে টানাই নতুন সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য।'

বাইরোডের চার পৃষ্ঠার ওই তারবার্তার উপসংহারে বলা হয় :

> পাকিস্তানের পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আজ পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা বৈঠকে বসবে। নতুন সরকারের বিষয়ে পাকিস্তানের অধিকতর সুচিন্তিত মূল্যায়ন আমরা আগামী সপ্তাহে পাব বলে আশা করা যায়। ঢাকার পটপরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার ওপর তার কী

প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কেও পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির আঁচ পাওয়া যাবে।

বাইরোডের কাছে ভুট্টো ১৭ আগস্ট স্বীকার করেন, বাংলাদেশ নিয়ে তিনি গত কয়েক দিন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। সে কারণে তিনি পাকিস্তানে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আজিমভের সঙ্গে আফগান পরিস্থিতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কথা বলতে পারেননি। এখানে উল্লেখ্য যে, ভুট্টো মার্কিন আগ্রহে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আজিমভের কাছ থেকে বাংলাদেশ বিষয়ে তাঁদের মনোভাব জেনে নিতে সচেষ্ট হন। তাতে সোভিয়েত তরফে যে কেউ কেউ বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার বিষয়ে জোরালো সন্দেহ পোষণ করতেন তারও প্রমাণ মেলে। বাইরোড ওই তারবার্তায় লিখেছেন, ভুট্টো তাঁকে বলেন যে, অজিমভের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গও আসে। সারবার আজিমভ তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের ঘটনাবলি একান্তভাবেই অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভুট্টোর বিবরণ অনুযায়ী, আজিমভ তাঁকে বলেন যে, এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা থেকে অনেক দূরের একটি বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। আর এতে যে তারা জড়িত ছিল তার সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ রীতিমতো স্বতঃসিদ্ধ (self-evident)। ভুট্টো বলেন, তিনি আজিমভকে বলেছেন যে, এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

মার্কিন দলিলগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, ওই সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী কিছু দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল তাদের স্বপ্নের 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ'-এর নতুন নেতাদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার আশায়।

পঁচাত্তরের ২১ আগস্ট ওয়াশিংটন থেকে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রদূতদের কাছে পাঠানো একটি তারবার্তায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর উল্লেখ করে, পাকিস্তান মনে করে, বাংলাদেশে তাদের প্রভাব বাড়বে। ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস লিখেছে, পাকিস্তানিরা এই মর্মে আশাবাদী যে ঢাকার নতুন সরকার বাংলাদেশে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব প্রতিহত করতে মুজিবের চেয়ে অনেক দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হবে। যদিও পাকিস্তানিরা এটা জানে যে ভারত সেখানে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

ওই তারবার্তায় আরও বলা হয়, 'পাকিস্তান মনে করে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সৌদি আরব পাশে দাঁড়াবে। পাকিস্তান আরও আশা করে, চীন শিগগিরই বাংলাদেশের

নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেবে। পাকিস্তানিরা একযোগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অভ্যুত্থানকে অভিনন্দিত করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্বিগ্ন রয়েছে যে, বাংলাদেশ যদি তার রাষ্ট্রকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করতে না পারে, তাহলে পাকিস্তানিদের সব ক্ষোভ ভুট্টোর ওপর গিয়ে পড়বে। কারণ, ভুট্টোই ইসলামি প্রজাতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ঢাকার নতুন সরকারকে দ্রুততার সঙ্গে স্বীকৃতি দিতে উদ্যোগ নেন।'

ইসলামি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ

ইসলামাবাদ থেকে রাষ্ট্রদূত বাইরোড ১৮ আগস্ট এক তারবার্তায় (১৯৭৫ইসলামা০৭৫৪৫) লিখেছেন :

> পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ সকালে বিবিসি প্রচারিত একটি খবরকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। এই খবরে বলা হয়, বাংলাদেশের নতুন সরকার এখনো দেশটিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র না বলে গণপ্রজাতন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে চলেছে। এ বিষয়ে তারা জানতে চাইলে আমরা তাদের বলেছি, বাংলাদেশের নাম বদলানোর বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো খবর নেই।
>
> বাংলাদেশের নাম পরিবর্তনের আগের খবরকে সত্য ধরে নেওয়ার কারণে এখন অবশ্যই পাকিস্তান হতাশাগ্রস্ত। রেডিও বাংলাদেশকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা ওই খবরের ডেটলাইন ছিল ভারতীয়। পাকিস্তানে সে খবর বিরাট কভারেজ পায় এবং ভুট্টো যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, সমর্থন ও সহায়তার ঘোষণা দেন, তার মূলে এই খবরের ভূমিকা ছিল বিরাট। একাত্তরে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃত্যু ঘটেছিল, তা আবার পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ঘটনায় ইসলামাবাদ আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'মুসলিম বাংলা'র উত্থানকে পাকিস্তানের সংবাদপত্র স্বাগত জানায়। অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে তারা সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখন বাংলাদেশের নাম যদি না বদলায়, তাহলে পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া কী হয়, তা দেখার বিষয়।

২০১১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার *দ্য স্টেটসম্যান*-এর সম্পাদক মানস ঘোষের এক নিবন্ধে বলা হয়, খন্দকার মোশতাক আহমদের সাবেক জনসংযোগ কর্মকর্তা ১৯৭৫ সালের একটি নাটকীয় পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন। ১৫ আগস্টে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারত ও সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ঢাকায় ছিলেন না। ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন গাড়িতে চেপে কলকাতা হয়ে ১৬ আগস্টে ঢাকায় পৌঁছান। তিনি হাইকমিশনে তাঁর সহকর্মী এবং ঢাকার

'বন্ধুদের' সঙ্গে অনেকগুলো বৈঠক সেরে ১৮ আগস্ট বঙ্গভবনে যান। গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষমাণ আলোকচিত্রীদের সামনে তাঁকে সহাস্য দেখা যায়। এটা উপস্থিত কর্মকর্তাদের বিস্মিত করে। এরপর এক খণ্ড কাগজ হাতে সমর সেনকে সরাসরি 'প্রেসিডেন্ট' মোশতাকের সান্নিধ্যে দেখা যায়। মোশতাক দাঁড়ানো থাকতেই ভারতীয় হাইকমিশনার তাঁর কূটনৈতিক নোট পড়ে শোনান। মোশতাক এরপর বিমর্ষ মুখে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন। এতে লেখা ছিল :

> যদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করা হয় এবং কোনো দেশের সঙ্গে কনফেডারেশন করা হয়, তাহলে ভারতের কাছে থাকা বৈধ চুক্তির আওতায় ভারতের সেনাবাহিনী যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু আপনি যদি নাম পরিবর্তন এবং তথাকথিত কনফেডারেশনের ধারণা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে ভারত ১৫ আগস্ট থেকে যা-ই ঘটুক না কেন, তাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করবে।

২০ আগস্ট ১৯৭৫ রাষ্ট্রদূত বাইরোড তাঁদের পররাষ্ট্র দপ্তরকে বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠান। হেনরি বাইরোড ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। কূটনৈতিক পেশায় যোগদানের জন্য তিনি সামরিক চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। বাইরোড লিখেছেন :

১. পাকিস্তানিরা ঢাকার নতুন সরকারকে আবেগাপ্লুত হয়ে স্বীকৃতি ও সমর্থন দেওয়ার নেপথ্যে বড় কারণ ছিল বাংলাদেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্র হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। সে কারণেই ঢাকার অভ্যুত্থান সম্পর্কে পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করার চেষ্টা জটিল ও বিভ্রান্তিকর। কারণ, বাংলাদেশের পুনর্নামকরণের খবর দেশটির সরকারি কর্মকর্তা, সংবাদপত্র ও জনমতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। অথচ ১৮ আগস্ট সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথমেই বিবেচনায় নিয়েছে যে, খবরটি হয়তো তথ্যভিত্তিক ছিল নয়। এটা ছিল ভুট্টোর 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি' দেওয়ার আড়াই দিন পরের ঘটনা। ২০ আগস্টের সকাল থেকে পাকিস্তানের সংবাদপত্র এ বিষয়টি কোনোমতে উল্লেখ করতে শুরু করেছে।

২. বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের প্রতি পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও জনগণের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল আবেগঘন এবং জোরালোভাবে ইতিবাচক। অভ্যুত্থানের আগে তারা তাদের সাবেক পূর্ব ভূখণ্ডটি সম্পর্কে অত্যন্ত ভাবলেশহীন হয়ে পড়েছিল। তাদের সেই মনোভাবের তুলনায় অভ্যুত্থানের পরের পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াকে একেবারে অচেনা মনে হচ্ছিল। সব সংবাদপত্র বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে যথেষ্ট ফলাও করে

প্রচার করে। এটা ছিল ঢাকার ঘটনায় পাকিস্তানের জনস্বার্থের উগ্র বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি দৃশ্যত মুসলিম বৃত্তে ঢুকে পড়েছে ধরে নিয়েই পাকিস্তানের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তান এবং মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে দ্রুততার সঙ্গে নেওয়া ভুট্টোর উদ্যোগ অগ্রণী পদক্ষেপ বিবেচনায় প্রশংসিত হয়। উপরন্তু সম্পাদকীয় এবং ঘরোয়া বৈঠকের আলোচনায় মূলত এ কথাই উচ্চারিত ও স্বীকৃত হয় যে, ভুট্টো আবারও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। মুজিবের হত্যার খবরটি পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলো এবং অনেক ব্যক্তি সন্তুষ্টির সঙ্গেই নিয়েছেন। শুধু কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই অনুশোচনা দেখা গেছে। কিন্তু তাঁরা সহিংসতার প্রতি বিমুখ থাকলেও ফলাফলের ব্যাপারে ছিলেন না। মুজিব ব্যাপকভাবে চিত্রিত ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলামের প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। একজন বিশ্বাসঘাতক ও স্বৈরশাসকের পরিণতি এমন হওয়াই প্রত্যাশিত—এই ছিল পাকিস্তানিদের মনোভাব।

৩. কতিপয় সংবাদপত্র এবং আমাদের সূত্রগুলো বাংলাদেশের নতুন সরকার যেসব সমস্যা ও জটিলতা মোকাবিলা করছে সেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছে। কিন্তু তা নিয়ে তাদের সতর্কতা তুলনামূলকভাবে কম। ঢাকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের সাধারণ সন্তুষ্টিই লক্ষণীয়। বাংলাদেশের নতুন সরকারের বিরুদ্ধে ভারত কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা তাদের রয়েছে। পাকিস্তানিরা ব্যাপকভাবে এবং সন্তুষ্টির সঙ্গেই বিবেচনা করে যে, বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানের ফলে ভারত একটা বড় রকমের আঘাত পেয়েছে। সম্ভাব্য ভারতীয় অভিযানের বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেমন ছাপা হচ্ছে তেমনি এ নিয়ে অন্যত্রও আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। সাংবাদিক এবং অন্যরা ঘরোয়াভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে ভারত আকস্মিকভাবে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে বসতে পারে। একই সঙ্গে পাকিস্তানে এমন ধারণাও ব্যাপক যে ভারত এই মুহূর্তে নিজস্ব সমস্যা মোকাবিলা করছে। আর ইসলামি দেশগুলোর কাছ থেকে বাঙালিরা ইতিমধ্যেই সমর্থন পেয়েছে। ফলে সে ধরনের হস্তক্ষেপ এলে সৌদি আরবের মতো ইসলামি দেশগুলোর কাছ থেকে তা প্রতিহত করার ব্যাপারে সহায়তা মিলতে পারে। বাংলাদেশ যেসব অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করছে তা-ও এখানে উল্লেখিত হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের মধ্যে আশাবাদ রয়েছে যে, ধনী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ফিরে আসা ভাইয়ের সাহায্যের জন্য এখন প্রস্তুত থাকবে।

৪. বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল এবং

নেতৃবৃন্দ অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা পাকিস্তান সরকারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ব্যাপারটিতে সন্তুষ্ট। সংবাদপত্রের পাতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উচ্ছ্বাসপ্রবণ বিবৃতিতে পরিপূর্ণ। সব বিবৃতিতেই উৎসাহ উপচে পড়ছে। জামায়াতে ইসলামীর আধ্যাত্মিক নেতা মাওলানা মওদুদি বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনকে আল্লাহর নিয়ামত এবং ইসলামের জন্য গুরুত্ববহ বলে বর্ণনা করেছেন। ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (১৯৭৩ সালে ভুট্টো সরকারের বিরোধিতার জন্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ও সিনেটে প্রতিনিধিত্বশীল বিরোধী দল নিয়ে গঠিত) কেন্দ্রীয় অ্যাকশন কমিটি বাংলাদেশের পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ওই প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশের 'সুখকর' পরিবর্তন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করবে। এবং এতে সব ইসলামি দেশকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডগত সংহতি নিশ্চিত করা এবং 'কোনো বিদেশি হস্তক্ষেপ' প্রতিহত করা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানানো হয়। এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য ওআইসি সচিবালয়কে তারা একটি বৈঠক আহ্বান করতেও দাবি জানায়। এটা বিস্ময়কর নয় যে, ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের ঘটনাবলির মধ্যে পাকিস্তানের জন্য তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছে। তাদের প্রস্তাবে এ মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, পাকিস্তানে 'রাজনৈতিক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা' অব্যাহত থাকলে এ দেশেও তা বাংলাদেশের মতো নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

৫. পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের বলেছে, তারা সতর্ক রয়েছে যে পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে তা যদি বজায় থাকে, তাহলে তা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ককে রূপ দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করবে। মন্ত্রণালয় অবশ্য একটি ব্যাপারে সন্দহাতীত ও বেদনাদায়কভাবে সচেতন রয়েছে যে, যেমনটা ভুট্টোর নিজেরও সতর্ক হওয়া উচিত, আর তা হলো বাংলাদেশের ইসলামি কোনো নামকরণ যদি চূড়ান্তভাবে ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে পাকিস্তানের জনগণের ভাবাবেগ দ্রুততার সঙ্গে উবে যেতে পারে। ভুট্টো যে উপমহাদেশে একটি দ্বিতীয় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের উত্থানকে যথাসময়ের আগেই অনুমোদন দিয়েছিলেন, তার রাজনৈতিক প্রভাব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সুনামের ওপর কী ও কতটা প্রভাব ফেলে তা এখনই বলা দুষ্কর। তিনি যে আগ বাড়িয়ে পাকিস্তানকে অনুসরণের জন্য মুসলিম বিশ্বকে আহ্বান জানিয়েছেন, তা ইসলামাবাদের ওয়াকিবহাল মহলে ইতিমধ্যে একটা বড় জল্পনাকল্পনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আপাতত এর পরিণাম বাস্তবে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ হতে

পারে, সে বিষয়ে এখনো কেউ কোনো মন্তব্য করতে প্রস্তুত নন।

৬. পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যাবেক্ষণ করে চলেছে। বাংলাদেশের তথ্য সংগ্রহ করতে তারা আমাদের এবং অন্যান্য মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে। (বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা যে তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন সরবরাহ এবং অনুমিত মূল্যায়ন সম্পর্কে সময়ে সময়ে অবহিত রাখছি, সে জন্য তারা আমাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ) তারা অবশ্য আগের মতোই নির্দিষ্টভাবে ভারতীয় মনোভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন রয়েছে এবং একই সঙ্গে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' প্রশ্নেও তারা সন্দিগ্ধ। (এটা অবশ্য ইতিমধ্যেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে বাংলাদেশের নামের পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু সম্ভবত তারা আশাবাদী যে এ ধরনের একটি পরিবর্তন আসন্ন।)

৭. ১৮ আগস্ট দুপুরে আমাদের পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের সঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাপরিচালক হায়াত মেহেদির আলোচনা হয়। তিনি অবশ্য অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়সহ সম্পর্ক কতটা উন্নত হবে সে বিষয়ে সতর্ক আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মেহেদির দৃষ্টিভঙ্গিতে মুজিব ছিলেন পাকিস্তান সরকারের প্রতি কট্টর অবস্থান গ্রহণকারী বাংলাদেশি নেতৃবৃন্দের অন্যতম। তাঁর প্রস্থানের মধ্য দিয়ে একটা পরিবর্তন আসবে। দুই দেশকে যেসব বিষয় এত দিন বিভক্ত করে রেখেছিল, সেসব বিষয়ে নমনীয় ভূমিকা গ্রহণে বাংলাদেশের নতুন সরকার এখন যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে তা প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করেন মেহেদি। তিনি আরও মনে করেন যে, বাংলাদেশে বিহারি প্রত্যাবর্তন নিয়ে মুজিব আমলে যেমনটা চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এখন তার অবসান হবে। বিহারিরা যাতে বাংলাদেশেই জীবন ধারণের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তা নিশ্চিত করা হবে। আর এর ফলে বিহারি প্রত্যাবাসন ইস্যুতে চাপ শিথিল হবে। মেহেদি অবশ্য অনুমান করতে পারেননি, দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের বিষয়টি ফয়সালা হওয়ার আগেই বিহারি প্রত্যাবাসন এবং সম্পদ ও দায়দেনাসংক্রান্ত বিরোধের সুরাহা ঘটবে কি না। আমাদের মূল্যায়ন হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার যদি রাজি হয়, তাহলে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তান খুবই দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হবে।

৮. মেহেদি মনে করেন, বাংলাদেশ সরকারের নতুন নেতৃবৃন্দের উচিত হবে দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া এবং তার পরই তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, মুজিব ঢাকায় ভারতীয় ও সোভিয়েত প্রভাবের বিপরীতে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন,

> পাকিস্তান সরকারও একই ভূমিকা পালনে সচেষ্ট রয়েছে। মেহেদি আরও মনে করেন যে, পিকিং শিগগিরই ঢাকাকে স্বীকৃতি দেবে। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশে ভারতের একটা বিরাট প্রভাব থাকবেই। বাংলাদেশ দিল্লির কাছ থেকে কতটা স্বাধীনভাবে চলবে তা নির্ভর করছে বাংলাদেশের নতুন সরকারের নেতৃবৃন্দের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়া ও শক্তি-সামর্থ্যের ওপর। এটা এমন একটা বিষয়, বুদ্ধিদীপ্তভাবে কারও পক্ষেই এখন যার অর্জনযোগ্যতা সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব নয়। মেহেদি আরও উল্লেখ করেন যে তাঁর বাংলাদেশে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ভারতের সামনে কেবল সামরিক হস্তক্ষেপ উপায় নয়, তাঁর সামনে অধিকতর সূক্ষ্ম অনেক বিকল্প রয়েছে। আর সেটা ভেবে অভ্যুত্থানের পরপরই পাকিস্তান সন্দেহ-সংশয় নিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

ওই তারবার্তায় বাইরোড আরও লেখেন :

> পাকিস্তানের বিভিন্ন মহলকে ঢাকার নতুন সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিষয়ে আশঙ্কা ব্যক্ত করতে দেখা গেছে। আমাদের সূত্রদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন, ভারত আকস্মিকভাবে ঢাকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে বসতে পারে। তবে তাদের মধ্যে এই আশাবাদও রয়েছে যে, ধনী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দুই ভাইয়ের নৈকট্যলাভের মুহূর্তকে সুষমামণ্ডিত করতে এখন নিশ্চয় প্রস্তুত থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলো এবং সব শ্রেণীর নেতারা বাংলাদেশকে ভুট্টোর ত্বরিত স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বাইরোডের এই তারবার্তা থেকে দেখা যায়, জামায়াতে ইসলামীর আধ্যাত্মিক নেতা মাওলানা মওদুদি মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণকে 'আল্লাহর আশীর্বাদ' ও 'ইসলামের বিজয়' হিসেবে বর্ণনা করেন।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রশ্নে ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার ও ইসলামাবাদে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত হেনরি বাইরোডের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি। বাইরোড আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে লিখেছেন, 'এটা এখন প্রতীয়মান হচ্ছে, নাম পরিবর্তনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু সম্ভবত ইসলামাবাদ আশাবাদী যে, সে ধরনের একটি পরিবর্তন আসন্ন।'

২২ আগস্ট ১৯৭৫ বোস্টার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে পৃথক তারবার্তায় জানিয়েছেন, 'মোশতাক বৈদেশিক সম্পর্ক ও স্বীকৃতির প্রশ্নে দুটো বিশেষ কারণে উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রথমত, সরকারের বৈধতার সংকট রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকার এখনো ভারতকে পুরোপুরি ভয় পাচ্ছে। তাই তাঁর বিশ্বাস, যদি স্বীকৃতি মেলে তাহলে তা ভারতীয় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করবে।'

বোস্টার লিখেছেন :

> পাকিস্তানের তাৎক্ষণিক স্বীকৃতিকে বাংলাদেশে স্বাগত জানানো হয়েছে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এ বিষয়টি তাদের মন-মেজাজের জন্য প্রশান্তিদায়ক হয়েছে। তবে পাকিস্তান যে উপঢৌকন হিসেবে চাল ও কাপড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, তা বাংলাদেশে প্রকাশ করা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের গান বর্জন

বোস্টার ২২ আগস্ট আরও লিখেছেন :

> বাংলাদেশ একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হয়েছিল কিংবা হতে পারে, সেই সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। অভ্যুত্থানের পরের দিনগুলোতে এ রকম ইঙ্গিত ছিল যে, যদি বাংলাদেশের নাম পুরো পরিবর্তন করা না-ও সম্ভব হয়, তাহলেও এর একটি অধিকতর ইসলামি চরিত্র স্পষ্ট করে তোলা হবে। আমরা বুঝতে পারি যে রেডিও বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বর্জন করেছে। ব্যতিক্রমটুকু শুধু এখনো জাতীয় সংগীতেরই বেলায়। এ ছাড়া ভগবদ্‌গীতা পাঠ বন্ধ করা হয়েছে। এসবের বেশির ভাগই করা হয় অভ্যুত্থানের দিন জুমার নামাজের জন্য কারফিউ শিথিল করার আগে। ভাষণের শেষে 'জয় বাংলা'র উচ্চারণ, যাতে কিনা সংস্কৃত ভাষার ব্যঞ্জনা রয়েছে, তা পরিহার করা হয়েছে। এর পরিবর্তে এসেছে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। যদিও গীতা থেকে পাঠ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান পুনরায় শোনা যাচ্ছে, কিন্তু জিন্দাবাদ ধ্বনিটি হয়তো টিকে যাবে।

বোস্টারের এই তারবার্তা নিশ্চিত করে, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ অভ্যুত্থানকারীদের মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন নিয়ে ওই সময় যে জোরালো চিন্তা চলেছিল, তারও সাক্ষ্য বহন করে বোস্টারের এই তারবার্তা। তিনি তাঁর সরকারকে জানান, যদি বাংলাদেশের নামে কোনো পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে শুধু 'পিপলস' বা 'গণ' শব্দটি বাদ দেওয়া হতে পারে। এর ফলে প্রজাতন্ত্রকে 'আনকোয়ালিফাইড' করা হবে। অবশ্য নতুন সরকার যাতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ধরে রাখে তার জন্য ভারতের সংবেদনশীলতা বজায় থাকবে বলেই বেশির ভাগ পর্যবেক্ষক মনে করেন।

বোস্টার এই তারবার্তার উপসংহার টানেন এই বলে যে, 'মুজিববিহীন একটি সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মনে হচ্ছে, দেশটি বড়ই অনিশ্চয়তার কবলে। ক্ষমতার কেন্দ্র যে কোথায়, তা এখনো স্থির হয়নি এবং ভারতের ভয় বাতাসে ভাসছে।'

ভুট্টো ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সৌদি আরব সফর করবেন বলে ঘোষণা দেওয়ার পর বাইরোড ২২ আগস্ট ওয়াশিংটনে একটি তারবার্তা পাঠান। এতে তিনি উল্লেখ করেন :

> প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমাদ ও পররাষ্ট্রসচিব আগা শাহি। তাঁর সফরের সাধারণ উদ্দেশ্য, যেটা এখানে দীর্ঘদিন ধরে বিবেচনাধীন তা হচ্ছে, সমমনা ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর নতুন নেতৃত্বের জন্য ভিত্তি তৈরি করা, যাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া তিনি এ সফরে নির্দিষ্টভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য দেশ থেকেও অস্ত্র কিনতে নতুন করে সৌদি সরকারের অঙ্গীকার আদায়ে উৎসাহী থাকবেন। ভুট্টো সৌদি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের তাৎপর্য সম্পর্কেও আলোচনা করতে পারেন।

ওই তারবার্তা থেকে দেখা যায়, বাইরোড এটাও উল্লেখ করেছিলেন, ভুট্টো সেখানে একটি বিব্রতকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারেন। তাঁকে সেখানে কঠিনভাবে ব্যাখ্যা করতে হতে পারে যে, তিনি যে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ'কে দ্রুত আগাম স্বীকৃতি দিয়ে অন্যান্য মুসলিম দেশকেও তা অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এখন তা কেমন মনে হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য, ১৬ আগস্ট জেদ্দা থেকে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা মি. হোয়ানের পাঠানো বার্তায় দেখা যায়, সৌদি আরব সরকার বাংলাদেশের অভ্যুত্থান বিষয়ে বিস্তারিত খবর জানতে যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয়েছিল। হোয়ান লিখেছেন, 'সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আজ [১৬ আগস্ট] সকালে দূতাবাসকে অনুরোধ করেন যে তাঁরা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের গুজব সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যেন তাঁদের বিস্তারিত অবহিত করে।' লক্ষণীয় যে, এই গোপন তারবার্তায় হোয়ান মন্তব্য করেন যে ঢাকায় নতুন সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি সৌদি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। তাই তারা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে চায়।

১৯৭৫ সালের ২২ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রস্তুত বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে বাংলাদেশেরও উল্লেখ রয়েছে। মি. রবিনসনের স্বাক্ষরিত এই বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, পাকিস্তান ভারতের তৎপরতাকে অশুভ সংকেত হিসেবে গণ্য করে।

ইসলামাবাদে নিযুক্ত সুইস রাষ্ট্রদূতকে পাকিস্তানিরা বলেছে, তারা তাদের আগের তথ্য এখন পুনর্মূল্যায়ন করেছে এবং এখন তারা বিশ্বাস করে যে, গত

২১ আগস্ট ভারতের মনোভাব সম্পর্কে তারা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল তা ছিল অতিরঞ্জিত।

ভারতীয় সামরিক ও নৌবাহিনীর তৎপরতার সম্ভাব্য অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আর সে বার্তাটি হলো বাংলাদেশের নতুন সরকার যদি তার পূর্বসূরির অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি থেকে বেশি সরে আসে তবে ভারত তা মেনে নেবে না।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের প্রভাব

২৮ আগস্ট ১৯৭৫ ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি লিখেছেন :

> ২৭ আগস্ট আমাদের ভারপ্রাপ্ত পলিটিক্যাল কাউন্সিলর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাকিস্তান ডেস্কের যুগ্ম সচিব অশোক চিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। এতে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনায় আসে। ৪০ মিনিটের এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, সালাল ড্যাম ইস্যু ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের বাধা-বিঘ্ন অটুট আছে। লক্ষণীয় যে, দিল্লি-ইসলামাবাদ সম্পর্কের বিশ্লেষণে চিবের বরাতে স্যাক্সবি ৫টি কারণ চিহ্নিত করেন এবং এর মধ্যে এক নম্বরে রাখেন বাংলাদেশকে।

স্যাক্সবি লিখেছেন :

> বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেওয়া বা পদক্ষেপ নেওয়ার প্রশ্নে ভারত খুবই সতর্ক। তেমন কোনো কিছু কাজে লাগিয়ে ভারতকে দোষারোপ করে পাকিস্তান যাতে কোনো ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারে। বাংলাদেশের ঘটনাবলির ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে, এর কোনো কারণ দেখতে পায় না ভারত। তবে পাকিস্তান যখন তরিঘড়ি করে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি দিয়ে বসল, তখন ভারত অবশ্যই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিল। কিন্তু ভারত এটা বিশ্বাস করে না যে, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের কারণে ঢাকার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে বড় কোনো পরিবর্তন সূচিত হবে।

২৭ আগস্ট ১৯৭৫ ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার যে তারবার্তাটি পাঠান তার শিরোনাম ছিল : 'প্রেসিডেন্ট মোশতাক প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে লিখেছেন'। বার্তাটি হুবহু নিচে তুলে দেওয়া হলো :

> গত সন্ধ্যায় (২৬ আগস্ট) বাংলাদেশ বেতার একটি খবর প্রচার শুরু করে,

যা আজকের ঢাকার সংবাদপত্রেও ইসলামাবাদ ডেটলাইনে রয়টার্সের বরাতে ছাপা হয়েছে। ওই বার্তায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর কাছে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের প্রেরিত পত্রের একটি বয়ান রয়েছে। খবরে উল্লেখ করা হয় যে, ভুট্টো এর আগে মোশতাকের কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, এটি তারই জবাব। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এবং উপমহাদেশের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ দেখতে আগ্রহী। পত্রে মোশতাক পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে তাঁর সুস্পষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

বোস্টার মন্তব্য করেন :

ঢাকায় মোশতাকের চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়নি। এ নিয়ে ঢাকা ডেটলাইনে কোনো খবরও ছিল না। খবরটি পত্রপত্রিকায় সাদামাটাভাবে এসেছে। আমরা এই বার্তা পৃথক তারবার্তায় পাঠিয়েছি; যা থেকে দেখা যাবে এতে কোনো উচ্ছ্বাস ছিল না। পত্রারম্ভে আস্‌সালামু আলাইকুম কিংবা চাল বা কাপড় অনুদানের জন্য পাকিস্তানের প্রতি ধন্যবাদসূচক কোনো শব্দ উল্লেখিত হয়নি। এটা লক্ষণীয় যে পাকিস্তানি চাল এবং কাপড় অনুদানের বিষয়টি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেনি।

পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক

২৮ আগস্ট ১৯৭৫ পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি বাইরোড অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের একটি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। বাইরোড তাঁর এই দীর্ঘ তারবার্তার সারসংক্ষেপে উল্লেখ করেন :

বাংলাদেশের নতুন সরকার যদিও ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে দেশটির নাম পরিবর্তন করেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার মনে করে যে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ এবং মোটামুটিভাবে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। পাকিস্তানিরা মনে করত যে, মুজিবের শাসনামলে বাংলাদেশ ছিল ভারতের তাঁবেদার। আর সে কারণেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ব্যাপারে মুজিবের কম আগ্রহ ছিল। বাংলাদেশে অভ্যুত্থান সংঘটনের ফলে পাকিস্তান সরকার মনে করছে, এখন দুরকম সুবিধাই হলো। দুই দেশের সম্পর্ক এখন আরও উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যা, তা হলো, এখন এ ধরনের সম্পর্ক থেকে 'প্রকৃত রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ফায়দা' মিলবে। ইসলামাবাদ মনে করছে, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত

হলে তা তার নিজের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আকর্ষণীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি পাকিস্তানের জনগণের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তান মনে করে, মুজিবকে উৎখাতের ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এখন বাংলাদেশের সঙ্গে 'ভ্রাতৃসুলভ' সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ সুগম হবে।

পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে তার জন্য নতুন সুবিধা পেতে বাস্তবসম্মত অবস্থান গ্রহণ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। তারা একই সঙ্গে ঢাকায় ভারতের অব্যাহত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তার নিজের সীমাবদ্ধতার বিষয়েও সজাগ রয়েছে। সে কারণে পাকিস্তান চাইছে তার অন্য বন্ধু-দেশগুলো যাতে বাংলাদেশের নতুন সরকারের নীতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। যার ফল হিসেবে ঢাকায় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে। আর এর চূড়ান্ত পরিণাম দাঁড়াবে এই যে উপমহাদেশের ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে তার নিজের অনুকূলে একটি সীমিত পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উপরন্তু পাকিস্তান সরকার সন্দেহাতীতভাবে এই সুবিধার দিকেও খেয়াল রেখেছে যে, বাংলাদেশে যদি একটি কম ভারত-ঘেঁষা সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে দিল্লির শাসকদের জন্য একটি অনিশ্চিত অবস্থার সূচনা ঘটানো সম্ভব হবে।

বাইরোড লিখেছেন :

পাকিস্তানিরা মনে করছে যে তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন সরকারের উদ্যোগকে তারা স্বাগত জানাবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিনিধি ও পরিচিত বাঙালিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তারা বেশ আশ্বস্ত। প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি ও সমর্থন জানিয়ে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, খন্দকার মোশতাক আহমদের কাছ থেকে তার জবাব পেয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট। তাঁরা আশাবাদী যে রাষ্ট্রদূত নিয়োগে বাংলাদেশ খুব শিগগির উদ্যোগ নেবে এবং তারাও শর্তহীনভাবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত পাঠাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। পাকিস্তান আরও আশাবাদী যে পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতির কারণে তারা সিমলা চুক্তির বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত হতে দেবে না। পাকিস্তান চুক্তি বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ থাকবে। তবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের এই সম্পর্কের উন্নয়নের ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ওপর তার কতটা কী অনুকূল কিংবা প্রতিকূল প্রভাব পড়বে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রদূত বাইরোড তাঁর ওই তারবার্তায় এ পর্যায়ে পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত তুলে ধরেন :

১. বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানে যে উত্তেজনা ও উন্মাদনার

সৃষ্টি হয়েছিল তা কিছুটা ফিকে হতে শুরু করেছে। পাকিস্তান সরকার ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণের মনোভাব গ্রহণ করেছে। উপমহাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা আনুকূল্য যে তাদের জুটবে, সে ব্যাপারে তারা সতর্কভাবে আশাবাদী। মুজিবকে উৎখাতের দুই সপ্তাহের কম সময় পর সেখানকার পরিস্থিতি এখন টলোমলো। সেখানে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে তা যে শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায় তা নিয়ে অন্য অনেকের মতো পাকিস্তান সরকারও অনিশ্চয়তায় রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুত্থান পাকিস্তানের জন্য কী ধরনের সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে আসে, সে ব্যাপারে একাধিক অনুমিত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।

২. ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের আগে বাংলাদেশ বিষয়টিকে পাকিস্তান সরকার একেবারেই পেছনে রেখে দিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রতি তাদের কঠিন নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি পাকিস্তানের জনগণ দ্বারাও সমর্থিত ছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো প্রকারের সম্পর্ক বজায় রাখতে পাকিস্তানের কোনো মহল থেকেই তেমন চাপ ছিল না।

৩. পাকিস্তানিরা ধরেই নিয়েছিল যে মুজিব সরকার যেহেতু ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখছে, তাই তার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা বৃথা। যদিও এ কথা সত্যি যে, নয়াদিল্লির কাছ থেকে কিছুটা স্বাধীনভাবে চলার একটা মনোভাব মুজিবের মধ্যে ছিল এবং তার কিছু প্রমাণও তারা পেয়েছে। কিন্তু ইসলামাবাদের মৌলিক মূল্যায়ন ছিল এরকম যে, মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ অবশ্যই ভারতের তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পাকিস্তান সরকারের আরও বিশ্বাস ছিল যে, মুজিবের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন ছিল বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্বপরায়ণ ভূমিকারই একটি বর্ধিত অংশমাত্র। আর তা ছিল ইসলামাবাদ ও ঢাকার মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা। এই নিরুৎসাহমূলক পটভূমিতে পাকিস্তানিরা বেশ জোরের সঙ্গেই ধরে নিয়েছিল যে, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে পাকিস্তান কোনো ফায়দা পাবে না। তাই ঢাকায় তাদের হাইকমিশনার পাঠালেও তার অর্জন থাকবে খুবই সীমিত। আর এ ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যেসব শর্ত আরোপ করেছিল, তা পূরণ করার যে মূল্য তার তুলনায় তাদের প্রকৃত অর্জন ঢের কম থাকতেই বাধ্য।

৪. ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান উল্লেখিত হিসাবনিকাশ নাটকীয়ভাবে বদলে দিয়েছে। শেখ মুজিব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টিতে পাকিস্তানের যে

আকাঙ্ক্ষাকে বিপথগামী করেছিলেন, তাকে সঠিক ধারায় আনতে পাকিস্তান এখন উদ্‌গ্রীব। জনগণের ভাবাবেগকে সরকার বাস্তবে রূপ দিতে চায়।

৫. পাকিস্তান সরকার এখন বাংলাদেশের কাছ থেকে নতুন সুবিধাদি আহরণে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী। পাকিস্তান এটাও ধরে নিয়েছে যে, ঢাকায় ক্ষমতায় যে-ই থাকুক না কেন তাকে অবশ্যই ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। আর ভারত সরকারও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে যাবে। পাকিস্তানের আরও জানা আছে যে, বাংলাদেশে ভারতীয় প্রভাব তার চেয়ে বেশি থাকবেই। কারণ, পাকিস্তানের নিজের অর্থনৈতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানের ভূমিকার স্মৃতি (যদিও সেটা এখন ততটা তাৎপর্য বহন করে না) ঢাকায় তার ভূমিকাকে সীমিত রাখবেই। পাকিস্তানের অবশ্য এমন শঙ্কাও রয়েছে যে, ইসলামাবাদ এখন যদি খুব বেশি আগ বাড়ানো নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তা সেখানে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ডেকে আনতে কিংবা তাকে উসকে দিতে সাহায্য করতে পারে। যদিও বাংলাদেশে ভারতীয় হস্তক্ষেপের আশঙ্কা এখন আর পাকিস্তান সরকারের জন্য ততটা ভয়ংকর মনে হচ্ছে না, যেমনটা গত সপ্তাহে অনুভূত হয়েছিল। পাকিস্তানিরা অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করছে যে, ভারতের এ ধরনের অভিযান, তা বাংলাদেশের ভারতপন্থীদের চাতুর্যপূর্ণ আহ্বানে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ হিসেবে কিংবা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা কিংবা হিন্দু উদ্বাস্তুদের স্রোত সৃষ্টির মাধ্যমে ঘটতে পারে। এসবই সামনের মাসগুলোতে ভয়ানক সম্ভাবনা হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে। পাকিস্তান অবশ্যই এ ধরনের হস্তক্ষেপের তাৎপর্য বিবেচনায় সংবেদনশীল হতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশে যে, কারও এ ধরনের আধিপত্য বিস্তারের প্রভাব পাকিস্তানের ওপরও এসে পড়বে।

৬. পাকিস্তান সরকার বিশ্বাস করে যে পাকিস্তান যদি এখন বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে ভারতের কাছ থেকে সে অধিকতর স্বাধীন হতে পারবে। অন্তত অতীতে সে যেমনটা মানিয়ে চলতে পারত তার চেয়ে তা বেশি হবে। পাকিস্তান সতর্ক রয়েছে যে একটি ভারতবিরোধী সরকার ঢাকায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তাই তারা আশা করছে যে মুজিবের উত্তরসূরিরা এখন সেখানে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ একটা পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বাধ্য করবেন।

তারা ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেও পাকিস্তান, মুসলিম বিশ্ব, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো রাখবে। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই মুসলিম দেশগুলোর রাজধানীতে তার কূটনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করেছে। এবং সম্ভবত চীনের সঙ্গেও তারা তা করেছে। এসবের একটাই লক্ষ্য, বাংলাদেশের নতুন সরকারের জন্য সমর্থন আদায় করা এবং বোঝাই যাচ্ছে ঢাকার কাছ থেকে ভিন্ন সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত হয়তো তারা তাদের এই তৎপরতা অব্যাহত রাখবে। পাকিস্তানের মূল্যায়নে এটাও রয়েছে যে ঢাকার সঙ্গে তারা কোনো বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। এবং সে ধরনের কোনো প্রচেষ্টা চালানো হবে যেমন অবাস্তব তেমনি ভয়ংকর। তাই এর পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রতি যারা বন্ধুভাবাপন্ন, তাদের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তান অংশ নিতে চায়। চায় বাংলাদেশ যাতে তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে একটা পুনর্বিন্যাস আনে, যাতে ঢাকায় ভারত ও সোভিয়েত প্রভাব হ্রাস পায়। আর এটা ঘটলে উপমহাদেশের ক্ষমতার ভারসাম্যের রাজনীতিতে পাকিস্তান তার নিজের অনুকূলে একটু হলেও ফায়দা পাবে।

৭. এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ পাকিস্তান সরকার সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে এবং আমাদের কাছে মনে হচ্ছে তাদের প্রত্যাশা বাড়ছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকার বিবৃতিগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখছে এবং তারা ভুট্টোর বার্তার জবাবে মোশতাক আহমদের উষ্ণ উত্তর পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট। বাংলাদেশের নতুন সরকার এর আগে উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এ অঞ্চলের সব দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছে, তাতে পাকিস্তান বাংলাদেশ সরকারের ওপর সন্তুষ্ট। এই যে শেষ কথাটি 'এ অঞ্চলের সকল দেশের সঙ্গে', এর দ্বারা মোশতাক আহমদ নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানকেও বুঝিয়েছেন। এখন বাংলাদেশের নতুন সরকার যদি তাদের কথা ঠিক রাখে, তাহলে তা ইসলামাবাদের প্রতি একটি ইতিবাচক সংকেত হিসেবে গণ্য হবে।

৮. আমরা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি যে, লিমায় আসন্ন জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে ইচ্ছুক পাকিস্তানি পর্যবেক্ষকেরা ঢাকার পরিস্থিতি বুঝতে বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, এমন প্রতিনিধিদের লিমায় দেখা যাবে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক

সম্পর্ক স্থাপনে বাংলাদেশের যেকোনো উদ্যোগকে তারা সহায়তা দেবে। পাকিস্তান সরকার নিশ্চিতভাবেই বিনা শর্তে ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ে একমত হবেন। এ ছাড়া বিহারি প্রত্যাবাসন এবং সম্পদ ও দায়দেনা ইস্যুটি শিকেয় তোলা হবে।

৯. পাকিস্তান সরকার আশা করে যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উন্নত সম্পর্ক পাক-ভারত সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে না। সিমলা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে তারা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সংকল্পবদ্ধ। অন্যথায় এটা তাদের উপলব্ধিতে রয়েছে যে, যদি এখন তারা সিমলা চুক্তির প্রতি বিমুখ হয়, তাহলে ভারতের মনে নতুন করে সন্দেহ-সংশয় জাগবে যে, ঢাকার ঘটনাবলি পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। সালাল বাঁধসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান চতুর্থ দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে যোগ দিতে একমত হয়েছে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকার ঘরোয়া বৈঠকে স্বীকার করছে যে, ভারত-বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান-বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল সম্পর্কের সূচনা উপমহাদেশের সম্পর্ক সমীকরণে নতুন করে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে, যা কিনা পাকিস্তানি-ভারত সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বাংলাদেশে যদি একটি ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে তাহলে পাকিস্তান মনে করে যে, দিল্লি-ইসলামাবাদ সম্পর্কের গতিময়তা একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে।

বাইরোড লিখেছেন :

এরকম মত আমরাও সমর্থন করি। এ ছাড়া আরও একটি বিষয় নিশ্চিত যে, ভারত বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করলে পাক-ভারত আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জনমত একেবারেই সহায়ক হতো না। আমরা জানি না, পাক-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্থাপিত হলে তা নয়াদিল্লিকে ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবে কি না। এসব বিষয়ে আমরা কিংবা পাকিস্তান কারও পক্ষেই এখন অনুমান করা কঠিন।

এখানে উল্লেখ্য, বাইরোডের উল্লিখিত কথাবার্তা এবং মূল্যায়ন যে পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনীতিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল, তার ইঙ্গিত বাইরোডের ওই তারবার্তায় স্পষ্ট। 'এ অঞ্চলের সকল দেশ' মোশতাকের ব্যবহৃত এই শব্দগুলোকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'কোডওয়ার্ড' হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাইরোডের বর্ণনায় পাকিস্তানের জন্য 'বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার পরবর্তী "বেঞ্চমার্ক" হচ্ছে বাংলাদেশের অধিকতর ইসলামি চরিত্র অর্জন।'

এই 'বেঞ্চমার্ক' কথাটি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যবহার করেছে। এবং বাইরোড তাঁর তারবার্তায় তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বাইরোড লিখেছেন, পাকিস্তান সরকার যেসব বিষয়ের প্রতি নজর রাখছে তার মধ্যে রয়েছে অনভিপ্রেত বিবেচনায় বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি জলাঞ্জলি দিয়ে অধিকতর ইসলামি চরিত্র অর্জন করা, পেরুর রাজধানী লিমায় অনুষ্ঠেয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের সম্ভাব্য প্রস্তাবে বাংলাদেশ কী অবস্থান নেয় তা দেখা এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এশীয় আসনের প্রার্থিতায় পাকিস্তান ও ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ সরকারের ভোট লাভ আশা করে না। কিন্তু উপমহাদেশের দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়া কঠিন—বাংলাদেশের নতুন সরকার যদি এমন একটা মনোভাবও গ্রহণ করে তাহলেই ইসলামাবাদ খুশি হতে পারে।

মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয়

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর ঢাকার মার্কিন দূতাবাসকে ঘিরে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া প্রশ্নে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ 'আশ্রয় প্রার্থনার অনুরোধ' শিরোনামে বোস্টার যে তারবার্তাটি পাঠান তা হুবহু এরকম :

১. আমরা মুজিবের ভাগনে প্রয়াত শেখ ফজলুল হক মনির পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আজ সকালের অভ্যুত্থানের পর তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধ পেয়েছি। তাঁরা এখন আমাদের পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের বাসায় রয়েছেন। তাঁর বাসাটি শেখ মনির বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া বাড়িটির মাত্র তিনটি বাড়ি পরই। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শেখ মুজিবের মা, বাবা, এক বোন, এক ভাইয়ের স্ত্রী, দুই সন্তান ও কাজের লোক।

২. যেহেতু তাঁরা গুরুতর সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন, আমরা মনে করি, তাঁরা আমাদের কাছ থেকে এফএএ ২২৮.৩ [সম্ভবত রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানসংক্রান্ত সরকারি আদেশ] অনুসারে অস্থায়ী আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য। আজ রাতটা কীভাবে কাটবে এটা ভেবে তারা খুবই চিন্তিত, খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁরা বলেছেন, কারফিউ প্রত্যাহার হলে তাঁরা চলে যাবেন। আশা করা যায়, কাল কারফিউ প্রত্যাহার হতে পারে, তখন তাঁরা তাঁদের পুরান ঢাকার বাড়িতে চলে যাবেন। তাঁরা যখন যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করবেন, আমরা তখন তাঁদের যেতে দেব। এবং পুনরায় বার্তা পাঠাব যদি তাঁরা কোনো কারণে আরও বেশি সময় ধরে থাকতে চান।

১৬ আগস্ট ১৯৭৫ বোস্টার পৃথক এক তারবার্তার উল্লেখ করেন যে, শেখ মনির পরিবারের সদস্যরা আজ সকালে দূতাবাস-কর্মকর্তার বাসভবন ত্যাগ

করেছেন। তাঁদের অনুরোধে ঢাকার অন্যত্র তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

১৮ আগস্ট ১৯৭৫ বোস্টার যে তারবার্তাটি (১৯৭৫ঢাকা০৩৯৭৮) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠান তার শিরোনাম 'আশ্রয়ের অনুরোধ করেছেন তোফায়েল আহমেদ'। যদিও এক প্রশ্নের জবাবে জনাব আহমেদ এই লেখকের কাছে এমন তথ্যের সত্যতা নাকচ করেছেন। বোস্টারের এই তারবার্তা হুবহু নিচে তুলে ধরা হলো :

১. প্রয়াত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের বিশেষ সহকারী তোফায়েল আহমেদ জন এডামসের মাধ্যমে কোনো একটি দূতাবাস ভবনে আশ্রয় লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। জন এডামস হলেন বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দিতে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন সরকারের সেন্সাস ব্যুরো স্পেশালিস্ট। মি. এডামস তোফায়েল আহমেদের নিকটতম প্রতিবেশী।

২. এডামসের মতে, তোফায়েল উর্দিধারী ব্যক্তিদের দ্বারা ১৫ আগস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটায় অবরুদ্ধ হন। তবে এডামস স্পষ্ট করতে পারেননি যে তারা সেনাবাহিনীর লোক কি না। কিন্তু আমরা অনুমান করি, তারা অবশ্যই সেনাবাহিনীর লোক। ১৬ আগস্ট আড়াইটায় তোফায়েল তাঁর বাড়িতেই ফিরে আসেন। সেখানে তাঁকে প্রহরায় রাখা হয়। ১৬ আগস্ট রাত ১০টায় তোফায়েল এডামসকে তাঁর বাড়িতে যেতে অনুরোধ জানান। তিনি তাঁকে বলেন যে তিনি নিজেকে 'সংকটাপন্ন ও অনিরাপদ' মনে করছেন। তাই তিনি কোনো একটি দূতাবাস ভবনে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এডামস বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে তোফায়েলকে আশ্বস্ত করেন এবং এডামস তোফায়েলের অনুরোধ আমাদের জানাতে ১৮ আগস্ট দূতাবাসে আসেন।

৩. আমরা যেহেতু তোফায়েলের সঙ্গে কথা বলিনি, তাই তাঁর ভয়ের কারণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। তবে যেহেতু তাঁকে একবার আটক করে নতুন সরকার (যাঁদের অবশ্যই এ কথা জানা আছে যে শেখ মনির নেতৃত্বাধীন তৎপরতার কারণে তোফায়েল ক্রমশ মুজিবের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন) আবার ছেড়ে দিয়েছে, তাই আমরা মনে করি, অনিশ্চয়তাপূর্ণ এই সময়ে তোফায়েলের নিজের নিরাপত্তার স্বার্থেই তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হচ্ছে। আমাদের উপসংহার হচ্ছে এই যে তোফায়েল তাঁর নিরাপত্তায় নিয়োজিত রক্ষীদের সাহস ও নিষ্ঠার ওপর খুব বেশি ভরসা রাখতে পারছেন না। তিনি সন্দেহ করছেন যে এ সময় কেউ যদি তার সঙ্গে পুরোনো শত্রুতার হিসাব

ঢুকাতে চায়, তাহলে তার রক্ষীরা তাঁকে আগলে রাখার পরিবর্তে দ্রুত পালিয়ে যাবে।

৪. শেখ মনির পরিবার-পরিজনদের আশ্রয় প্রার্থনার চেয়ে তোফায়েলের আশ্রয় চাওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন। তোফায়েলের বেলায় :

ক. তাঁর পরিবারের এমনটা ভাবার সংগত কারণ রয়েছে যে নতুন সরকারের দিক থেকে তাঁরা এই মুহূর্তে জীবনের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বোধ করছেন।

খ. তারা যখন আমাদের কাছে অনুরোধ করে, তার আগেই তাঁরা দূতাবাস ভবনে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেছেন। এবং

গ. তাঁরা দূতাবাস ভবনে আশ্রয় লাভের সময় আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে পরবর্তী সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের আগেই তাঁরা দূতাবাস ভবন ত্যাগ করবেন (তাঁরা সেটা রক্ষা করেছিলেন)।

তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে—

ক. তোফায়েলের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর সময় ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে বলে মনে হয়। এবং

খ. প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় তোফায়েল এখনো তাঁর বাসভবনে রয়েছেন। এই প্রহরীদের দায়িত্ব কেবল তাঁকে অন্তরীণ রাখাই নয়, বরং তাঁকে সুরক্ষা প্রদান করাও বলে মনে হচ্ছে।

এই অবস্থায় আমরা তোফায়েলকে এটা জানিয়ে দিচ্ছি যে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাঁকে কীভাবে সহায়তা করতে পারি তা বুঝতে পারছি না।'

মেজর মহিউদ্দিন

শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের মধ্যে মেজর মহিউদ্দিন আহমেদ প্রথম মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন বলে জানা যায়। ২০ আগস্ট বোস্টার তাঁর জন্য অন্তত তিনটি তারবার্তা পাঠান ওয়াশিংটনে। ১৯৭৫ঢাকা০৪০৫৮ নম্বর তারবার্তায় বোস্টার জানান :

> ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতৃস্থানীয় অংশগ্রহণকারী মেজর মহিউদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী দূতাবাসের কনস্যুলার সেকশনে স্থানীয় সময় প্রায় পৌনে নয়টায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, শুক্রবারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত তাঁর ইউনিটকে নিরস্ত্র করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সব মেজরকে ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আমরা মহিউদ্দিনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার সময় পাইনি। যেহেতু তিনি আমাদের চত্বরে আছেন এবং তাঁর

জীবন হুমকিগ্রস্ত, তাই নির্দেশনা পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা তাঁদের থাকার অনুমতি দিচ্ছি।

১৯৭৫স্টেট১৯৭৫০০ নম্বর তারবার্তায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ঢাকার মার্কিন দূতাবাসকে জানান :

প্রকৃত হুমকি কেটে গেলে তাঁদের থাকার অনুমতি রদ করতে হবে। অস্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রদূতের একক এখতিয়ার আছে। তবে সে ক্ষেত্রেও আশ্রয় লাভের সুযোগ যে অত্যন্ত সীমিত তা তাঁদের জানাতে হবে। বলতে হবে, বাংলাদেশ থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিতে দূতাবাসের কিছুই করণীয় নেই। তাঁকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিতে হবে। তবে জোরপূর্বক কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া আমাদের রেওয়াজ নয়। শেখ মনি ও তোফায়েলের ক্ষেত্রে দূতাবাস সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এ-বিষয়ক অগ্রগতি পররাষ্ট্র দপ্তরকে অবহিত রাখবেন।

বোস্টার এ দিনই পররাষ্ট্র দপ্তরের ১৯৭৫০০ পত্রের বরাতে উল্লেখ করেন :

রাজনৈতিক আশ্রয় ও উদ্বাস্তু মর্যাদার বিষয়ে মার্কিন অবস্থান মেজর মহিউদ্দিনকে অবহিত করা হয়েছে। আমাদের নীতির বিষয়ে তিনি কিছু প্রশ্ন করেন। এরপর তিনি হয়তো কোনো এক ক্যাপ্টেনকে টেলিফোন করেন। আমরা জানি না, তিনি তাঁর কাছ থেকে কী ধরনের নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন। কিন্তু ফোনের পরই তিনি জানান যে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী দূতাবাস ত্যাগ করছেন। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন।

১৯৭৫ঢাকা০৪০৭৬ নম্বর তারবার্তায় বোস্টার লিখেছেন :

মেজর মহিউদ্দিন আহমেদ ও দূতাবাস-কর্মকর্তার আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত তথ্য নিচে দেওয়া হলো : ক) মেজর মহিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের নাগরিক; খ) জন্ম : ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৪৭; গ্রাম : মৌদুবি, পুলিশ স্টেশন : গলাচিপা, জেলা : পটুয়াখালী, সামরিক কর্মকর্তা যার ইউনিট ছিল দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট; গ) তাঁর সঙ্গে কোনো ডকুমেন্ট নেই, কিন্তু তাঁর পরিচিতি একজন দূতাবাস-কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন; ঘ) মেজর মহিউদ্দিনকে খোঁজা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত কিছু জানা নেই; ঙ) মহিউদ্দিন বিশ্বাস করেন যে, সিনিয়র কর্মকর্তাদের দ্বারা তিনি এবং অন্য জুনিয়র কর্মকর্তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন (হত্যা) হতে চলেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, চিফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। মহিউদ্দিন বলেন, ১৯ আগস্টের দুপুরের দিকে তাঁকে বলা হয়েছিল তাঁকে ও তাঁর ইউনিটকে বঙ্গভবন (মুজিব এখানে প্রেসিডেন্টের

দপ্তরে বসতেন) থেকে বহিষ্কার করা হবে। মহিউদ্দিন উল্লেখ করেন যে, অভ্যুত্থানের নেতাদের প্রায় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এবং এতে দুইটা পর্যন্ত বেজে যায়। বঙ্গভবনে (প্রেসিডেন্ট মোশতাক কর্তৃক ব্যবহৃত) অভ্যুত্থানের চার নেতাকে তাঁদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এঁরা হলেন: মেজর রশিদ, ফারুক, মহিউদ্দিন (ল্যান্সার) ও ডালিম। তিনি ফারুকের সঙ্গে দেখা করেন এবং তারপর গণভবনে ফিরে আসেন। সেখানে রাত সাড়ে আটটায় তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর লোকজনসহ সেনানিবাসে ফিরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি তাঁর কোয়ার্টারে ফিরে আসেন। সোয়া নয়টায় তার রেজিমেন্টের কর্নেল আনোয়ার হোসেন তাঁকে নির্দেশ দেন যে তিনি যেন সেনানিবাস ত্যাগ না করেন। কর্নেল হোসেন বলেন, তিনি চিফ অব আর্মি স্টাফের নির্দেশে তাঁকে এ কথা জানাচ্ছেন। মহিউদ্দিন তাঁর মুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন। টেলিফোন করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, মহিউদ্দিনের জীবন হুমকিকবলিত এবং সে কারণেই তাঁরা তাদের কোয়ার্টার ত্যাগ করে এসেছেন। মেজরের পরনে ছিল কুর্তা ও পায়জামা। সেনানিবাসের বাইরে এসে তিনি একটি বাসে চড়েন। স্ত্রীর বাবার বাসায় রাত কাটান। তাঁরা ঢাকাকে পাশ কাটিয়ে ২০ আগস্ট সকাল সাড়ে আটটায় মার্কিন দূতাবাসে প্রবেশ করেন। চ) মেজর মহিউদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী বর্তমানে দূতাবাসে রয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর বাবা-মা ও তাঁদের পাঁচ মাস বয়সী বাচ্চাকে রেখে দূতাবাস ত্যাগ করেছেন। ছ) মেজর মহিউদ্দিন উল্লেখ করেন যে, সামরিক বাহিনী তাঁকে ধরতে পারলে তাঁর মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। তিনি দাবি করেন যে, একটি ওয়ান্টেড লিস্টে তাঁর এবং আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত অন্তত আটজনের নাম রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার অভিযোগ আনা হবে। এবং তিনি মনে করেন না যে, কোনো কোর্ট মার্শাল গঠন করা হবে। বরং তালিকাভুক্তদের মধ্যে যখনই যে ধরা পড়বে তাকে সরাসরি হত্যা করা হবে। জ) মেজর মহিউদ্দিন বলেছেন যে তিনি একসময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত। কিন্তু তার পর থেকে তাঁর কোনো রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই। মেজর মহিউদ্দিন অভ্যুত্থানকে 'বিপ্লব' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং অভ্যুত্থানকারীদের 'বিপ্লবী অফিসার' হিসেবে বর্ণনা করেন। কিন্তু অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বলতে আসলে কিছুই ছিল না বলে মনে হয়। ঝ) মেজর মহিউদ্দিনের স্ত্রী সম্পর্কেও কয়েকটি তথ্য আমরা নিচে দিচ্ছি। তিনি মিসেস সাহিদা পারভিন। তিনি মনে করেন যে, ১৯৫৫

সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় তাঁর জন্ম। গৃহিণী। তাঁর কাছেও কোনো ডকুমেন্ট নেই। আমরা বর্তমানে মেজর মহিউদ্দিনের দেওয়া বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সচেষ্ট আছি। আমরা এটা বুঝতে চেষ্টা করছি যে তিনি সত্যিই বিপদাপন্ন কি না? এ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য যথাসম্ভব দ্রুত জানাব।

৪ নভেম্বর ১৯৭৫

বোস্টারের পাঠানো একটি বার্তা এদিন হেনরি কিসিঞ্জার পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে নতুন দিল্লি, ইসলামাবাদ, কলম্বো, পাকিস্তান, কাঠমান্ডু, রেঙ্গুন ও পিকিং প্রেরণ করেন। বার্তাটি ঢাকা থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছায় ৩ নভেম্বর। তারবার্তা নং ঢাকা৫৩১৩। বোস্টার লিখেছেন, 'এখন এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ এবং ঢাকা সেনানিবাসের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা আজকের সংকটের অন্তত আংশিক সমাধান দিতে পারে।

'১৫ আগস্টের শীর্ষ অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশ থেকে ব্যাংককে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যে মেজর ফারুক রহমান ও মেজর আব্দুর রশিদ এ দুজনেই আলোচনার মুখ্য বিষয়। আমরা বুঝতে পারি যে, মোশতাক হয়তো নিজ পদে বহাল থাকতে পারেন। কিন্তু এটা যদি হয়ও তাহলেও আমরা সন্দেহ করি যে, তাঁর কার্যকরী ক্ষমতা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাবে। এখন যে রকমের আভাস-ইঙ্গিত পাচ্ছি তা যদি সত্যে পরিণত হয়, তাহলে এটা তুলনামূলক স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উত্তরণ ঘটাতে পারে।

'ঢাকায় আজ কোনো আমেরিকান নাগরিক বিপদে পড়েছেন বলে কোনো খবর আমরা পাইনি। আজকের সংকট অনেক প্রশ্ন তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ : মোশাররফের [খালেদ মোশাররফ] পদক্ষেপের পেছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আগামীকাল কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে এ বিষয়ে আমরা আরও বলতে পারব বলে আশা রাখি।'

৫ নভেম্বর ১৯৭৫

ব্যাংককে তখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন চার্লস শেল্ডন হোয়াইটহাউস। ১৯৭৫ সালের ৮ মে থেকে ১৯৭৮ সালের ১৯ জুন পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে

ছিলেন। ২০০১ সালের ২৫ জুন তিনি মারা যান। 'থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তা' শীর্ষক তারবার্তায় তিনি লিখেছেন :

১. পররাষ্ট্র দপ্তরের রেফারেন্স তারবার্তার (নম্বর ২৬১৭৮৭) ভিত্তিতে জানাচ্ছি যে ৪ নভেম্বর বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের যাঁরা ব্যাংককে পৌঁছেছেন তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে সব ধরনের খুঁটিনাটি জানতে ব্যাংককের মার্কিন দূতাবাস সজাগ থাকবে। আমরা তাঁদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি এবং তা জানার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুত্বপূর্ণ হোক বা না হোক পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়ে দিচ্ছি।

২. ব্যাংককের পাকিস্তান দূতাবাস বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের বিষয়ে দারুণ আগ্রহ দেখাচ্ছে। ৪ নভেম্বরে তাঁরা পৌঁছানোর পর তাঁদের বিমানবন্দর ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাঁরা এখন ভিক্টোরিয়া হোটেলে অবস্থান করছেন। পাকিস্তান দূতাবাস জানিয়েছে, বাংলাদেশ দূতাবাসই থাই ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের মাধ্যমে দলটির ছাড় করিয়েছে।

৩. ৫ নভেম্বর রয়টার্সের ব্যাংককস্থ সংবাদদাতা জন রজার্স পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি খালিদ নিজামির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি কর্নেল ফারুকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। নিজামি তাঁকে বলেছেন যে, এই দলটি বাংলাদেশ থেকে ব্যাংককে এসেছে বর্তমান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী সেনা কর্মকর্তাদের সম্মতিক্রমেই। খালিদ নিজামি আমাদের জানিয়েছেন, ওই গ্রুপের অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন লে. কর্নেল খন্দকার আ. রশিদ ও লে. কর্নেল শরিফুল হক, যিনি মেজর ডালিম হিসেবে অধিক পরিচিত। থাই প্রেসে ইতিপূর্বে মেজর ডালিমকে মুজিববিরোধী ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. খালিদ নিজামি বলেছেন যে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাকিস্তানের কাছেও ঢাকার পরিস্থিতি এতটাই অনিশ্চিত যে তাঁদের পক্ষেও তাঁদের আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বর্তমানে যারাই ক্ষমতায় থাকুক, তাদের দিক থেকে তা অননুমোদনের ঝুঁকি রয়েছে।

৫. এই দূতাবাসের কনস্যুলেট সেকশনের প্রধান থাই ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে, থাইল্যান্ডে বাংলাদেশ গ্রুপটির অবস্থানকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হয়নি। এখন পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে তাঁদের অবস্থানকেও মঞ্জুর করা হয়নি।

৬ নভেম্বর ১৯৭৫

ব্যাংকক থেকে রাষ্ট্রদূত হোয়াইটহাউস লিখেছেন, ৫ নভেম্বর *ব্যাংকক ওয়ার্ল্ড*-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক রহমান, যিনি ৩-৪ নভেম্বর ব্যাংককে পালিয়ে এসেছেন, তিনি রয়টার্সকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের ভূমিকায় বলা হয়েছে :

> বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তিনজন কর্মকর্তা, যাঁরা গত আগস্টে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন, তাঁরা এ সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের নির্দেশে দেশত্যাগ করেন। বিক্ষুব্ধ কর্নেলদের দ্বারা পরিচালিত এক পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট ওই নির্দেশ দেন বলে ওই তিনজনের একজন আজ এখানে বলেছেন।
>
> লেফটেন্টেন্ট কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান বলেন, তিনি এবং আগস্ট অভ্যুত্থানের অপর দুই নেতা, যাঁরা মুজিবকে হত্যা করেছেন, তাঁরা দেশ ত্যাগ করেছেন। কারণ, প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ কোনো রক্তপাত চাননি।
>
> গত সোমবার রাতের শেষ প্রহরে তাঁরা ঢাকা ছাড়েন। এর আগের ২১ ঘণ্টা ধরে মুজিব, যিনি একাত্তর সালে তাঁর জনগণের জন্য একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করেন, যিনি বাংলাদেশের পিতা হিসেবে পরিচিত, তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত চলছিল—কর্নেল ফারুক এ কথা বলেন। ১২ জন কর্মকর্তা ও দুজন ননকমিশন্ড কর্মকর্তার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী, সাতজন নারী, পাঁচ সন্তানসহ তাঁরা গতকাল প্রত্যুষে ব্যাংককে পৌছান। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকার এয়ারক্রাফটে চড়ে তাঁরা ব্যাংককে আসেন। পাল্টা অভ্যুত্থানকারী সামরিক কর্মকর্তারা তাঁদের দেশত্যাগের অনুমতি দেন।

এরপর রয়টার্সের নেওয়া পুরো সাক্ষাৎকারটিই কোনো মন্তব্য ছাড়া তুলে দেওয়া হয়।

চেনা জিয়া

১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর ব্যাংককের মার্কিন দূতাবাস ওয়াশিংটন পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছে, বাংলাদেশ কর্মকর্তা, যাঁরা গত ৪ নভেম্বর ব্যাংককে উড়ে এসেছেন, তাঁদের মুখপাত্র লে. কর্নেল ফারুক রহমান ব্যাংকক প্রেসকে বলেছেন, 'বাংলাদেশের জনগণ আমার প্রত্যাবর্তন দেখতে চায়।' ফারুক

বলেন, 'মেজর জিয়াউর রহমান ঢাকায় পুরো ক্ষমতা দখলের পর বাংলাদেশে আমার ফেরার সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে। আমি তাঁকে শৈশব থেকেই জানি। আমার বাবা যখন মেজর ছিলেন, তিনি ছিলেন তখন লেফটেন্যান্ট। বহু উপলক্ষে তিনি আমাদের বাসায় এসেছেন।' ফারুক বলেন, তাঁর জন্য বিকল্প একটি পথ খোলা আছে, তিনি থাই সরকারকে তাঁর ১৪ দিনের মেয়াদ বাড়াতে বলেছেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে ফারুক ও অন্য বাংলাদেশি কর্মকর্তার সঙ্গে দূতাবাস ন্যূনতম যোগাযোগ রাখছে। যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার জন্য বাংলাদেশি গ্রুপটির ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণের বেলায়ও দূতাবাস সরাসরি যোগাযোগ না রাখতে সতর্ক। পররাষ্ট্র দপ্তর যদি ফারুকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে চায়, তাহলে দয়া করে আমাদের সে মর্মে নির্দেশনা দিন। এই মুহূর্তে আমরা যদি ফারুকের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে যাই, তাহলে নিশ্চিত যে মার্কিন ভিসার জন্য তাঁর অনুরোধ পেতে হবে।

ফারুক রহমানের ৭ নভেম্বরের সাক্ষাৎকার বিবেচনায় নিয়ে এটা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে বাংলাদেশে শিগগিরই ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। অন্তত সেখানকার পরিস্থিতি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত। ঢাকায় আমাদের দূতাবাস নিশ্চয় অনেক ভালো বুঝতে সক্ষম যে ঢাকার যে পরিস্থিতি তাতে ফারুক ও তাঁর সহযোগীদের নিরাপদে ফেরা সম্ভব কি না।

চীনা ফৌজি মহড়া

ফারুক-রশিদ চীনা যোগসূত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে চীনা হস্তক্ষেপের আশায় ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া। ১৯৭৪ সালে কিসিঞ্জার দিল্লি সফরকালে ভারতীয় কর্মকর্তারা তাঁকে হালকা চালে বলেছিলেন, বাংলাদেশ যুদ্ধকালে আমরা একটি পাকিস্তানি সাংকেতিক বার্তা ধরতে পেরেছিলাম; যার সার কথা ছিল, উত্তর সীমান্ত (চীন) ও সমুদ্র থেকে সামরিক সহায়তা আসছে। কিসিঞ্জার ত্বরিত জবাব দিয়েছিলেন, 'আমরা কিন্তু ছিলাম না।'

সৈয়দ ফারুক রহমান ১৯৭৫ সালের ২০ নভেম্বর থাইল্যান্ডে মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের কাছে দাবি করেন, বাংলাদেশে ভারত যাতে হস্তক্ষেপ না করে, সে জন্য তাদের সতর্ক করে দিতে ভারতীয় সীমান্তে চীন ইতিমধ্যেই সামরিক শক্তির মহড়া দেখিয়েছে। অন্য দিকে এটা স্পষ্ট

জানা গেল, কৌশলগত কারণে ফারুক-রশিদকে পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়নি। তবে মার্কিন দলিল থেকে ইঙ্গিত মেলে যে, তাঁরা ভেঙে যাওয়া পাকিস্তান একত্র করতে কাজ করেছিলেন। এ কাজ তাঁরা কখন শুরু করেছিলেন, তার দিনক্ষণ জানা যায় না। উল্লেখ্য, চীন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

পঁচাত্তরের ২৪ নভেম্বর লিবিয়ার বেনগাজির উদ্দেশে ব্যাংকক ত্যাগের চার দিন আগে ফারুক রহমান থাইল্যান্ডে মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে চীন-সংক্রান্ত ওই তথ্য দিয়ে তাঁর 'রাজনৈতিক ভাবনা' প্রকাশ করেছিলেন। মার্কিন কর্মকর্তা তাঁদের মূল দূতাবাস থেকে এক মাইল দূরবর্তী কনস্যুলার সেকশনে ফারুকের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাঁদের এই বৈঠকের খবর যাতে জানাজানি না হয়, সে জন্য গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছিল।

ফারুক রহমান পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের সঙ্গে বৈঠকে দু-এক দিনের মধ্যে লিবিয়ায় গিয়ে সেখান থেকে ঢাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশে ফেরার আশা ব্যক্ত করেছিলেন। ফারুক বলেন, নভেম্বরের গোড়ায় মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ দায়িত্ব নিলে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু খালেদ নিহত হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। এখন তিনি বিদেশে থাকছেন, কারণ পরিবেশটা শান্ত হতে দেওয়া দরকার। ফারুক তাঁর পদমর্যাদা সম্পর্কে বলেন, ১৯৭৩ সালেই তাঁর লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্য ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীতে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ তা ঠেকিয়ে দেয়। তবে সম্প্রতি সরকারের একটি সাধারণ বোর্ড তাঁকে ও রশিদকে মেজর থেকে লে. কর্নেলে উন্নীত করেছে।

ফারুকের দর্শন

ফারুক এ সময় তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার বিবরণ দিয়ে বলেন, কয়েক বছর ধরেই তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী একটি ব্লক গঠনের চিন্তাভাবনা করছিলেন। এই ব্লক হবে ইন্দোনেশিয়া থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি বলেন, মুসলিম দেশগুলো কোনো অবস্থাতেই কমিউনিস্ট-ঘেঁষা হতে পারে না। যদিও বাস্তবে এর ভিন্নতা (মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত প্রভাব) পরিলক্ষিত হয়।

ফারুক এ সময় আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেন যে, সাবেক প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সামরিক এইড বা সহায়তাকারী হিসেবে তিনি

ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টারের সঙ্গে দুবার বৈঠক করেছেন এবং তাঁর কাছেও ওই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। বোস্টার-ফারুক বৈঠক বা তাঁদের সরাসরি কথোপকথনের সপক্ষে কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

ব্যাংককের মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার্লস এস হোয়াইটহাউসের সই করা এই ২৪৫৩৬ নম্বর তারবার্তায় মন্তব্য করা হয় যে, 'ফারুককে আমাদের কাছে খুবই বুদ্ধিদীপ্ত এবং 'মোটিভেটেড' একজন তরুণ অফিসার বলে মনে হয়েছে। তবে রাজনৈতিক বোধের দিক থেকে তিনি কিছুটা বিভ্রান্ত।'

উল্লেখ্য, ফারুক রহমান ১৮ নভেম্বর মার্কিন পলিটিক্যাল কাউন্সিলরকে থাই দূতাবাস থেকে ফোন করেছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তাঁর এই ফোনের পর হোয়াইটহাউস পৃথক একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তা থেকে দেখা যায়, ফারুক-রশিদ গোষ্ঠী ৬ নভেম্বর মার্কিন ভিসা চেয়েছিল। খন্দকার মোশতাকের পদত্যাগ, ৭ নভেম্বরের পরিবর্তন ও বিচারপতি আবু সা'দত মোহাম্মদ সায়েমের সরকার গঠিত হওয়ার পর ২৪ নভেম্বর লিবিয়ার উদ্দেশে ব্যাংকক ত্যাগের আগ পর্যন্ত ফারুক-রশিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের আশায় ছিলেন।

ওদের হাতে রক্ত

কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি স্যাক্সবি, ঢাকায় ডেভিস ইউজিন বোস্টার ও ব্যাংককে হোয়াইটহাউস ফারুক-রশিদ চক্রকে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য পৃথক পৃথক বার্তায় পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করেছিলেন। রিপাবলিকান রাজনীতিবিদ স্যাক্সবি নিক্সন-ফোর্ডের আমলে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরকে পাঠানো আবেগপূর্ণ এক বার্তায় খুনি চক্রকে মার্কিন ভিসা না দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ স্যাক্সবি লিখেছেন :

১. আমি আনন্দিত যে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা মেজররা যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়ে এখনো আবেদন করেননি। আমি বিশ্বাস করি যে যদি তাঁরা তা করেনও তাহলে দূতাবাস থেকে তা দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ হবে।

২. এই সব লোকের হাতে রক্ত লেগে আছে। ঢাকায় যাঁরা মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার

জানাশোনা ছিল। হয়তো তাঁরা তাঁদের কাজে সর্বদাই যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগই নিবেদিত মানুষ। অন্যের কাছ থেকে তাঁরা সহায়তা পেতে উন্মুখ ছিলেন, তাঁরা সদাচরণ পাওয়ার দাবিদার।

৩. যদি আমরা এই মেজরদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দিই, তাহলে ভারতে এর প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ। মুজিব হত্যার পরপরই ভারত সরকারের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন, অভ্যুত্থানের বিষয়ে আমাদের হয়তো কিছু করার ছিল। এরপর তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। এখন যদি এই মেজরদের স্বাগত জানানো হয়, তাহলে পরিস্থিতি রাতারাতি বদলে যেতে পারে। এই বোঝা আমরা কেন কাঁধে নেব, এর কারণ আমরা খুঁজে পাই না। এসব লোকের (মেজরদের) অর্জন বলতে বাংলাদেশের নেতৃত্বের একটি ভালো অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

অথচ ঢাকায় জিয়াউর রহমানের নিযুক্ত নতুন পররাষ্ট্রসচিব তবারক হোসেন ফারুক-রশিদ গোষ্ঠীকে যুক্তরাষ্ট্রে বা অন্য কোনো দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়দান নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক কূটনৈতিক প্রয়াস চালান।

থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাতসাই চন হাওয়ানাত ১১ নভেম্বর ১৯৭৫ থাইল্যান্ড এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'তাঁরা ১৪ দিন থাকবেন। বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁদের আশ্রয়দানের অনুরোধ করেছেন।' পরে অবশ্য তাঁরা ২০ দিন থাকেন। ফারুক-রশিদ ৬ নভেম্বর মার্কিন ভিসার জন্য আবেদন করলেও সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কিসিঞ্জার দীর্ঘ সময় নেন। ধারণা করা যায়, কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত ইচ্ছা যা-ই হোক, সিদ্ধান্ত দিতে ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকেরা হয়তো দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছিলেন।

ভাববে আমরাও জড়িত

১৯৭৫ সালের ১৯ নভেম্বর থাইল্যান্ড থেকে হোয়াইটহাউস লিখেছেন, ৭ নভেম্বরে দেওয়া মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের বক্তব্য সম্পর্কে তাঁরা (ফারুকেরা) হয়তো অবগত রয়েছেন। ব্যাংককে তা ৯ নভেম্বর ছাপা হয়। মুখপাত্র বলেছিলেন, তাঁরা প্রাথমিকভাবে স্বাগতিক দেশের (থাইল্যান্ড) তরফে আশ্রয়ের অনুরোধ বিবেচনার দিকে তাকিয়ে আছেন। হোয়াইটহাউস লেখেন, 'আমরা যদি এখন তাঁদের ব্যাংককে অবস্থানের মেয়াদ আরও বাড়াতে বলি, তাহলে তাতে ঝুঁকি আছে। থাই সরকার ভাবতে পারে, বাংলাদেশের ঘটনায়

যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট স্বার্থ রয়েছে এবং এই মেজরদের সঙ্গে আমরাও জড়িত।' এমনকি থাই সরকার এটাও বলে বসতে পারে, 'আমরা তাঁদের থাকার মেয়াদ বাড়াতে পারি এক শর্তে, যদি যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের দেশে নেওয়ার আশ্বাস দেয়। আমি মনে করি, এ থেকে আমাদের দূরে থাকাই ভালো। ঢাকা-ব্যাংকক বোঝাপড়া করে নিক।'

এখানে লক্ষণীয়, ফারুকের সঙ্গে পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের বৈঠকের বিবরণ দিয়ে হোয়াইটহাউস যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে একমত হন ঢাকার চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আরভিং চেসল। তবে তিনি ঢাকায় ফারুক-রশিদ যে পঁচাত্তরের ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে অস্ত্র চেয়েছিলেন তা উল্লেখ করেন।

চেসল লিখেছেন :

> তাঁদের (ফারুক-রশিদ) সম্পর্কে আমাদের মত হলো, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ। নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও আদিখ্যেতাপূর্ণ। তাঁরা আশা করেছিলেন যে তাঁদের কথা শুনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রয়োজন মেটাতে উদ্যোগী হবে। প্রায় একই ধরনের কথা তাঁরা হয়তো ত্রিপোলিতে গিয়েও ফের বলতে পারেন।

চেসল এরপর বলেন :

> ঢাকায় এই মেজরদের নিয়ে নানামুখী বিতর্ক রয়েছে। ৭ নভেম্বরের বিদ্রোহী সেনাদের অন্যতম দাবি ছিল যে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। অনেকে তাঁদের প্রতি ঈর্ষান্বিত, কারণ ১৫ আগস্ট থেকে ৩ নভেম্বর বাংলাদেশ শাসনে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। অনেকের সন্দেহ যে, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ঘটানো ছাড়াও তাঁরা কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। তবে এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন, তাঁরা দুর্নীতি নির্মূলে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বাংলাদেশকে সোভিয়েতের তাঁবেদার হওয়া থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের বাহবা দিচ্ছেন। তবে গভীরভাবে বিভক্ত বাংলাদেশে এখন বা ভবিষ্যতে তাঁদের প্রত্যাবর্তনের ফলে পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীলই হবে।

অবশেষে কিসিঞ্জারের 'না'

২১ নভেম্বর কিসিঞ্জার চূড়ান্তভাবে হতাশ করেন ফারুক-রশিদ গোষ্ঠীকে। কারণ, এ দিনই তিনি ২৭৫৮৭৪ নম্বর বার্তার মাধ্যমে ব্যাংককে হোয়াইটহাউসকে বলেন, 'আপনি মেজর সৈয়দ ফারুক রহমানকে জানিয়ে

দেন যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের কাউকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে না। তবে ভিসার জন্য যদি আবেদন করেন, তাহলে তা বিধি অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।'

এর আগে ১৪ নভেম্বর কিসিঞ্জার দুই বাক্যের একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, 'আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন। যখনই সুরাহা হবে তখনই আমরা পরামর্শ দেব।' ৯ নভেম্বরে কিসিঞ্জারের আরেকটি বার্তা প্রমাণ দেয় যে তিনি ফারুক-রশিদ গোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বলেন, বিবদমান সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সম্মতিতেই ফারুক ও অন্যদের দেশত্যাগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

৬ নভেম্বর ব্যাংককে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ফারুক বলেছিলেন, তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তানের কাছে আবেদন করবেন। তবে পরে বিমুখ হয়ে তাঁরা ব্রিটেন, লাতিন আমেরিকা ও জার্মানিতে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করেন।

ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্মলম্যান বোস্টারকে ১৭ নভেম্বর জানান, মেজররা হংকংয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁদের অনুরোধ নাকচ করেছে। ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৩ নভেম্বর এ জন্য তাঁদের হাইকমিশনের উপপ্রধানকে ডেকেছিল। তারা হংকংয়ে দুই সপ্তাহের আশ্রয় দিতে অনুরোধ করেছিল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাম না উল্লেখ করে বলেছে, 'মেজরদের আশ্রয় দিতে একটি দেশ থেকে আশ্বাস পেয়েছি। সেটা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত থাকতে দিন।' এরপর মি. স্মলম্যান লন্ডন ও হংকংয়ে কথা বলেন। ১৪ নভেম্বর তিনি পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমেদকে তার সরকারের প্রত্যাখ্যানের কথা জানিয়ে দেন।

লাতিন আমেরিকায় নজর

১৭ নভেম্বর বোস্টার লিখেছিলেন :

> আজ প্রেসিডেন্ট (আবু সাদ'ত মোহাম্মদ সায়েম), তাঁর মুখ্য সচিব মাহবুব আলম চাষী এবং নতুন পররাষ্ট্রসচিব তবারক হোসেন আমার ও আমাদের ডেপুটি চিফ অব মিশনের সঙ্গে কথা বলেন। ১৬ নভেম্বরের আগ পর্যন্ত তাঁরা ভাবেননি যে ব্যাংককে আর কটা দিন থাকতে মেজরদের সমস্যা হবে। কিন্তু এখন তো থাইরা বলছেন, ১৮ নভেম্বরের বেশি তাঁরা ফারুক-রশিদ গোষ্ঠীকে রাখতে অপারগ। সে জন্য পররাষ্ট্রসচিব এখন নতুন এই 'সংকট'

উত্তরণে সাহায্য চান। তাঁরা চান, যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের আশ্রয় দিক। না হলে থাইল্যান্ডকে অনুরোধ করুক। এটা তাঁদের 'শেষ চেষ্টা'।

বোস্টার এরপর লিখেছেন :

> আমি বললাম, সরকারের পরিবর্তনে তাঁরা কেন এখন ফিরতে পারছেন না? তবারক হোসেন বললেন, 'সামরিক বাহিনীতে সমস্যা হবে। তাঁরা ফিরলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।' অন্যান্য সরকারের কাছে তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন কি না—জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, 'চূড়ান্ত ধরনের কিছু নয়। ব্রিটিশদের বলেছিলাম। তাঁরা নেতিবাচক প্রচারণার কারণে না করেছেন।' আমি (বোস্টার) বললাম, 'আপনাদের অনুরোধ আমি সরকারকে জানিয়ে দেব। ওয়াশিংটন অবশ্য এ বিষয়ে পুরোপুরি সজাগ রয়েছে।' তবারক হোসেন আরও জানালেন, তিনি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সিদ্দিকীর কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি লাতিন আমেরিকার কোনো দেশকে রাজি করাতে চেষ্টা করবেন।

উল্লেখ্য, বোস্টার তাঁর ১৭ নভেম্বরের এই তারবার্তায় নির্দিষ্টভাবে বলেন :

> আমি সুপারিশ করছি না যে এই সামরিক গ্রুপটিকে আমরা অস্থায়ীভাবে গ্রহণ কিংবা রাজনৈতিক আশ্রয়দানের কথা বিবেচনা করি। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন হবে না।

রশিদ-ফারুক গ্রুপকে যাতে আশ্রয় না দেওয়া হয়, সে জন্য সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে চিঠি দিয়েছিলেন।

উমব্রিখ্‌টের চিঠি

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ও সুইস কূটনীতিক ড. ভিক্টর এইচ উমব্রিখ্‌ট ব্যাংককে মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে ১৭ নভেম্বর এক আবেগঘন চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠির উল্লেখযোগ্য অংশের উদ্ধৃতি মি. হোয়াইটহাউস পরদিন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠান।

ড. ভিক্টর উমব্রিখ্‌ট লিখেছিলেন :

> ৩ নভেম্বর আমি ঢাকা থেকে ফিরি। এর আগে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশের রাজনীতিক ও সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান নিয়ে প্রচণ্ডতম তর্ক-বিতর্ক ও মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের অনেকেই মুজিব, তাঁর পরিবার ও চার নেতাকে হত্যার বিষয়ে

> ঘাতক মেজর ও ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে নেই। তাঁরা ঘাতকদের ক্রিমিনাল হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। আমি ওই দেশ থেকে একটি হেলিকপ্টারে প্রথমে কলকাতায় ও তারপর সেখান থেকে ইউরোপে চলে আসি।

জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল ড. উমব্রিখ্‌ট মুজিব সরকারের সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ দেন। তিনি লিখেছেন :

> গত ১২ মাস ধরে দেশের অর্থনীতির বিরাট উন্নতি ঘটেছিল। ভালো খাদ্য-পরিস্থিতি, বৃহত্তর খাদ্য মজুত, ব্যাপক রপ্তানি ও ঘাটতিবিহীন বাজেটও ছিল। ধর্মঘট ছিল না। ছিল জনহিতকর কর্মসূচি, 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প, কম বেকারত্ব, অধিকতর দক্ষ জনপ্রশাসন (যদিও তখনো দুর্দশা কাটেনি) প্রভৃতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্তম অংশটিকে কেন নির্মূল করা হলো, তা উপলব্ধি করা দুরূহ। আমাদের তা দেখা ও বোঝার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এ পর্যায়ে মার্কিন সরকারের প্রতি তারা যেন কিছুতেই মেজরদের আশ্রয় না দেয়, সে আবেদন জানিয়ে ড. ভিক্টর বলেন :

> মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছ থেকে আমি জেনেছি, এই সামরিক ব্যক্তিরা মস্ত বড় দুর্বৃত্ত। তাঁরা কেবল শেখকেই হত্যা করেননি, তাঁরা তাঁর স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে খুন করেন। তাঁরা হত্যা করেন শেখের দুই বিবাহিত পুত্রকে। সঙ্গে তাঁদের তরুণী স্ত্রীদেরও (যাদের একজনের বিয়ের বয়স হয়েছিল ১৫ মাস, অন্যজনের তিন সপ্তাহ)। তাঁরা শেখের ১১ বছরের কনিষ্ঠ পুত্রটিকে বাগানে ধাওয়া করেন এবং গুলি করে হত্যা করেন।

ড. উমব্রিখ্‌ট লেখেন :

> এই চরম নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার সবটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই দুর্বৃত্তদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো উচিত এবং একটি সামরিক আদালতে তাঁদের বিচার হওয়া উচিত। আমেরিকার ঔদার্য ও মহত্ত্বের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও এই দুর্বৃত্তদের ঠাঁই যুক্তরাষ্ট্রে হতে পারে না। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, স্টেট ডিপার্টমেন্টে আমি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে লিখব। পরে ভাবলাম, তা যথাসময়ে পৌঁছে কি না। তাই আপনাকে লেখা।

পররাষ্ট্রসচিব তবারক হোসেন ১৮ নভেম্বর রাতে ঢাকায় প্রদত্ত এক সংবর্ধনায় বোস্টারকে জানান, 'মেজরদের আশ্রয়ের ব্যাপারে আপাতত একটা উপায় হয়েছে।' কীভাবে লিবিয়ায় তাঁরা আশ্রয় পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। তবে লিবিয়ার পত্রিকায় ছাপা এ-বিষয়ক একটি খবরের বরাতে ওই দেশের মার্কিন দূতাবাস থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো

অন্তত একটি তারবার্তা অদ্যাবধি গোপন রাখা হয়েছে। ২৪ নভেম্বরে ফারুকেরা যখন ব্যাংকক ত্যাগ করেন, তখন তাঁদের সেখানে বিদায় জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সালেহউদ্দিন কায়সার। এ বিষয়ে লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফির কোনো মন্তব্য কখনো জানা যায়নি। পঁচাত্তরের মে মাসে গাদ্দাফি ঢাকায় দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্ত নেন। ফারুক-রশিদ চক্রের ভিসা ঢাকার দূতাবাস থেকেই দেওয়া হয়।

ওরা খুনি

১৯৭৫ সালের ১০ নভেম্বর বোস্টার এক তারবার্তায় লেখেন, 'জার্মান রাষ্ট্রদূত রিটার গত রাতে আমাদের জানিয়ে দেন যে মেজররা তাঁর দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে পারেন। কিন্তু ৬ নভেম্বরে বনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছেন, ওরা খুনি, ওদের যেন আশ্রয় না দেওয়া হয়। রিটার বলেন, 'আমিও তাদের আশ্রয় না দিতে সুপারিশ করেছি।' উল্লেখ্য, ওই সময়ে জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।

ত্রিপোলিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টেইন ২৫ নভেম্বর জানান, 'লে. কর্নেল ফারুক ও তাঁর দল ২৪ নভেম্বর বেনগাজিতে পৌঁছান।' ফারুক বিমানবন্দরে এক টিভি সাক্ষাৎকারে ভারতের নাম না নিয়ে বলেন, তাঁর সরকার ও জনগণ যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, বাংলাদেশ এখন সেসব শত্রুবেষ্টিত। এই সংগ্রামে পাশে দাঁড়াতে তিনি 'মুসলিম ভাই'দের আহ্বান জানান।

১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর ব্যাংকক থেকে রাষ্ট্রদূত হোয়াইটহাউস লিখেছেন :

> পররাষ্ট্র দপ্তরের রেফারেন্স তারবার্তার (নম্বর ২৬১৭৮৭) পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে ৪ নভেম্বর বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের যাঁরা ব্যাংককে পৌঁছেছেন, তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে সব ধরনের খুঁটিনাটি জানতে আমরা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এবং জানার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুত্বপূর্ণ হোক চাই না-হোক, আমরা তা পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়ে দিচ্ছি। ব্যাংককের পাকিস্তান দূতাবাস বাংলাদেশের এই কর্মকর্তাদের বিষয়ে দারুণ আগ্রহ দেখাচ্ছে। ৪ নভেম্বর তাঁরা পৌঁছানোর পর তাঁদের বিমানবন্দর ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাঁরা এখন ভিক্টোরিয়া হোটেলে অবস্থান করছেন। পাকিস্তান দূতাবাস জানিয়েছে, বাংলাদেশ দূতাবাসই থাই ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের মাধ্যমে দলটির প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে।

জিয়ার পরামর্শ

২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৫ আরভিং চেসল ঢাকা থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে এ মর্মে একটি তারবার্তা পাঠান :

> আজ সকালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলার গুজব নাকচ করে দিয়েছেন। যে ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে, আমি তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। জানতে চাইলাম, বেনগাজি থেকে এক অথবা একাধিক কর্মকর্তাকে ফিরিয়ে আনার দাবি উঠেছে কি না। জবাবে তিনি (জিয়া) বলেন, সামরিক বাহিনীতে সবকিছু শান্ত রয়েছে। যে ধরনের সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তা গুরুত্বের সঙ্গে না নিতে তিনি অনুরোধ করেন। নির্বাসিত কর্মকর্তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে জিয়াউর রহমান বলেন, তাঁরা (ফারুক-রশিদ) ঢাকার সমস্যা সম্পর্কে জানেন, যা কিনা তাঁরা ফিরে এলে আরও প্রকট হবে। সুতরাং তাঁদের আরও অপেক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

চেসল মন্তব্য করেছেন :

> জিয়াউর রহমানকে লক্ষণীয়ভাবে ঠান্ডা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধীন বলেই মনে হয়েছে। তিনি যদি ঠিক বলে থাকেন, তাহলে গুজবের যন্ত্র আরও বেগবান হবে। গত কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা যা দেখেছি তার চেয়েও বেশি মাত্রায় তাতে কল্পনায় রং মিশবে।

ভারতীয় পত্রপত্রিকায় সিআইএ

১৬ আগস্ট ভারতের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে দিল্লিতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি ওয়াশিংটনকে জনিয়েছেন, স্বাধীনতা দিবসের ছুটি থাকায় ১৬ আগস্ট দিল্লিতে তিনটি মাত্র পত্রিকা বেরিয়েছে। প্রতিটি পত্রিকা মুজিবের মৃত্যুর খবরকে শিরোনাম করেছে। তারা তাঁর বড় ছবি ছেপেছে। নতুন প্রেসিডেন্টের ছবি ছেপেছে ছোট করে। *টাইমস অব ইন্ডিয়া* তার প্রথম পৃষ্ঠায় 'যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম খবরটি [অভ্যুত্থানের বিষয়] প্রকাশ করেছে' শিরোনামে সংবাদ ছাপে। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার (সিপিআই) দৈনিক *প্যাট্রিয়ট* প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলামজুড়ে রিপোর্ট ছেপেছে—'অভ্যুত্থানের খবর প্রথম জানল ওয়াশিংটন'। প্রতিটি ক্ষেত্রে পাঠক তার নিজের মতো করে ভাবার সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রথম বিবৃতিটি সে দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হয় ১৭ আগস্ট। রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি ওই তারিখেই ওয়াশিংটনে প্রেরিত এক তারবার্তায় বিবৃতিটি এভাবে উদ্ধৃত করেন :

> ভারত সরকার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি-সম্পর্কিত প্রতিবেদনসমূহ সতর্কতার সঙ্গে পাঠ এবং পর্যবেক্ষণ করছে। প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলিতে আমরা উৎকণ্ঠা এড়িয়ে থাকতে পারি না। তবে এসবই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।
>
> রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এক বিরাট আঘাত বয়ে এনেছে। স্বাধীনতার জন্য সাহসিকতার সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মন্তুদ মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

আমাদের সময়ের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বদের একজন হিসেবে আমরা ভারতে তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।

উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলার যে স্বপ্ন, সে বিষয়ে ভারতীয় জনগণ সংকল্পবদ্ধ। এই আদর্শ অর্জনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৮ আগস্ট দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম স্যাক্সবি ভারতীয় পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের পরিস্থিতির বিবরণ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, একাদিক্রমে তৃতীয় দিনের মতো ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে খবর ও মন্তব্য প্রকাশ করা অব্যাহত রেখেছে। তবে খবরগুলো খণ্ডিত এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য সতর্কতামূলক। বৈদেশিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, এমন কিছু বিষয় প্রকাশে অবশ্য সরকারের সেন্সরশিপ জারি রয়েছে।

১৬ আগস্ট মুজিব হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পত্রিকাগুলো ব্যানার হেডলাইনে প্রকাশ করে। *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* আট কলাম শিরোনাম ছিল 'সেনা অভ্যুত্থানে মুজিব নিহত'। পৃথক উপশিরোনামে লেখা হয়: ১. প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী নিহত, ২. সামরিক শাসন জারি ও ৩. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষিত। খবরের সূত্র হিসেবে এপির (মার্কিন সংবাদ সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস') নাম উল্লেখিত হয়। ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়ার বরাতে মোশতাককে পাকিস্তানপন্থী বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য খবরের মধ্যে ছিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরই প্রথম অভ্যুত্থানের খবর প্রচার করেছে এবং পিন্ডি নতুন সরকারকে স্বীকৃতি ও সাহায্য দিতে ছুটে গেছে। পত্রিকাগুলো অবশ্য মুজিবের প্রশংসাও করে: 'মুজিব ছিলেন অদম্য সাহসী, যিনি একটি আধুনিক জাতির স্রষ্টা।'

কলকাতায় বিক্ষোভ

১৬ আগস্ট কলকাতায় মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল ডেভিড এ কর্ন ১৮ আগস্ট লেখেন:

পুলিশ দাবি করেছে, ওই দিনের বিক্ষোভ যে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রভিত্তিক হবে তা তাদের জানা ছিল না। আসলে ওটা ছিল কেবলই পাশ দিয়ে অতিক্রম করার মতো একটা ঘটনা। সন্ধ্যা ছয়টায় ওই সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে ভেঙে যায়। আমি ১৬ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আইজি রণজিৎ গুপ্তকে ফোন

করেছিলাম। তাঁর কাছ থেকে মিশনের নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চয়তা চেয়েছিলাম। ওই সময় আমি বিস্ময় প্রকাশ করি যে, জরুরি অবস্থা বহাল থাকা অবস্থায় ওই বিক্ষোভ কীভাবে হতে পারল। গুপ্ত দাবি করেন, ওই বিক্ষোভের কথা তাঁর জানা ছিল না। অথবা হয়তো তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মিছিলটি যে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে যাবে, তা তাঁর জানা ছিল না।

অভ্যুত্থানের পর থেকে যেসব ভারতীয়র সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। তবে কেউ বলেননি, ভারতের উচিত বাংলাদেশকে দখল করে নেওয়া। চিন্তাশীল মহল মেনে নিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এতে জড়িত ছিল না। তবে তাঁরা বলেন, তেমন সম্ভাবনার কথা যে এখানে কেউ কেউ বিশ্বাস করতে পারে, সে বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে।

১৮ আগস্টের পত্রিকায় পরিবেশিত খবরের মূল বিষয় ছিল 'পূর্ণ সম্মানের' সঙ্গে মুজিবকে সমাহিত করা এবং ঢাকার পরিস্থিতি ভারতের 'সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ'। স্যাক্সবি লিখেছেন, আজকের পত্রপত্রিকায় অবশ্য নিহত নেতার 'সমর্থক ও নতুন কর্তৃপক্ষের মধ্যে' স্বতঃস্ফূর্ত লড়াইয়ের খবর পরিবেশিত হয়। ইরানি টিভির উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপির (ফরাসি বার্তা সংস্থা) বরাতে এ খবরটি দেওয়া হয়। *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ও মস্কোপন্থী *প্যাট্রিয়ট* এ খবরটিকে শীর্ষ শিরোনাম করেছে। *স্টেটসম্যান* প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপেছে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত'। অন্যান্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, দেশের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী জীবিত। 'সম্পর্ক বিষয়ে পিন্ডি-ঢাকা আলোচনা শিগগিরই'। (ইসলামাবাদ থেকে কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে রয়টার্সের প্রতিবেদন)।

আজকের পত্রপত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে নানা মতামত এসেছে। 'বাংলাদেশে অভ্যুত্থান' শীর্ষক এক শীর্ষ সম্পাদকীয়তে *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* বলেছে, 'অভ্যুত্থান দেশটিতে এক বিরাট পরিবর্তন বয়ে এনেছে'। 'সেনাবাহিনী এই পরিবর্তনের মুখ্য চালিকাশক্তি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে'। পত্রিকাটি এরপর লিখেছে, পরিবর্তিত অবস্থার বিরুদ্ধে কোনো জনপ্রিয় প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, প্রাথমিক খবর থেকে তেমন জানা যায় না। অবশ্য এর অন্যথা কিছু হলেই বরং তা বিস্ময়কর বলে গণ্য হতো।

সম্পাদকীয়তে সংবিধান থেকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাল্টানোর জন্য মুজিবকে দায়ী করে বলা হয়, তিনি সব ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করেছিলেন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়াসমূহের ওপর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবে সব প্রতিকূলতার বিপরীতে মুজিব তাঁর জনগণকে মর্যাদা

ও আত্মবিশ্বাস দিতে পেরেছিলেন। পত্রিকাটি দিল্লি ডেটলাইনে বিশেষ সংবাদদাতা এফ চক্রবর্তীর পাঠানো একটি ডেসপাচ ছেপেছে। এতে মন্তব্য করা হয়, 'মুজিবের বিরোধিতায় উগ্রপন্থীরা হাত মিলিয়েছিল'। তবে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং একদলীয় শাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে মুজিব তাঁর 'জনগণের কাছ থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর যে বিষয়টি সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হলো, শেখ মুজিব সেনাবাহিনীকে দৃশ্যত উপেক্ষা করেছিলেন।'

হিন্দুস্তান টাইমস 'বাংলাদেশ ট্র্যাজেডি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলেছে, ভারত স্বাভাবিকভাবেই উপমহাদেশের ঘটনাবলিতে উদ্বেগ অনুভব করছে। এ অঞ্চলে যেকোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা বা অস্থিরতা সৃষ্টি হলে তা থেকে ভারত দূরে থাকতে পারে না। এখন কোনো বৈদেশিক শক্তি এতে নাক গলালে তা পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলতে পারে। উপসংহারে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, 'ভারত এখন কেবল সহানুভূতির সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। যদিও তাকে চোখ-কান খোলা রাখতেই হবে।'

১৮ আগস্ট 'বাংলাদেশে অভ্যুত্থানে : কলকাতায় মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ' শীর্ষক একটি বার্তা পাঠানো হয় ওয়াশিংটনে। তাতে ডেভিড এ কর্ন লেখেন :

> স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় প্রায় ১ হাজার ৫০০ লোক চৌরঙ্গীতে অবস্থিত মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। তারা মার্কিনবিরোধী স্লোগান দেয় এবং মুজিব হত্যার জন্য সিআইএকে দোষারোপ করে প্ল্যাকার্ড বহন করে। পরে তারা শহরের অন্য প্রান্তে একটি সমাবেশও করে। আমরা শুনেছি, সিপিআই এর উদ্যোক্তা।

মিসেস গান্ধী ও 'ব্লিৎজ'

২২ আগস্ট ১৯৭৫ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তৈরি বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে বাংলাদেশেরও উল্লেখ রয়েছে। রবিনসনের স্বাক্ষরিত এই বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মিসেস গান্ধী *ব্লিৎজ*-এ প্রকাশিত নিবন্ধকে সংবেদনশীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সফররত মার্কিন সিনেটর টমাস এফ ইগলটনের কাছে মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে সিআইএর জড়িত থাকার বিষয়ে *ব্লিৎজ* পত্রিকায় যে নিবন্ধ বেরিয়েছে, তা চাঞ্চল্যকর। মিসেস গান্ধীকে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন তাঁকে কিছুটা বিব্রত বলে মনে হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী এই নিবন্ধ প্রকাশে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং

বলেন, 'আমরা সংবাদক্ষেত্রটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।' বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে সিআইএর জড়িত থাকার বিষয়ে মিসেস গান্ধীর বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মিসেস গান্ধী দুবার উচ্চারণ করেন, 'আমাদের কাছে এমন কোনো খবর নেই।'

মার্কিন অধ্যাপক মার্কাস ফ্রান্ডা দীর্ঘদিন বাংলাদেশে ছিলেন। ১৯৭৫ সালে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির ফিল্ড স্টাফ প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন, 'কিছু সময়ের জন্য হলেও মিসেস গান্ধী সুচিন্তিতভাবে নীরবতার নীতি অনুসরণ করেন। মোশতাককে 'মার্কিন চামচা' হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়াকে (সিপিআই) অনুমোদন দিলেও নিজে কিন্তু মুজিব হত্যায় সিআইএর সম্পৃক্ততার বিষয়ে কোনো অভিযোগ তোলেননি।'[১]

নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে, সেন্সরশিপ সত্ত্বেও এই বিষয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রে যা কিছু ছাপা হচ্ছে, তা সরকারের 'রশি আলগা করে দেওয়ার নীতি'র ফসল।

'চিলির নাটের গুরু এখন ঢাকায়' বলে মুজিব হত্যায় বোস্টারকে দায়ী করেছিল পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া। আসলে জরুরি অবস্থার মধ্যেও, বিশেষ করে দিল্লি, বোম্বে ও কলকাতার পত্রপত্রিকায় মুজিব হত্যায় সিআইএর জড়িত থাকার বিষয়ে বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়। এ নিয়ে দেখা দিয়েছিল দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কে টানাপোড়েন।

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রভাবশালী সিনেটর ইগলটন (১৯৬৮-৮৭ মেয়াদে মিসৌরি থেকে নির্বাচিত, ২০০৭ সালে মারা যান) পঁচাত্তরের ২১ আগস্ট দিল্লি সফরে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএর হাত আছে?' ইন্দিরা একটি বাক্য দুবার উচ্চারণ করেন, 'আমাদের কাছে তেমন খবর নেই।'

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি স্যাক্সবির পাঠানো প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, *ব্লিৎজ* নামে একটি পত্রিকা সিআইএকে দায়ী করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। *ব্লিৎজ*-এ প্রকাশিত উক্ত নিবন্ধে বলা হয়, ঢাকায় সাহায্যকর্মীর নামে আসলে বিপুলসংখ্যক সিআইএর কর্মী ভিড় করেছে। পিটার বার্লে ছিলেন কলকাতার মার্কিন দূতাবাসের কাউন্সিলর। সিআইএর ছদ্মবেশী এজেন্ট। তাঁকে সম্প্রতি ঢাকায় পাঠানো হয়। এ-সংক্রান্ত প্রশ্নের

---

১. *American Universities Field Stuff, Reports Service: South Asia series,* Volumes 19-21, 1975, P. 43.

জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'এই পত্রিকা চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী খবর ছাপে। আমার বিরুদ্ধেও লিখেছিল।' কিন্তু আগস্টেই *ব্লিৎজ* ইন্দিরার বিশেষ সাক্ষাৎকার ছাপে। ভারতে ওই সময়ে জরুরি অবস্থা ছিল। সে কারণে মার্কিনরা সন্দেহ করত যে এসব খবর সেন্সরমুক্ত হয় কী করে। ওই সময়ে ভারতের মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন দিচ্ছিল। তারা মুজিব হত্যায় সিআইএকে জড়িয়ে জোরালো বক্তব্য দেয়। বামপন্থী সাংসদেরা পঁচাত্তরের মার্চ মাসে উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে সিআইএর 'ব্যাপক অশুভ তৎপরতার' বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। এমনকি তাঁরা এ বিষয়ে বক্তব্য দেন।

ভারতের কমিউনিস্ট নেতা ও বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বাংলাদেশেও একটি পরিচিত মুখ। তিনি ছিলেন ভালো বক্তা। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নথিপত্র থেকে দেখা যায়, ২২ নভেম্বর ৭৫ লেনিনগ্রাদে তিনি মুজিব হত্যার তদন্তে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের আহ্বান জানান। তিনি তথ্য দেন যে সিআইএর ষড়যন্ত্রের বিষয়ে মুজিবকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, তিনি এ বিষয়ে সজাগ রয়েছেন।

সেপ্টেম্বরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন গিয়েছিলেন ওয়াশিংটন ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ লিখেছেন, 'মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা ইন্দিরাকে সহায়তা করেন। কিন্তু মুজিব হত্যা নিয়ে ইন্দিরা প্রশাসনের ভূমিকায় আমরা হতাশ। কমিউনিস্টরা কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই মুজিব হত্যায় সিআইএকে জড়িত করে প্রচার চালাচ্ছে।' ২২ আগস্ট স্যাক্সবি এক বার্তায় ওয়াশিংটনকে জানান, 'ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন রাষ্ট্রদূত ও সিনেটর ইগলটনকে বলেছেন, 'কমিউনিস্টরা যে এ রকম আক্রমণাত্মক অভিযোগ করছে, আপনারা এটা সোভিয়েতের কাছে তুলতে পারেন।' যদিও সিপিআইয়ের পত্রিকা *কালান্তর*-এ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌগত রায়ের এরকম একটি মন্তব্য ছাপা হয় যে মুজিব হত্যা সিআইএর ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। ২১ আগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাগরিক কমিটির সভায়ও সিআইএকে দায়ী করা হয়। ২২ আগস্ট *প্যাট্রিয়ট* পত্রিকা রিপোর্ট করে যে ওই সভায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও তাঁর বক্তব্যে সিআইএকে অভিযুক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, ২২ আগস্ট ১৯৭৫ সিনেটর ইগলটনের সঙ্গে মিসেস গান্ধীর কথোপকথন বিষয়ে দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি পৃথক একটি তারবার্তা পাঠান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে। স্যাক্সবি লিখেছেন, *ব্লিৎজ*-এ

প্রকাশিত নিবন্ধ সম্পর্কে সিনেটর ইগলটনের প্রশ্নের জবাবে মিসেস গান্ধী বলেছেন *ব্লিৎজ* একটি চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সাময়িকী। পত্রিকাটি অতীতে তাঁকেও আক্রমণ করেছে। তিনি বুঝতে পারছেন না, এই প্রশ্নসাপেক্ষ নিবন্ধটি কী করে ছাপা হতে পারল। মিসেস গান্ধী আসলে প্রসঙ্গটি তোলায় বিব্রত হয়েছেন।

পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টে সিনেটর ইগলটন দক্ষিণ এশিয়া সফরে ছিলেন। ১৬ আগস্ট তেল আবিব থেকে এথেন্স ও দিল্লিতে পাঠানো বার্তায় বলা হয়, সিনেটর ইগলটন ২১ আগস্ট ভারতে পৌঁছে ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। ভারতের ওপর অভ্যুত্থানের প্রভাবও জানতে চান তিনি।

২৫ আগস্ট ১৯৭৫

বোম্বের 'বামপন্থী' সাপ্তাহিক *ক্যারিটির* ২৩ আগস্ট ১৯৭৫ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিবন্ধের শিরোনাম 'বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে সিআইএ'। এ বিষয়ে দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছেন, ওই নিবন্ধের শুরুটা হয়েছে এভাবে : বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার ব্যাপারে আমেরিকার যোগসাজশের সন্দেহটা এতটাই দৃঢ়ভিত্তিক যে, এটা এখন প্রায় সন্দেহাতীত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই নিবন্ধে ফরাসি কমিউনিস্ট দৈনিক *লা হিউমানেতে*-এ প্রকাশিত খবরের ওপর নির্ভর করা হয় এবং ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারি রমেশচন্দ্রই হলেন এই খবরের উৎস। *ক্যারিটির* নিবন্ধের উপসংহারে বলা হয়, ভারত যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তল্পিবাহক হতে অস্বীকার করেছে, তখন এটাই স্বাভাবিক যে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে আর অন্য দিকে সিআইএর 'ডার্টি ট্রিকস স্কোয়াডে'র প্রতিও তাদের সায় থাকবে। এই তারবার্তায় মন্তব্য করা হয় যে ক্রমবর্ধমানভাবে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে ভারতে সংবাদপত্রের ওপর যে সেন্সরশিপ জারি রয়েছে, তা তাদের বামপন্থী সিপিআই/মস্কোপন্থী প্রকাশনাগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়। আর এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের পোয়াবারো হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি 'যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণে বামপন্থী প্রেসের লাইসেন্স' শীর্ষক একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন। এতে তিনি লিখেছেন :

২৩ আগস্ট বোম্বের বামপন্থী ছোট্ট সাপ্তাহিক *ক্ল্যারেটি* তার প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে সিআইএকে জড়িত করে নিবন্ধ ছেপে *লিংক* ও *ব্লিৎজ*-এর সঙ্গেই যোগ দিল। এই পত্রিকা দুটো বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে প্রবন্ধ ছেপেছে। যদিও আমাদের বলা হয়েছে যে ভারত সরকার কতিপয় মার্কিনবিরোধী নিবন্ধের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু এটা এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে অন্তত কতিপয় বামপন্থী সাময়িকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনার লাইসেন্স ভোগ করছেন। তবে এটা লক্ষণীয় যে ভারতের অধিকাংশ দৈনিক, যার মধ্যে কলকাতার সংবাদপত্রও রয়েছে, তারা আর বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়দায়িত্বের অভিযোগ-সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করছে না। আমরা বোম্বের কনসাল জেনারেলকে *ক্ল্যারিটি* পত্রিকার কাছে একটি প্রতিবাদ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছি। ২২ আগস্ট অতিরিক্ত ডেপুটি চিফ অব মিশন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শরণ সিংয়ের কাছে *ব্লিৎজ* সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে *ব্লিৎজ, ক্ল্যারিটি ও লিংক*-এর মতো যারাই যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে নিবন্ধ বা প্রতিবেদন ছাপবে, তাদের কাছেই আমরা প্রতিবাদ জানাব। যদিও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য হচ্ছি যে কংগ্রেস-সিপিআই সম্পর্ক এবং রুশ-ভারত সম্পর্কের কারণে ভারত সরকার তাদের নিজেদের সেন্সরশিপ পুরোপুরি বহাল করবে না।

সিপিআই কাউন্সিলে

১৯৭৫ সালের ২৭ আগস্ট রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি লিখেছেন, এ দিন ভারতীয় সংবাদপত্রে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সিপিআই)-এর জাতীয় পরিষদের খবর বেরিয়েছে। ২৬ জুন ভারতে জরুরি অবস্থা জারির পর এটাই তাদের প্রথম বৈঠক। সিপিআই কাউন্সিল এখনো চলছে বলে জানা গেছে। সেখানে আলোচনার দুটো বড় বিষয় : বাংলাদেশের অভ্যুত্থান এবং ভারতে জরুরি অবস্থা।

'সিপিআইর দৈনিক' *প্যাট্রিয়ট* পত্রিকায় বাংলাদেশের বিষয়ে কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবের সবচেয়ে বিশদ বিবরণ ছাপা হয়েছে। ওই প্রস্তাবে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকে 'এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক কূটকৌশলের ধারাবাহিকার সঙ্গে সম্পর্কিত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমান হলেন এই

ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ মর্মান্তিক বলি। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কেবল সিআইএ নয়, একটি পাকিস্তানপন্থী এবং মাওবাদী চক্রের সংশ্লিষ্টতাও থাকতে পারে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ বাংলাদেশের ঘটনাবলি থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতের সব গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহের প্রতি আহ্বান জানায়। সেই সঙ্গে এই সংকটময় মুহূর্তে তাদের সর্বাত্মক নজরদারি ও ঐক্য বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। 'বিশ্বকে অস্থিতিশীল' করার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে 'প্রগতিশীল সরকারগুলোর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যক্রম চালানো, তাদের অনন্যসাধারণ গণতান্ত্রিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের গুপ্তহত্যা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহকে নানাভাবে মদদ দান ও সাহায্য প্রদান করা। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় সামরিকভাবে পর্যুদস্ত এবং পশ্চিম এশিয়ায় কূটনৈতিকভাবে মার খাওয়ার প্রেক্ষাপটে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারত উপমহাদেশে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।'

বোস্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

১৯৭৫ সালের ২৭ আগস্ট বোস্টার লিখেছেন, ভারত তাঁর দাবিমতে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা নিষিদ্ধ করেছে। ২৬ আগস্ট নয়াদিল্লি থেকে ঢাকায় পাঠানো খবরে বলা হয় যে, ভারতের তথ্যমন্ত্রী ভি সি শুক্লা বলেছেন, ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে ভারতীয় ভূখণ্ড ও তার সুবিধাদি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।

২৪ আগস্ট শুক্লা বৈদেশিক সংবাদদাতাদের বলেন, 'আমাদের এখানকার সুবিধাদি আমাদের বাংলাদেশের বন্ধুদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হোক, তা আমরা চাই না।' শুক্লা এ সময় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার বিষয়ে সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন। ভারতের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে বলা হয় যে, ভারত থেকে বাংলাদেশ-সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপের বিষয়ে ভারত সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিদেশি সংবাদদাতাদের অবহিত করা হয়েছে।

২৮ আগস্ট ১৯৭৫ মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৭৪-১৯৭৬) রবার্ট এস ইঙ্গারসল দিল্লি, ঢাকা ও এ অঞ্চলের অন্যান্য মার্কিন দূতাবাসকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ডেপুটি চিফ অব মিশন এ পি ভেঙ্কটেশ্বরণের (১৯৮৭

সালের গোড়ায় তিনি ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে পদত্যাগ করেন) সঙ্গে তিনি আলোচনার সুযোগ পান। এ সময় তিনি ভারতের বামপন্থী মিডিয়ায় বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে অব্যাহতভাবে রিপোর্ট প্রকাশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইঙ্গারসল লিখেছেন, 'আমরা ওই অভিযোগকে আক্রমণাত্মক এবং বৈদেশিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর এবং তা যে ভারত সরকারের আরোপিত সেন্সরনীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা-ও উল্লেখ করি।' ভেঙ্কটেশ্বরণ সেন্সরশিপ সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশে সচেষ্ট হন। তিনি যুক্তি দেখান যে, সেন্সরশিপ-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কেবল অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে আমাদের আপত্তির কথা নিশ্চয়ই তিনি দিল্লিতে তাঁর সরকারকে জানিয়ে দেবেন। আর তিনি এ কথাও বলেন যে, ভারত সরকার কোনোক্রমেই এটা বিশ্বাস করে না যে, বাংলাদেশের ঘটনার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোনো হাত রয়েছে।'

পঁচাত্তরে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের দায়ে ব্যক্তিগতভাবে 'অভিযুক্ত' হয়েছিলেন। কিন্তু জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৯ সালে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোস্টার বাংলাদেশে তাঁর ঘটনাবহুল পেশাদারি জীবনে সিআইএ-সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। অথচ পঁচাত্তরে মুজিব হত্যায় সিআইএ ও তাঁকে সরাসরি জড়ানো হয়েছিল।

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন কূটনীতি অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ সমিতির যে প্রকল্পের আওতায় বোস্টার ১৯৮৯ সালে তাঁর সাক্ষাৎকার দেন, তাতে তাঁকে সম্পৃক্ত করে তৎকালীন পত্রপত্রিকার অভিযোগের বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যাদানের সুযোগ ছিল। ফরেন সার্ভিসে কর্মরত থাকাকালে বিধিবদ্ধ কূটনৈতিক কায়দাকানুনের ঘেরাটোপে থাকতে হয় রাষ্ট্রদূতদের। অবসরে গিয়ে পেশাদার কূটনীতিকেরা যাতে স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন, তার সুযোগ তৈরি করাই কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। বোস্টার মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সে ধরনের কোনো অকপট মতামতের প্রতিফলন তাঁর এই সাক্ষাৎকারে ঘটাননি; বরং তাঁর বক্তব্যে মুজিব হত্যার বিষয়ে কিসিঞ্জার প্রশাসনের সরকারি ভাষ্যের স্থিতাবস্থা বজায় থাকে বলেই প্রতীয়মান হয়।

লিফশুলজ লিখেছেন, বোস্টার জীবদ্দশায় তাঁর কাছে প্রচ্ছন্ন আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে মুজিব হত্যায় সিআইএর সম্পৃক্ততার বিষয়ে

তাঁর (বোস্টার) বিরোধিতার কথা যেন প্রকাশ পায়। ২০০৫ সালে ৮৪ বছর বয়সে বোস্টারের মৃত্যুর ৩৮ দিনের মাথায় লিফশুলজ অভ্যুত্থান প্রতিহত করতে বোস্টারের ভূমিকা নির্দিষ্টভাবে প্রথম প্রকাশ করেন। যদিও বোস্টার জুনিয়র দাবি করেন যে, তাঁর বাবা লিফশুলজকে এমন কথা বলেননি। বরং তাঁকে তাঁর বাবা একজন চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী সাংবাদিক হিসেবে মনে করতেন।

২০০৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট লিফশুলজ *প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার*-এ 'অতীত কখনো মরে না' শীর্ষক চার কিস্তির নিবন্ধ লেখেন। এ বিষয়ে বোস্টারপুত্র ২০০৫ সালের ২৮ আগস্ট লেখেন :

> লিফশুলজকে যেভাবে আমার বাবার ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে তা সঠিক নয়। ২০০১ সালের ১৬ জানুয়ারি আমার বাবাকে লেখা লিফশুলজের চিঠিই প্রমাণ করে যে, তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। এতে তিনি লেখেন, 'বহু বছর আগে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। প্রথম দেখা ঢাকায় আপনি যখন সেখানে রাষ্ট্রদূত। এরপর একবার দেখা হয় ওয়াশিংটনে। বাংলাদেশি সংবাদপত্রের জন্য গত গ্রীষ্মে আমার কতিপয় লেখার ক্লিপিং পাঠালাম। আপনি তা পাঠে আগ্রহী হতে পারেন।' সুতরাং এটা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা কারও চিঠির নমুনা হতে পারে না। আমার বাবার সঙ্গে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের আগে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেটা ছিল পুরোপুরি আলোচ্য বিষয়বহির্ভূত। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ১৯৭৭ সালে পররাষ্ট্র দপ্তরে এবং তা ছিল সংক্ষিপ্ত। আর তৃতীয় বৈঠক কখনোই হতে পারেনি, কারণ বাবা তা চাননি। সুতরাং এটা নিশ্চয় '৩০ বছরে ধরে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের স্বাক্ষর' বহন করে না। ২০০৫ সালের মে মাসে ভার্জিনিয়ার বাড়িতে বাবার সঙ্গে আমি ১০ দিন কাটাই। একপর্যায়ে আমি লিফশুলজ প্রসঙ্গ তুলি। তাঁর লেখা আমার আগেই পড়া ছিল। যা আমার কাছে শতভাগ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। বাবা লিফশুলজকে ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক ধরনের লেখক বলে নাকচ করে দেন। এমনকি ইঙ্গিত দেন যে, তাঁর ধারণা, লিফশুলজ নিজেই বিশ্বাস করতেন যে, ক্যু-র সঙ্গে বাবা (বোস্টার) জড়িত। আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক যে, লিফশুলজের লেখাগুলো পাঠে বাবা তেমন সময় নষ্ট করেননি এবং সেগুলোকে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য বলেও মনে করেননি। আমার বাবাকে যদি এ বিষয়ে কখনো টেলিফোনে কথা বলতে হতো, তাহলে আমি নিশ্চিত যে বাবা তখন লিফশুলজকে বলতেন, 'বিদায় হও বাপু।'

বোস্টারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যিনি বোস্টারের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁর তরফে ওই প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে *প্রথম আলো* ও *স্টার* সম্পাদকদ্বয় দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, '৩০ বছরের বেশি সময়

ধরে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষাকারী' কথাটি সম্পাদকের নোট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দায় লিফশুলজের নয়। এ জন্য আমরা লিফশুলজ এবং বোস্টার জুনিয়রের কাছে দুঃখ প্রকাশ করি।'

এ বিষয়ে লিফশুলজের বক্তব্যও একই দিনে উভয় পত্রিকায় ছাপা হয়। লিফশুলজ লিখেছেন, 'আমি কখনোই কোথাও এটা উল্লেখ করিনি যে, বোস্টারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে ভুল হতেই পারে। এবং এই ভুলের জন্য মতিউর রহমান ও মাহফুজ আনাম উভয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।' তবে লিফশুলজ উল্লেখ করেন যে, বোস্টারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ কম ঘটলেও টেলিফোনে বেশ যোগাযোগ ঘটেছে। 'আমি বহুবার তাঁকে টেলিফোন করেছি। আমি তাঁকে যখনই ক্লিপিং পাঠিয়েছি ততবারই ফোন করেছি। বলেছি, এতে যদি কোনো ভুলত্রুটি থাকে, তাহলে তিনি যেন তা উল্লেখ করেন।' এটা লক্ষণীয় যে, লিফশুলজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুজিব হত্যাকাণ্ডে বোস্টারের কথিত সম্পৃক্ততার অভিযোগ নাকচ করেছেন। তাঁর কথায় :

> আমি মনে করি, বোস্টার জুনিয়রের পত্রের যে অংশটি মূলত জবাব দেওয়া দরকার সেটি হলো, পঁচাত্তরের অভ্যুত্থানে বোস্টারের যুক্ত থাকার বিষয়টি। আমার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা দারুণভাবে কঠিন যে, তিনি এমনটা ভেবেছিলেন। অবশ্য যদি না তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন। আমি বোস্টার জুনিয়রকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। কারণ আমি কখনো এমন কিছু লিখিনি, যাতে সামান্যতম কিংবা পরোক্ষভাবেও এমন ইঙ্গিত রয়েছে। এটা একটা হাস্যকর সিদ্ধান্ত। বরং আমরা গোড়া থেকেই লিখে আসছি যে, তিনি তাঁর দূতাবাসের সঙ্গে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীদের যোগাযোগ প্রতিহত করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

২০০৫ সালের ২৬ আগস্ট পাকিস্তানের ওয়াহ থেকে প্রেরিত ওই চিঠিতে লিফশুলজ আরও লিখেছেন :

> রাষ্ট্রদূত বোস্টারের দুই পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র ড. জেমস বোস্টার বহু বছর ধরে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের আগে তাঁর বাবা কী ধরনের প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছিলেন, সেটা জানতে সময় ব্যয় করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অভ্যুত্থান ঠেকাতে আগেভাগেই তিনি সক্রিয় ছিলেন এবং এর বাস্তবায়নে তিনি কোনো ভূমিকাই রাখেননি। শুনেছি তিনি বুদ্ধিদীপ্ত ও অমায়িক। ইতিহাসের এই অংশ স্পষ্ট করার প্রয়োজনে ভবিষ্যতে কখনো তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসার আগ্রহ পোষণ করি।

পঁচাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের *স্টেটসম্যান*, *অমৃতবাজার* ও *আনন্দবাজার পত্রিকায়* মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএকে জড়িত করে ফলাও খবর ছাপা হয়। সিপিআই-সমর্থিত দৈনিক *কালান্তর* সিআইএর জড়িত থাকা নিয়ে মস্কো থেকে পাঠানো একটি খবরকে ব্যানার হেডলাইন করে। এই সময়ে বোস্টার নিজেও সিআইএর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডে তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগের বিষয়ে একাধিক তারবার্তা পাঠান পররাষ্ট্র দপ্তরে। সুতরাং সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএর জড়িত থাকার খবরাখবর তখন কিসিঞ্জার প্রশাসন ও বোস্টারের সামনে একটি বড় বিষয় ছিল।

কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের সাক্ষাৎকারগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব ধরনের বিতর্ক ও ধারণাপ্রসূত বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করা একটি সাধারণ প্রবণতা। ওই প্রকল্পের আওতায় মার্কিন কূটনীতিকদের সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমান-সংক্রান্ত বহু বিষয় এসেছে। চুলচেরা বিশ্লেষণও হয়েছে।

কথ্য ইতিহাসবিদ চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি গুয়াতেমালায় সিআইএর ভূমিকা নিয়ে বোস্টারকে নির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। বোস্টার বাংলাদেশে ১৩ এপ্রিল ১৯৭৪ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ এবং গুয়াতেমালায় ১৩ অক্টোবর ১৯৭৬ থেকে ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৯ পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। স্টুয়ার্ট কেনেডি বোস্টারের সাক্ষাৎকার টেপ করেন ২০ অক্টোবর ১৯৮৯। এরপর বোস্টার আরও ১৬ বছর বেঁচে ছিলেন।

২০০৫ সালের ১১ জুলাই *ওয়াশিংটন পোস্ট* এক স্মৃতিগাথায় লিখেছে :

> ১৯৭৩-৭৪ সালে ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহোযোগিতা-সংক্রান্ত ৩৫ জাতি সম্মেলনে বোস্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এই সম্মেলনেই মানবাধিকার-বিষয়ক হেলসিংকি চুক্তি চূড়ান্ত হয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার ব্লকের ভিন্নমতাবলম্বীদের মানবাধিকারের বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হতে বিশেষ সুযোগ লাভ করে। এই সম্মেলনের পরই তাঁকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়।

১৯৭৯ সালে অবসর নেওয়ার পর তিনি মিউনিখ-ভিত্তিক রেডিও লিবার্টির পরিচালক নিযুক্ত হন। এই রেডিওর শ্রোতা ছিল সোভিয়েতবাসী। ১৯৮০-৯৪ সালে তিনি ওয়াশিংটন অঞ্চলে পররাষ্ট্র দপ্তর ও গোয়েন্দা মহলের স্বাধীন কনসালট্যান্ট ছিলেন। ওহাইওর রিও গ্রান্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি আটলান্টিক ও প্যাসিফিকে নৌবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধকালীন শেষ দিনগুলোতে তিনি রাশিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পররাষ্ট্র সার্ভিসে যোগ দেন এবং

তাঁকে মস্কোর মার্কিন দূতাবাসে পাঠানো হয়। তিনি অর্থনীতিবিষয়ক আন্ডারসেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি টেনিস কোর্টে সক্রিয় ছিলেন। মেরি শিলটজ ও কন্সটানজা গ্যামেরোর সঙ্গে বোস্টারের বিয়ে ভেঙে যায়।

মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালা। ১৯৫৪ সালে সিআইএ কর্তৃক দেশটির বামপন্থী সরকার উৎখাতের ৫০ বছর পর সেখানে পুনরায় বামপন্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯৫ সালে *নিউ ইয়র্ক টাইমস্*-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনমতে, ১৯৮৮-৯১ সালে গুয়াতেমালায় সিআইএ স্টেশন চিফের নেতৃত্বাধীন ২০ জনের কর্মিবহরের বার্ষিক বাজেট ছিল পাঁচ মিলিয়ন ডলার। আর প্রায় সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি মার্কিন বাজেট বরাদ্দ ছিল গুয়াতেমালার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সিআইএর 'লিয়াজোঁ' রক্ষায়। এর অর্থ হলো, সিআইএ সেনাবাহিনীকে ঘুষ দিত। ১৯৫৪ সালে সিআইএ সেখানে যেসব কাণ্ডকীর্তি করে, তার ছিটেফোঁটা তথ্য অবমুক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশই আজও গোপনীয়। হয়তো বহু বিষয় কখনো প্রকাশ করা হবে না।

ডেভিস ইউজিন বোস্টার ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে গুয়াতেমালায় পৌঁছার আগেই সেখানে তিনটি অভ্যুত্থান ঘটে। বোস্টার তাঁর ওই সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের সঙ্গে গুয়াতেমালার একটি তুলনা দেন। বাংলাদেশে মার্কিন স্বার্থ কী, এই প্রশ্নের জবাবে আগাগোড়া যুক্তরাষ্ট্রের স্থিরকল্প বক্তব্য হলো : 'মানবিক সাহায্য ও গণতন্ত্র উন্নয়ন'। বোস্টারের কাছে কথ্য ইতিহাসবিদ স্টুয়ার্ট কেনেডি প্রশ্ন রাখেন, '১৯৭৬-৭৮ সালে গুয়াতেমালায় মার্কিন স্বার্থ কী ছিল?' বোস্টার বলেন, 'কতিপয় স্বার্থের মধ্যে অন্যতম ছিল গুয়াতেমালার অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তবে ঢাকায় আমাদের যতটা বৃহৎ সাহায্য কর্মসূচি রয়েছে, এখানে তার চেয়ে অনেক কম।' স্টুয়ার্ট তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার মতে, গুয়াতেমালায় সিআইএ কী ভূমিকা পালন করেছিল? আপনি কি তাদের সঙ্গে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিলেন?' বোস্টার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন, 'হ্যাঁ।' বোস্টার কিন্তু সিআইএর ভূমিকা-সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান। স্টুয়ার্টের প্রশ্ন : 'বলা হয়ে থাকে, লাতিন আমেরিকায় মার্কিন নীতি আসলে বাণিজ্য স্বার্থতাড়িত?' বোস্টার বলেন, 'আমার কিন্তু তেমন মনে হয়নি।'

১৯৭৪-৭৮ সালে গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল গার্সিয়া। ভোট ডাকাতির নির্বাচনে জিতে ও সেনাবাহিনীতে কর্মরত থেকে তিনি দেশ শাসন করেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকভাবে

বিতর্কিত। বোস্টার ওই সাক্ষাৎকারে তাঁকে দারুণ অন্তরঙ্গ, বুদ্ধিদীপ্ত, এমনকি সমমনোভাবাপন্ন বলে বর্ণনা করেন। অথচ বোস্টার সেখানে থাকতেই কার্টার প্রশাসন মানবাধিকার বিষয়ে গার্সিয়া সরকারের আচরণের কঠোর সমালোচনা করে। ক্ষুব্ধ গার্সিয়া ১৯৭৭ সালে মার্কিন সামরিক সহায়তা আর নেবেন না বলে জানিয়ে দেন। পরের বছর মার্কিন কংগ্রেস দেশটির সাহায্য বন্ধ করে দেয়। যদিও বাস্তবে তার প্রভাব পড়েছে সামান্য। ১৯৭৭ সালে গুয়াতেমালায় মার্কিন সামরিক সাহায্য ২ দশমিক ৮ মিলয়ন থেকে ৩ দশমিক ৬ মিলিয়নে ডলারে উন্নীত হয়। মানবাধিকার-পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে বোস্টারের সময় গুয়াতেমালার ওপর মার্কিন কংগ্রেসের শুনানি বন্ধ ছিল।

এখানে আমরা দেখি যে বোস্টার যথার্থই একজন পেশাদার আমলা ছিলেন। খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দ্রুত সরাসরি সম্পর্ক তৈরিতে তাঁর কোনো সমস্যা হয়নি। গুয়াতেমালাতেও তাঁর তা হয়নি। জেনারেল গার্সিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার মূল যোগাযোগটা ছিল গার্সিয়ার সঙ্গে। অল্প বিরতিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো।' মানবাধিকার বিষয়ে গার্সিয়ার মতের সঙ্গে কতকটা সহমত হন বোস্টার। কিন্তু স্টুয়ার্ট কেনেডি যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার এই মনোভাব কি আপনি রিপোর্ট করেছিলেন?' বোস্টারের প্রথাসিদ্ধ উত্তর, 'গুয়াতেমালার সরকারি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম। এ বিষয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিনি।'

লরেন্স লিফশুলজ ২০০৫ সালের ১৬ আগস্ট *প্রথম আলোতে* লিখেছেন, 'এটি ছিল একটি অসাধারণ মুহূর্ত। একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত [বোস্টার] দুজন মার্কিন সাংবাদিকের কাছে অভিযোগ করছেন যে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে তাঁরই সিআইএ স্টেশন চিফ অভ্যুত্থানে সহায়তা দিয়েছেন।' ওই দুজন সাংবাদিকের অন্যতম হলেন মার্কিন সাংবাদিক কাই বার্ড।

তৃতীয় একজন

তবে সিআইএর সম্পৃক্ততা নিয়ে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরের কোনো এক স্থানে ডেভিস ইউজিন বোস্টার ও লরেন্স লিফশুলজের আলোচনার একজন সাক্ষী এখনো বেঁচে আছেন। তিনি কাই বার্ড। লিফশুলজ হংকং-ভিত্তিক *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর* দক্ষিণ এশীয় সাংবাদিক ছিলেন। আর কাই বার্ড প্রায় একই সময়ে 'বামপন্থী' মার্কিন সাময়িকী *দ্য নেশন* পত্রিকার কলামিস্ট ছিলেন। *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর* হয়েও কাজ করতেন তিনি।

বর্তমানে তিনি এই পত্রিকার প্রদায়ক সম্পাদক। পেরুর রাজধানী লিমায় বসবাস করেন। তাঁর স্ত্রী সুসান গোল্ডমার্ক লিমায় বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর। লিফশুলজ ছাড়া এখন কাই বার্ড হলেন অপর মার্কিন সাংবাদিক, যিনি বোস্টারের মুখে ওয়াশিংটনের পরারাষ্ট্র দপ্তরের লাউঞ্জে বসে মুজিব হত্যায় সিআইএর সংশ্লিষ্টতার 'বোমা ফাটানো' বিবরণটি শুনেছিলেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিফশুলজ নিশ্চিত করেন যে ওয়াশিংটনে এই আলোচনার সময় তাঁর সঙ্গে শুধু কাই বার্ড ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়ে ২০১২ সালের ২৮ অক্টোবর লেখক সুসান গোল্ডমার্ককে ই-মেইল করেছেন। উত্তর আসেনি।

কাই বার্ড আশির দশকের পর আগস্ট অভ্যুত্থান বিষয়ে *দ্য নেশন* বা অন্য পত্রিকায় কিছু লিখেছেন বলে জানা যায় না। *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ প্রকাশিত রাজনীতিকদের জীবনীবিষয়ক নিবন্ধের জন্য ২০০৬ সালে কাই বার্ড মর্যাদাসম্পন্ন পুলিৎজার পুরস্কার পান। লিমায় যাওয়ার আগে কাই বার্ড স্ত্রীর চাকরির সুবাদে নেপালে ছিলেন। 'কাই বার্ড ডট কম' নামে কাই বার্ডের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি এখনো। এক প্রশ্নের জবাবে ২০১০ সালের ১৬ আগস্ট নেপালের বিশ্বব্যাংক অফিসের জনসংযোগ কর্মকর্তা রাজীব উপাধ্যায় লেখককে নিশ্চিত করেন যে, কাই বার্ডের বাবা সাবেক মার্কিন কূটনীতিক ইউজিন এইচ বার্ড।

অভিযুক্ত বোস্টার

ডেভিস ইউজিন বোস্টার যে সময়টায় সিআইএ স্টেশন চিফ চেরির সম্পৃক্ততা বিষয়ে 'দুই মার্কিন সাংবাদিকের' কাছে তথ্য দিয়েছিলেন, তখন তিনি জানতেন যে তাঁকেও মুজিব হত্যার জন্য দায়ী করা হয়েছিল। আরও পরে ১৯৭৬ সালে তিনি হত্যার হুমকিও পেয়েছিলেন। কলকাতার *যুগান্তর* পত্রিকায় বোস্টারকে মুজিব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। মার্কিন কূটনীতিকেরা *যুগান্তর*কে কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। বোস্টারকে সিআইএর লোক হিসেবে গণ্য করা নিয়ে দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। *যুগান্তর*-এর প্রতিবেদন নিয়ে কলকাতা, দিল্লি ও মার্কিন দূতাবাস এবং ওয়াশিংটন পররাষ্ট্র দপ্তরের অবমুক্ত করা ওই সময়ের ছয়টি গোপন তারবার্তা থেকে এর প্রমাণ মেলে। ঢাকা

ডেটলাইনে *যুগান্তর*-এর প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'চিলির আসল খলনায়ক এখন ঢাকায়'। এতে বলা হয়, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বোস্টার দায়িত্ব নেন। তাঁর হাতে সব সময় একটা কালো অ্যাটাশে কেস থাকে। এটা ছাড়া তাঁকে কখনো দেখা যায় না। তাঁকে সেনানিবাসসহ বহু স্থানে দেখা যায়। সময়ে সময়ে সাংবাদিকদের তিনি নৈশভোজে ডাকেন। এই বোস্টারকে ইদানীং জেনারেল জিয়া-সমর্থক চক্রের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। চিলিতে আয়েন্দের বিরুদ্ধে সেনা অভ্যুত্থান ঘটানোর পটভূমি তৈরির সময় (আয়েন্দে নিহত হন ১৯৭৩ সালে) বোস্টার ছিলেন সেখানকার মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স।'

চিলিতে তিন দিন

২০ নভেম্বর ১৯৭৫ ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন আরভিং চেসল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে পাঠানো তারবার্তায় বলেন :

> বোস্টার ১৯ নভেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমানবন্দরে তিনি আমাদের বলেন যে ১৯৬২ সালে তিনি চিলিতে তিন দিন সময় কাটিয়েছিলেন। কিন্তু কখনো চিলির মার্কিন মিশনে ছিলেন না। আমি *যুগান্তর*-এর প্রতিবেদনটি গত সন্ধ্যায় ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার মি. দাসকে দেখালাম। তিনি একমত হলেন যে এটা ভালো সাংবাদিকতা নয়।

হেনরি কিসিঞ্জার ২০ নভেম্বর ১৯৭৫ দিল্লির মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দেন, 'আপনি ভারতকে জানিয়ে দেন যে এ ধরনের ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশের ঘটনায় আমরা দারুণভাবে অসন্তুষ্ট।' আগের দিন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি চিফ অব মিশন ভেঙ্কটেশ্বরণের কাছে বোস্টারকে 'ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের ঘটনায়' উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডল্‌ফ ডাবস। ১৯৭৫-৭৬ সালে তিনি নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া-বিষয়ক ডেস্কের দায়িত্বে ছিলেন।

১৮ নভেম্বর ১৯৭৫ চেসল ঢাকা থেকে পৃথক এক তারবার্তায় ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরকে বোস্টারের পাঠানো ঢাকা৫৩৮৮ নম্বর তারবার্তাটি স্মরণ করিয়ে দেন। ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ বোস্টারের পাঠানো এই তারবার্তায় বোস্টার ঢাকার তখনকার মার্কিনবিরোধী মনোভাব ব্যাখ্যা করেন। তিনি লিখেছেন :

> ৩ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশে মার্কিনবিরোধী মনোভাব আবার নতুন করে দানা বাঁধার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমরা এমন কথাবার্তা শুনছি যে রুশ-ভারতবিরোধী হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্র মোশতাককে সমর্থন দিয়েছে।

> মেজরদের 'পলায়নে' সহায়তা দিয়েছে এবং আমরা কোনো না কোনোভাবে কারাগারে চার নেতা হত্যার জন্য দায়ী।

বোস্টার ৬ নভেম্বরের ওই তারবার্তায় যা লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে ১৮ নভেম্বরের *যুগান্তর*-এর প্রতিবেদনের 'যোগসূত্র' দেখে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস অবাক হয়। মার্কিন কূটনীতিকদের ধারণা হয়, প্রতিবেদনটি যে সাজানো, এটাই তার প্রমাণ। বোস্টার তাঁর ৬ নভেম্বরের তারবার্তায় লিখেছেন :

> ঢাকার কূটনৈতিক কোরের ডিন হলেন বুলগেরীয় রাষ্ট্রদূত নিকোলাই বুয়েদিজিয়েভ। গতকাল [৫ নভেম্বর ১৯৭৫] তিনি আমাদের এক সহকর্মীকে বললেন, আমেরিকা ছাড়া আর কে আছে যে মুজিব ও চার নেতা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে ফায়দা নিতে পারে? এমনকি তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি এ-ও বললেন যে, চিলিতে আয়েন্দের বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকানোর সময় বোস্টার সেখানে ছিলেন।

বোস্টার ওই তারবার্তায় বলেন, দূতাবাসের একজন স্টাফ তাঁকে জানিয়েছেন যে ৫ নভেম্বর একটি ছোট মিছিল থেকে মোশতাকের ফাঁসি চাই স্লোগান শোনা যায়। একই সঙ্গে 'বোস্টার বাংলা ছাড়ো, আমরা বোস্টারের রক্ত চাই' স্লোগানও ধ্বনিত হয়। বোস্টার আক্ষেপ করেন যে ভবিষ্যতে আমাদের এ ধরনের মিছিলের মোকাবিলা শুধু নয়, বরং যেমনটা উল্লেখ করেছি, তেমন অনেক ধরনের নোংরা কথা শুনতে হবে।

ডেভিস বোস্টার মনে করতেন, 'মুজিব হত্যায় যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপ করার কারণ হলো, পাশ্চাত্যপন্থী ও রুশ-ভারতবিরোধী হিসেবে মোশতাকের "সুনাম" এবং বড় যেকোনো ঘটনায় সুযোগ পেলেই বাঙালিদের অদৃশ্য (এবং বাইরের শক্তির) হাত খুঁজে বেড়ানোর প্রবণতা।'

১৯৭৫-এর আগস্টে ঢাকায় নেপালের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স ছিলেন মিসেস শাহ। ১৯ আগস্ট ১৯৭৫ বোস্টার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় লিখেছেন :

> মিসেস শাহর মনোভাবটা দ্ব্যর্থক। তিনি মনে করেন, মুজিব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সিআইএ জড়িত এবং এর মধ্য দিয়ে ঢাকায় পূর্ব ইউরোপীয় অক্ষশক্তির প্রভাবের অবসান ঘটল। নতুন প্রেসিডেন্টকে [মোশতাক] তিনি ভারতবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেন। আর সম্ভবত সিআইএ সম্পর্কে তাঁর আবেগপ্রসূত অভিযোগ তিনি চেপে রাখেন। রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট কোনো দিকে ইঙ্গিত করতেও তিনি সতর্ক ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল ঝাঁজ মেশানো।

ফারসি ভাষায় প্রকাশিত *কেইহান* ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট বাংলাদেশের অভ্যুত্থান বিষয়ে এক দীর্ঘ অভিনব প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। তেহরান থেকে মার্কিন দূতাবাসের বার্তায় বলা হয় :

> পত্রিকাটি দাবি করেছে, ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে দুটো পাল্টাপাল্টি অভ্যুত্থান ঘটে। সোভিয়েতপন্থী অভ্যুত্থান শুরু হয় ভোররাত সাড়ে তিনটায়। এতে মুজিব নিহত হন। দক্ষিণপন্থীরা সাড়ে পাঁচটায় পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটায়। এতে বামপন্থী অভ্যুত্থানকারীরা নিহত হয়। রিপোর্টের সূত্র হিসেবে এএফপির নাম ছাপা হয়েছে। এএফপি বলেছে, বাংলাদেশ সরকার এই খবরের সত্যতা যাচাই করে দেখছে। ইরানের অন্য কোনো পত্রিকা অবশ্য অভ্যুত্থান-সম্পর্কিত এই ভাষ্য প্রকাশ করেনি।

গল্পটি এ রকম : সরকারের মস্কোপন্থী অংশ কয়েক মাস ধরে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিল। এর মধ্যে মুজিব যাঁদের মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করেছিলেন, তাঁরা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুস সামাদ আজাদ, কামারুজ্জামান, আবদুর রব, কোরবান আলী, মস্কোতে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত, মুজিবের দুই কাজিন শাহেদ ও মুনির এবং সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাঁরা বামপন্থী অভ্যুত্থানকারীদের সহায়তা দেন। এই গ্রুপের আশঙ্কা ছিল, মুজিব পাশ্চাত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। কিন্তু খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের পরাস্ত করেন।

এখানে উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদন কেন ও কী উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে তেহরানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কোনো মন্তব্য করেননি।

মোশতাক সরকারের স্বীকৃতির সংকট

কূটনীতিতে স্বীকৃতি একটি বড় বিষয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পরপরই তার কাছে বড় প্রশ্ন ছিল স্বীকৃতি লাভের। তবে সে স্বীকৃতি ছিল রাষ্ট্র হিসেবে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-পরবর্তী নতুন সরকারের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, কী করে বিদেশি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ ছিল খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। কিন্তু সে বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনে টানাপোড়েন ও নানা হিসাবনিকাশ ছিল।

নয়াদিল্লি থেকে রাষ্ট্রদূত স্যাক্সবি ১৯ আগস্ট ১৯৭৫ বোস্টারকে জানিয়ে দেন যে একদল বিদেশি সাংবাদিক দিল্লি থেকে ঢাকা যাচ্ছেন। তিনি তাঁদের একটি তালিকাও দেন। এর মধ্যে পশ্চিমা সাংবাদিকেরাও ছিলেন। বাংলাদেশ তখন একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে খাবি খাচ্ছিল।

ঢাকার সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট পর্যন্ত যেসব দেশ নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো : পাকিস্তান ১৫ আগস্ট, সৌদি আরব ১৬ আগস্ট, সুদান ১৬ আগস্ট, ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র ১৭ আগস্ট, যুক্তরাজ্য ১৮ আগস্ট, বার্মা ১৮ আগস্ট, জাপান ১৮ আগস্ট ও জর্ডান ১৮ আগস্ট।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অপরাহ্নে মুজিবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি তাঁর ভাষণে অভ্যুত্থানকে 'ঐতিহাসিক প্রয়োজন' বলে আখ্যা দেন।

ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার ১৯৭৬ সালের ৯ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলনে খন্দকার মোশতাক আহমদের দেওয়া বক্তব্য ওয়াশিংটনে পাঠান।

এতে তিনি উল্লেখ করেন, সাংবাদিকদের তীব্র প্রশ্নবাণের কবলে পড়েন মোশতাক। জেল হত্যাকাণ্ড প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য : 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাকে অপসারণের পর জেল হত্যাকাণ্ড ঘটে।' শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে তাঁর প্রতিক্রিয়া : 'বেশির ভাগ অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে।' মোশতাকের এই প্রকাশ্য অভিমতের বিষয়ে বোস্টার নিজের কোনো মন্তব্য জুড়ে দেননি।

মওলানা ভাসানী ছিলেন অন্যতম বিরোধীদলীয় বর্ষীয়ান নেতা, তিনি দ্রুত অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেন। পাকিস্তান ছিল প্রথম দেশ, যারা অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ৩ অক্টোবর ১৯৭৫ তারা বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পাকিস্তানের বিভক্তিকে সৌদি আরব দেখেছিল ইসলামের পরাজয় হিসেবে। সে কারণে তারা শেখ মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছিল না। সুদান, জর্ডান ও ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সৌদি আরবও মোশতাক সরকারকে দ্রুত স্বীকৃতি দেয়। ভারত ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইন্দিরা প্রশাসন অভ্যুত্থান-বিরোধীদের ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। ১৮ আগস্ট ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সঙ্গে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন। ২৪ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ২৫ আগস্ট মোশতাক ইন্দিরা গান্ধীকে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁর সরকার ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। ৩১ আগস্ট চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই মোশতাকের কাছে পাঠানো এক বার্তায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন এবং ৪ অক্টোবর দুদেশ রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। তবে এটা লক্ষণীয় ছিল যে, মোশতাকের মন্ত্রিসভায় শুধু একজন বাদে আর সবাই শেখ মুজিবুর রহমানের বিলুপ্ত মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

মুজিবের সাড়ে তিন বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও সন্দেহ-সংশয় থেকেই গিয়েছিল। এ অঞ্চল সম্পর্কে সিআইএর ১৯৭৩ সালের মূল্যায়ন :

> সোভিয়েতরা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক ব্যাপকতায় ভারতে আসন গেড়েছে। তবে ভারতের অর্থনৈতিক বোঝা তারা কাঁধে নেবে না। তাই বেশি রকম ঘনিষ্ঠও হবে না। কারণ, তাতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রক্ষা কঠিন হবে। ভারতীয়রাও সোভিয়েতের তাঁবেদার রাষ্ট্র হওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে না।

১৯৭৩ সালে তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত সামরিক নীতি-সংক্রান্ত সিআইএর একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছিল :

> চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে ডুবে যাওয়া জাহাজ ও মাইন থেকে মুক্ত করছে সোভিয়েত নৌবাহিনী। ভারত মহাসাগরে মোতায়েন করা রণতরি থেকে

উদ্ধারকারী এই জাহাজগুলো ভিন্ন। বাংলাদেশে রুশ নৌ-উপস্থিতি সৃষ্টি করার চেয়ে তারা বরং সহায়তা মিশনেই রয়েছে। তবে এর মাধ্যমে সোভিয়েতরা অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের জলসীমায় উপস্থিত থাকার একটি নজির স্থাপন করেছে। মাইন অপসারণের পর ভারত মহাসাগরে থাকা যুদ্ধজাহাজগুলোকে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সুবিধাদি প্রদানের চেষ্টা হতে পারে। চট্টগ্রামে একটি Amur Class মেরামত জাহাজ রয়েছে। বাংলাদেশ Kynda Class যুদ্ধজাহাজকে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় জায়গা করে দিতে পারে।

এটা লক্ষণীয় যে, সিআইএ রিপোর্ট দেখাচ্ছে, ১৯৬৬-৭০ সালে পাকিস্তানে সোভিয়েত অস্ত্র সহায়তার পরিমাণ ছিল ৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৭১-৭৫ সালে এটা হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশে ৩৫ মিলিয়ন ডলার আর পাকিস্তানে মাত্র ৪ মিলিয়ন ডলার। ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ৮০ জন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ওই সময়ে পাকিস্তানের প্রশিক্ষণার্থী ছিল মাত্র পাঁচজন। সিআইএ তার ওই প্রতিবেদনে আরও বলেছে :

দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের প্রতি বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। কারণ, ভারতের অবস্থান, আকার এবং জনসংখ্যা। এ ছাড়া ভারতকে তারা চীনের কাউন্টারওয়েট বা ভারসাম্য হিসেবেও দেখেছে। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে সোভিয়েতরা একটি আঘাত পায়। কারণ, দেশটির পরিবর্তিত নেতৃত্ব মস্কোর প্রতি কম সহানুভূতিশীল ছিল।[১]

বাকশাল কায়েমের পর বোস্টার ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ লিখেছেন : 'মুজিবকে আমাদের আপাতত সন্দেহের সুবিধা দেওয়া উচিত হবে, যদিও তাতে বড় ধরনের সতর্কতা ও বিচক্ষণতা থাকতে হবে। আমাদের মৌলিক অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আনার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।' তিনি আরও বলেন, একটি বিষয় নিশ্চিত যে, মুজিবের হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা রয়েছে। হয়তো তিনি তা দয়ালুভাবে প্রয়োগ করবেন। সাংবিধানিক বিরোধিতাকে অসম্ভব করে তোলার মাধ্যমে তিনি এমনকি তাঁর দায়িত্বশীল সমালোচককেও বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন। উপরন্তু তাদেরও তিনি খেপিয়ে তোলার ঝুঁকি নিয়েছেন, যারা সংবিধানবহির্ভূত উপায়ে অগ্রসর হতে সক্ষম।[২]

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫। তারিখ ছাড়া দিনটি ছিল শনিবার। বঙ্গবন্ধু এ দিন বোস্টারের সঙ্গে ৪০ মিনিট ধরে কথা বলেন। বোস্টারের সঙ্গে পলিটিক্যাল

---

১. *National Intelligence Estimate Soviet Military Posture and policies in the third world*, 2/8/1973 Vol. I, P. 31, para 18, P. 17.
২. 'শেখ মুজিব : নতুন মোগল', ডকুমেন্ট নং ১৯৭৫ঢাকা০৬৬৬।

কাউন্সিলর কোচরান ছিলেন। মুজিবের সঙ্গে এই বৈঠক প্রসঙ্গে বোস্টার লিখেছেন :

> আমি মুজিবকে পিএল ৪৮০-এর আওতায় অতিরিক্ত সাড়ে তিন লাখ টন গম সরবরাহের কথা বললাম। মুজিব আশ্বস্ত হলেন। তিনি ভাবলেন, অন্তত জুন পর্যন্ত এই গম দিয়ে পরিস্থিতি সামলানো যাবে। তিনিও এ সময়ের মধ্যে সোয়া লাখ টন গম আনতে পারবেন বলে জানালেন। তাঁকে আইএমএফের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে বলি। কিন্তু তিনি তাতে আগ্রহ দেখালেন না। পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী আমি তাঁর কাছে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন অস্ত্রনীতি ব্যাখ্যা করি। মুজিব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে তিনি মার্ক্সবাদী নন। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করি যে, ভুট্টোর সঙ্গে আমরা পাকিস্তানে নৌ বা বিমানঘাঁটি স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করিনি।

বোস্টার মন্তব্য করেন :

> এটা খুবই লক্ষণীয় যে, মুজিব সতর্ক ছিলেন আমরা যেন ভেবে না বসি যে তিনি গণতন্ত্র হত্যা করেছেন। সরকারকাঠামো বদলে ফেলার বিষয়ে আমাদের মনোভাব জানতে তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এ বিষয়ে আমাদের মনে সোভিয়েত মডেল অনুসরণের বিষয়টি আসতে পারে ভেবে মুজিব বলেন, তিনি মার্ক্সবাদী নন। নতুন ব্যবস্থার ফলে তাঁর কোনো নীতিরই পরিবর্তন ঘটবে না।

বোস্টার মুজিবকে জানান, কিসিঞ্জার ভুট্টোকে বলেছেন, কোনো শর্ত ছাড়াই বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি। মুজিব এ জন্য বোস্টারকে ধন্যবাদ জানান। বলেন, এর ফলে বাংলাদেশ উপকৃত হবে। বোস্টারের কথায় 'মুজিবকে দৃঢ় এবং শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী এবং অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে উচ্ছল মনে হয়েছে।'

মোশতাকের প্রতি সহানুভূতি

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ঢাকায় তাদের দূতাবাসে একটি প্রেস গাইডলাইন প্রেরণ করে। এ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের উভয় সংকট ফুটে ওঠে। প্রেস ব্রিফিং-সংক্রান্ত কেব্‌লটির তরজমা নিচে দেওয়া হলো।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের নতুন সরকারকে কি যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে?

উত্তর : এ প্রশ্ন সত্যি এখনো আসেনি। অভ্যুত্থানের পর মাত্র ২৪ ঘণ্টা পেরিয়েছে। আমরা পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করছি। কিন্তু

বোধগম্য কারণেই সেখানকার চিত্র পুরোটা পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত এক সরকারি ঘোষণায় সব শান্তিপ্রিয় জাতিকে তাদের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু স্বীকৃতির প্রশ্নে আমরা সরাসরি কোনো অনুরোধ পাইনি। সে কারণেই বাস্তব অর্থে কোনো স্বীকৃতির প্রশ্ন এখনো ওঠেনি।

নতুন সরকারের কোনো কর্মকর্তার কাছ থেকে আমরা অনুরোধ পাইনি। কিন্তু যখন আমরা অনুরোধ পাব, তখন আমরা তাঁদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রস্তুত থাকব।

এ বিষয়ে আপনারা নাইজেরিয়ার পরিস্থিতি স্মরণ করতে পারেন। সেখানে সরকার পরিবর্তন ঘটার পর তাদের স্বীকৃতি দিতে প্রক্রিয়াগত সময় লেগে যায়।

প্রশ্ন : তার মানে স্বীকৃতি একটা অব্যাহত বিষয়। সরকারের পরিবর্তন কোনো বিষয় নয়। কথাটা সত্যি?

উত্তর : ওখানে (বাংলাদেশে) যে পরিস্থিতি, তাতে এটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন। আপনারা তো জানেন, স্বীকৃতির প্রশ্ন এখনো আসেনি। তারা আমাকে বলেনি।

প্রশ্ন : নতুন শাসকদের সঙ্গে কি দূতাবাসের ইতিমধ্যেই যোগাযোগ ঘটে গেছে?

উত্তর : না। আমি যত দূর জানি, আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই, ছিল না।

প্রশ্ন : নতুন গ্রুপটি কি পাকিস্তানের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপনে আগ্রহী?

উত্তর : আমি মনে করি না যে আমরা তেমন ধরনের কোনো মূল্যায়ন এখনো করেছি।

প্রশ্ন : আপনি কি বলবেন, নতুন সরকার আমেরিকাপন্থী?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনি কি বাংলাদেশ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবেন এবং তারা অনুরোধ জানালে আমাদের অবহিত করবেন?

উত্তর : আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : নাকি আর পাঁচটা দেশের মতো এ ক্ষেত্রেও অন্য কোনো দেশের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসবে?

উত্তর : আমি আবারও বলব, আমি এ বিষয়ে অনুমান করতে পারছি না।

'বাংলাদেশ অভ্যুত্থান : স্বীকৃতি' শীর্ষক প্রথম তারবার্তাটি ডেভিস

ইউজিন বোস্টার ঢাকা থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠান ১৭ আগস্ট। সেটা নিচে তুলে ধরা হলো :

> নতুন সরকারের কাছ থেকে আজ সকালে আমরা বার্তা পেয়েছি। স্বীকৃতির বিষয়টি মাথায় রেখে নতুন সরকার ১৬ আগস্ট বিদেশি মিশনগুলোর জন্য একটি সার্কুলার নোট জারি করে। সেটি এ রকম: 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি মিশনসমূহকে তার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এবং সসম্মানে অবহিত করছে যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকালে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে মোশতাক একই দিনে একটি বেসামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। জাতির প্রতি দেওয়া এক ভাষণে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং রাজনৈতিক চক্রান্ত, যা কিনা দেশকে গ্রাস করতে চলেছিল, তা থেকে বাঁচানোর জন্য প্রেসিডেন্ট সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেছেন। প্রেসিডেন্ট পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি, সমতা এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বিদ্যমান সব দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারেও আশ্বাস দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট আরও ঘোষণা করছেন যে, তাঁর সরকার জাতিসংঘের সনদ ও তার নীতিসমূহের প্রতি পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে।'

এখানে উল্লেখ্য, বোস্টার ১৮ আগস্ট 'নতুন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রথম বৈঠক' শীর্ষক একটি তারবার্তা পাঠান। এতে তিনি বলেন :

> নতুন সরকার গঠনের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের স্বীকৃতি চাইল। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে অনুষ্ঠিত বৈদেশিক মিশনপ্রধানদের বৈঠক থেকে আমি সবে ফিরে এলাম। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমেদ ব্রিফিং দিলেন। সোভিয়েত, ভারতীয়সহ প্রায় সব মিশনপ্রধানই উপস্থিত ছিলেন।
>
> ১৬ আগস্টে সরকারের জারি করা সার্কুলার নোটের আলোকেই পররাষ্ট্রসচিব পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। ফখরুদ্দীন আহমেদ বলেন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে দেশকে রক্ষা করতেই এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।
>
> প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিল প্রায় পুরোপুরি তারবার্তা ও অন্যান্য ধরনের যোগাযোগসংক্রান্ত। এমনকি ইতালীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের ঘটনাও ঘটে। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক

> যোগাযোগ রক্ষা অধিকারের ব্যত্যয় ঘটছে, যা কিনা জেনেভা কনভেনশনের লঙ্ঘন। পররাষ্ট্রসচিব বলেন, এসব বিষয়ের প্রতি জরুরি ভিত্তিতে নজর দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল পুনরায় শুরু করা-সংক্রান্ত আমার এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রসচিব আশ্বস্ত করেন, ১৯ আগস্ট দুপুরের মধ্যেই এ বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন।
>
> তবে সপ্তাহজুড়ে নতুন সরকারের নিম্নপর্যায়ের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলাম। এবং আজ নিরাপত্তা, প্রশাসনিক অন্যান্য অপারেশনাল বিষয়ে যোগাযোগ সক্রিয় হলো। তাই এখন থেকে আমরা মিশনের স্বাভাবিক কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের আশা করতে পারি।

১৮ আগস্ট বোস্টার জানান, 'ব্রিটিশ হাইকমিশনার বেরি স্মলম্যান আমাকে বলেছেন :

> নতুন সরকারকে স্বীকৃতির বিষয়ে তিনি তাঁর পররাষ্ট্র দপ্তরের সাড়া পেয়েছেন। একেবারে চুপেচাপে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা হবে মাত্র। আর একান্তই যদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ জন্য তাঁকে তলব করে, তাহলে তিনি স্বীকৃতির বিষয়টি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবেন। কানাডীয় চার্জ দি অ্যাফেয়ার্সও অবশ্য আমাকে বলেছেন, তিনি অটোয়াকে জানিয়েছেন যে, নতুন সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এবং তিনি সুপারিশ করেছেন, তাঁরা সরকারি যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন এবং সেটাই কার্যত স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হবে।

১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট আন্ডার সেক্রেটারি সিসকো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা সার্কুলার নোটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ্য মার্কিন অবস্থান কী হবে তা জানিয়ে একটি দিকনির্দেশনা দেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বাংলাদেশ সরকারকে সন্তুষ্টির সঙ্গে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, তারা দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট সব চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহের প্রতি সম্মান দেখাবে। এবং জাতিসংঘ সনদ ও মূল নীতিসমূহের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে সংকল্পবদ্ধ।' সিসকো এরপর মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের বিষয়ে আমাদের ইতিপূর্বের গাইডলাইনের সঙ্গে এই নতুন নির্দেশনা সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংবাদপত্রের কাছ থেকে আমাদের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য চাওয়া হলে আমরা কিন্তু নতুন সরকারকে অব্যাহত স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিকে কম গুরুত্ব দিতে প্রয়াস পাব। একই সঙ্গে আমরা এ মর্মে গুরুত্ব দেব যে, আমরা নতুন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছি।

১৮ আগস্ট ১৯৭৫ অপরাহ্নে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের নির্ধারিত প্রেস ব্রিফিং ছিল। এ জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়। এতে বলা হয়,

'সপ্তাহজুড়ে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ওপর আমরা অনেক প্রশ্ন পেয়েছি। ওই সময়ে আমাদের কাছে কেবল তাঁর মৃত্যুর অসমর্থিত খবর ছিল।'

এখানে লক্ষণীয়, পঁচাত্তরের ১৮ আগস্ট সাংবাদিকদের সামনে মুজিবের মৃত্যুর খবর 'অসমর্থিত' বলা হলেও এখন মার্কিন দলিলই সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান চলাকালেই খবর পাচ্ছিল এবং তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। ওই গাইডলাইনে বলা হয় :

> আমরা ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যুর খবরের সত্যতা যাচাই করেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করছে। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাঁর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বহু বন্ধু শোক প্রকাশ করেছেন।

লক্ষণীয়, এতে অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ড শব্দ নেই। এমনকি নিন্দা পর্যন্ত জানানো হয়নি।

সন্দেহাতীতভাবে কিসিঞ্জার মোশতাক সরকারের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাতে যে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ জড়িত ছিল তা-ও স্পষ্ট। ২০ আগস্ট, সন্ধ্যা ছয়টা ১১ মিনিট। টেলিফোনে কিসিঞ্জারের কথা হয় হ্যারল্ড স্যান্ডার্সের সঙ্গে। স্যান্ডার্স ১৯৭৪ সালে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের স্টাফ ছিলেন। ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে তিনি নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশীয় বিভাগের উপসহকারী ছিলেন।

> কিসিঞ্জার : দুটি বিষয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা বাংলাদেশকে (মোশতাক সরকারকে) স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমি যদিও জানি, আমেরিকাপন্থী হতে তাদের অসুবিধা রয়েছে।
>
> স্যান্ডার্স : আমরা তাদের সঙ্গে রুটিন যোগাযোগ রাখতে যাচ্ছি।
>
> কিসিঞ্জার : আপনি কি তারবার্তা দেখেছেন?
>
> স্যান্ডার্স : না।
>
> কিসিঞ্জার : একটা তারবার্তা এসেছে, যেখানে দেখা যায়, তারা আমাদের নৈতিক সমর্থন চাচ্ছে। আমরা কি তাদের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ উত্তর দিতে পারি? আমি বলতে চাই যে, আমরা খুশি হব যদি তাদের নিশ্চিত করতে পারি যে আমরা তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছি। আগামীকালের প্রেস ব্রিফিংয়ে আমরা কি একটি প্রশ্ন সাজাতে পারি?
>
> স্যান্ডার্স : সেটা সম্ভব বলে মনে করি।
>
> কিসিঞ্জার : আমরা একটা রেকর্ড রাখতে চাই যে, আমরা আমাদের

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকব। আপনি এটা নিশ্চিত করবেন যে, আগামীকালই এর রেকর্ড নিশ্চিত করা হবে।

স্যান্ডার্স: আমরা ইতিমধ্যে এটা স্পষ্ট করেছি যে, আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলব।

কিসিঞ্জার: আমি আশা করি, পররাষ্ট্র দপ্তর এটা পরিষ্কার করবে যে, আমরা তাদের স্বীকৃতি দিই।

স্যান্ডার্স: আচ্ছা। ঠিক আছে।

কিসিঞ্জার একই দিনে (২০ আগস্ট) বোস্টারের কাছে প্রেরিত একটি গোপনীয় তারবার্তায় স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নে মার্কিন সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। সেটি নিচে দেওয়া হলো:

১. পররাষ্ট্র দপ্তর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অব্যাহতভাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রশ্নটি পাশ কাটাতে চায়। আমরা পরিকল্পনা করেছি, আমাদের প্রকাশ্য অবস্থান হবে যে, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আমরা স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখছি। তবে রাজনৈতিক এবং মনস্তত্ত্বগত পুনর্নিশ্চিতকরণের জন্য প্রেসিডেন্ট মোশতাক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির বিষয়ে যে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, তা আমরা সমর্থন করি। এখন বাংলাদেশ সরকার যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা পদক্ষেপকে স্বীকৃতি হিসেবে চিহ্নিত না করে প্রকাশ্যে এমন দাবি করে যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে সেটাই 'স্বীকৃতির' জন্য যথেষ্ট, এবং স্বীকৃতির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ তারা নিষ্প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে, তাহলে পররাষ্ট্র দপ্তরের তাতে কোনো আপত্তি থাকবে না। বাংলাদেশে সরকার যদি এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যা বা বিবৃতি জনসমক্ষে প্রকাশ করে, তাহলে পররাষ্ট্র দপ্তর তার বিরোধিতা করবে না। বরং যদি গণমাধ্যম থেকে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়, তাহলে অভিন্ন বিবৃতি প্রকাশ করবে।

২. বাংলাদেশ সরকারকে আপনার এটাও বলে দেওয়া উচিত যে, এমনকি বাংলাদেশ সরকার যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিষয়ে কোনো ঘোষণা না-ও প্রদান করে, তাহলেও গণমাধ্যম থেকে কোনো প্রশ্ন এলে আমরা এ ধরনের বিবৃতি দিতে প্রস্তুত রয়েছি। যা হোক, এ বিষয়ে প্রেসের পক্ষ থেকে কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন আসবে বলে আমরা মনে করি না।

৩. যুক্তরাষ্ট্র সরকার সহজে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে চায় না। এটা এড়াতে যত দূর সম্ভব বেশি সময় নেওয়া তার অন্যতম লক্ষ্য। কারণ যেসব নতুন সরকার সংবিধানবহির্ভূত পন্থায় ক্ষমতায় আসে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের সরাসরি স্বীকৃতি দিতে চায় না।

৪. আমাদের এই অবস্থান গ্রহণকে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপর কোনো প্রকারের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা উচিত হবে না। আমরা আশা করি, দুদেশের মধ্যে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি হবে। আপনার উচিত হবে প্রেসিডেন্ট মোশতাককে এই শেষের কথাটির ওপর জোর দিয়ে বলা এবং এ বিষয়ে তাঁকে পুনরায় নিশ্চিত করা। কিসিঞ্জার।[৩]

ভারত

২২ আগস্ট ১৯৭৫ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রস্তুত বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে বাংলাদেশেরও উল্লেখ রয়েছে। রবিনসনের স্বাক্ষরিত এই বিশ্লেষণে উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতিদানের কোনো পরিকল্পনা ভারতের নেই। দিল্লি মনে করে, বিভিন্ন বিদেশি মিশনের জন্য ঢাকা যে সার্কুলার নোট জারি করেছে তার উত্তর প্রদান এবং দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তারা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্যভাবে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

চীন

১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট পিকিংয়ে (বর্তমান বেইজিং) ছিলেন ওই সময় জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বুশ। তিনি ওয়াশিংটনকে জানান :

> নির্দেশনা অনুযায়ী আজ [১৬ আগস্ট] বেলা ১১টায় আমি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং হাই জুং-এর সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করি। পুয়ের্তোরিকো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর বাংলাদেশ নিয়ে কথা হলো। তবে ঢাকার অবস্থা সম্পর্কে আমরা কেউ তেমন কিছু জানতাম না। বললাম, দুপুর একটায় খাবারের সময়ে এ নিয়ে কথাবার্তা বলব।

নেপাল

১৮ আগস্ট কায়রোর মার্কিন দূতাবাস ওয়াশিংটনকে জানায় :

> গত রাতে নেপালের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভাবনা-চিন্তার কথা জানতে চান। তিনি বলেন, তাঁর

---

৩. ডকুমেন্ট নাম্বার : ১৯৭৫স্টেট১৯৮১১৯।

সরকার বুঝতে পারছে না, নতুন সরকারকে নতুন করে স্বীকৃতি দেওয়ার দরকার আছে কি না? আদিষ্ট হয়ে তিনি মিসর সরকারের কাছে তাদের অবস্থান জানতে চেয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছে, যদি বাংলাদেশ সরকার নতুন করে স্বীকৃতি চায়, তাহলে তারা তা দেবে। অন্যথায় আগের প্রদত্ত স্বীকৃতিই প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। আমি নেপালি রাষ্ট্রদূতকে বললাম, আমি বিস্তারিত জানি না। নেপালে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত (১৯৭৩-৭৬) উইলিয়াম কার্গো নিশ্চয় এ বিষয়ে বলতে পারবেন। তবে মিসর সরকারও হয়তো এই প্রশ্ন তুলতে পারে। তাই নতুন বাঙালি সরকারের প্রতি আমাদের অবস্থান কী হবে সে বিষয়ে জানাতে পারেন।

নেপালের মার্কিন দূতাবাস থেকে মি. কার্গো ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান বিষয়ে নেপালের মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। কার্গো যা লিখেছেন, তা হুবহু নিচে তুলে ধরা হলো :

১. নেপাল সরকারের সকল স্তরের কর্মকর্তারা প্রতিবেশী বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে ভারত কতটা কী মাত্রায় সরাসরি নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। নেপালিদের মধ্যে রাজা থেকে শুরু করে নিম্নপর্যায়ের কর্মকর্তা পর্যন্ত সবারই আমাদের কাছে একটাই জিজ্ঞাসা, আমরা এমন ভাবছি কি না যে, বাংলাদেশে ভারতীয় হস্তক্ষেপ আসন্ন। আমরা তাদের বলার ক্ষেত্রে এই অবস্থান নিয়েছি যে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক ইউনিটগুলোর মধ্যে সামরিক সংঘাতের অনুপস্থিতিতে আমরা মনে করি যে এই মুহূর্তে ভারতীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

২. নেপাল বাংলাদেশের নতুন সরকারকে প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে ভারত যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, সেটা বিবেচনায় নেপাল সরকারের উদ্বেগ আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে নেপাল ভারতের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেনি কিংবা তাকে আগেভাগে কিছু জানায়নি। সে কারণে নেপালের ভারতীয় দূতাবাস নেপাল সরকারের কাছে তাদের অসন্তোষ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক দিল্লি সফরের মধ্য দিয়ে সুসম্পর্কের যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, তা কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছে।

৩. বাংলাদেশে ভারতীয়রা সরাসরি জড়িত হবে না ধরে নিয়ে নেপালিরা ঢাকার সরকার পরিবর্তনে সংগত কারণেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। যদিও তারা একই সঙ্গে মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তাদের নিন্দা প্রকাশ করেছে এবং তারা এ কথাও বলেছে যে

> নিহতদের প্রতি তাদের ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। কিন্তু এখন নেপাল সরকার বাংলাদেশের নতুন সরকার কর্তৃক চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘোষণাকে স্বাগত জানায়। নেপাল স্বাভাবিকভাবেই অন্য একটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থানকে সুনজরে দেখতে প্রস্তুত, যে আঞ্চলিক শক্তি জোটনিরপেক্ষ এবং তার নিজের এবং ভারতের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে আগ্রহী। নেপাল সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। এবং তারা আশাবাদী যে মুজিব সরকারের সঙ্গে একটি ট্রেড অ্যান্ড ট্রানজিট চুক্তি বিষয়ে তাদের যে আলাপ-আলোচনা চলছিল, তা এখন বাস্তবে রূপ লাভ করবে। বাংলাদেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা হবে এবং নেপাল যত দূর সম্ভব ঢাকার নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ও একযোগে কাজ করবে।

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার মার্কিন দূতাবাস থেকে ভ্যান হোলেন ১৯ আগস্ট ১৯৭৫ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানান, শ্রীলঙ্কা সরকার বাংলাদেশের পরিবর্তনের বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো বিবৃতি দেয়নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে বলেছেন :

> আমি রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা কিংবা রাজনৈতিক খুন, বিশেষ করে যাঁরা তাঁদের জাতির সেবা করেছেন তাঁদের হত্যার সম্পূর্ণরূপে বিরোধী। এটা অবশ্য মানবতার মৌলিক ধারণার পরিপন্থী [illegible]বতার মৌল নীতিরও পরিপন্থী। শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর [illegible]রের কতিপয় সদস্যকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাতে আমি গভীর[illegible] শোকাহত।

সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী মিসেস বন্দরনায়েকে এর আগে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

ট্রটস্কিপন্থী লঙ্কা সম সমাজ পার্টি (এলএস[illegible]পি), সরকারের শরিক দলগুলোর অন্যতম। দলটি ১৮ আগস্ট প্রচারিত এ[illegible] বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার জন্য বাংলাদেশের নতুন শাসকদের সমালোচনা করেছে তারা বলেছে, বাংলাদেশের পরিবর্তন একটি সাম্[illegible]দী নীলনকশার অংশ। ভারতে মিসেস গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করার সঙ্গে [illegible]মল রয়েছে। শ্রীলঙ্কার দৈনিক সংবাদপত্রগুলো বিবৃতিটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে। শ্রীলঙ্কার মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র *আথথা* ১৮ আগস্ট এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে 'নিষ্ঠুর এবং অমানবিক হত্যাযজ্ঞ' হিসেবে বর্ণনা

করেছে। তারা নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করেছে যে, মুজিবকে উৎখাতের ঘটনায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে সিআইএ। এতে সমর্থন করেছে চীন এবং অর্থায়ন করেছে মার্কিন পিএল ৪৮০ তহবিল। পত্রিকাটি মনে করে :

> বাংলাদেশের ঘটনা দক্ষিণ এশিয়াকে অস্থিতিশীল করা ও এখানকার সরকার উৎখাতের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মিসেস গান্ধী ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দমননীতি চালানোর আগে সেখানে একই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। আর এখন শ্রীলঙ্কাও একই অভিন্ন হুমকি মোকাবিলা করছে।

এ পর্যায়ে শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভ্যান হোলেন মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু তারা পরস্পরের মধ্যে এখনো কোনো কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করেনি। তারা নয়াদিল্লির মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ রাখছে। এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের কর্মকর্তা আমাদের জানিয়েছেন যে, ঢাকা ও কলম্বোর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে দুই মাস ধরে একটা আলাপ-আলোচনা চলছিল। মোটামুটি এটা ঠিক হয়েছিল যে দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতগণ একই সঙ্গে কলম্বো ও ঢাকায়ও দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করবেন। তিনি মনে করেন না যে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কারণে এই সমঝোতা ব্যাহত হবে।

ভুটান

আমাদের জানামতে, ভুটানই একমাত্র দেশ, যারা ১৫ আগস্টেই মুজিব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উষ্মা প্রকাশ করেছিল। ১৫ আগস্ট জাতিসংঘে নিযুক্ত ভুটানের স্থায়ী প্রতিনিধি দাগো সেরিং রাজনীতিবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৭৪-৭৫) জোসেফ সিসকোর সঙ্গে বৈঠকে মুজিব হত্যাকাণ্ডকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে বর্ণনা করেন। সেরিংয়ের সঙ্গে ছিলেন দ্বিতীয় সচিব গারাং। মার্কিন পক্ষে সিসকোর সঙ্গে ছিলেন নিকটপ্রাচ্য বিভাগের উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাবস এবং কান্ট্রি অফিসার লোরটন।

ভুটানের স্থায়ী প্রতিনিধির কাছে সিসকো বাংলাদেশের অভ্যুত্থান এবং ভারত ও চীনের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চান। মি. সোরিং গোড়াতেই মুজিব হত্যাকাণ্ডকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, মুজিব কঠিন পরিশ্রম করছিলেন এবং জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এরপর কী ঘটতে পারে, সে জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সিসকো

স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবের ভূমিকা স্মরণ করেন। বলেন, 'এটা বিস্ময়কর যে, তাঁকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে, বাংলাদেশ নানামুখী অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়েছিল এবং মুজিবের প্রশাসনিক অসামর্থ্য গোপন ছিল না।'

সিসকো নিশ্চিত করেন :

> দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমরা সিমলা চুক্তির বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়াকে সমর্থন করি। কারও স্বাধীনতা বিপন্ন হোক বা কেউ অন্যের ওপর প্রভুত্ব করুক, তা আমরা দেখতে চাই না। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে আমরা প্রকাশ্যে এবং গোপনেও শত হাত দূরে থাকছি। বাংলাদেশে আমাদের মুখ্য স্বার্থ হলো মানবিক। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমরা সহযোগী। এই এলাকায় স্থিতিশীলতা বজায় থাকার মধ্যেই আমাদের স্বার্থের সবচেয়ে বেশি সুরক্ষা হয়।

বার্মা

১৮ আগস্ট প্রতিবেশী বার্মা নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এ বিষয়ে বার্মার মার্কিন দূতাবাস ১৯ আগস্ট ওয়াশিংটনকে জানায়, ঢাকায় সত্যি কী ঘটেছে, সে বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা নিশ্চিত নন বলে তাঁরাই উল্লেখ করেছিলেন। অথচ এখন তারা দ্রুত স্বীকৃতি দিল। তবে যা-ই হোক, তাদের এই উদ্যোগের কারণ হলো, তাদের বাস্তবতার সঙ্গে বসবাসের নীতি। নিকটতম প্রতিবেশী সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করার তাগিদও তাদের বিবেচনার বড় কারণ।

২৭ আগস্ট ১৯৭৫ রেঙ্গুনের (বর্তমান ইয়াঙ্গুন) মার্কিন দূতাবাস থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি তারবার্তা পৌঁছায়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানের বিশেষ দূত যোগাযোগমন্ত্রী মমতাজ আলী ভুট্টো ২২ আগস্ট রেঙ্গুনে তাঁর তিন দিনের সফর শেষ করেছেন। তিনি তাঁর সফরকালে প্রেসিডেন্ট নে উইন, প্রধানমন্ত্রী সেইন উইন এবং বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন। তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়নি। বার্মার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র অস্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশের ঘটনাবলির সঙ্গে তাঁর এই সফরের কোনো সম্পর্ক আছে। অবশ্য এমন জল্পনাকল্পনা রয়েছে যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি আসনের জন্য পাকিস্তান তার প্রার্থিতার অনুকূলে বার্মার সমর্থন কামনা করেছে।

সোভিয়েত ও কেজিবির ভূমিকা

শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তৎকালীন দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের অবস্থান ও মূল্যায়ন জানতে সচেষ্ট ছিল। ওই হত্যাকাণ্ডের পরপরই কেজিবি সিআইএর বিরুদ্ধে 'ভিত্তিহীন' প্রচারণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই দাবি করা হয়েছে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির সপক্ষত্যাগী সাবেক আর্কাইভ কর্মকর্তা ভাসিলি মিত্রখিন প্রদত্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে লেখা *দ্য কেজিবি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড* বইয়ে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-সিক্সের তদারকিতে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ প্রকাশিত এই 'মিত্রখিন আর্কাইভ'-এর তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই ঝড় বয়ে যায়।

এই বইয়ের লেখকের অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, মিত্রখিনের ওই দাবি সত্ত্বেও মুজিব হত্যার ব্যাপারে সিআইএর দায়মুক্তি ঘটছে না। কারণ, মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএ জড়িত নয়—কেজিবি এ সম্পর্কে কীভাবে নিশ্চিত ছিল সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এ ছাড়া মুজিব হত্যায় কারা জড়িত, সে ব্যাপারেও মিত্রখিন আর্কাইভের এ পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যে কোনো ইঙ্গিত নেই।

তবে ঢাকায় প্রবীণ সিপিবি নেতারা লেখকের কাছে এই মর্মে তথ্য প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ওই সময়ে তাঁদের প্রশ্নের একটি জবাব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে কারা জড়িত? কীভাবে এটা ঘটল? সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এর উত্তরে বলেছিল, আওয়ামী লীগ সরকারকে অস্থিতিশীল করতে সিআইএ ভূমিকা রাখলেও মুজিব হত্যায় তাদের হাত নেই। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এমন বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে তাঁদের কেউ কেউ বরাবরই সন্দিহান ছিলেন। এ ব্যাপারে সিপিবি সম্পাদকমণ্ডলীর সাবেক সদস্য অজয় রায়

বলেন, 'আমাদের সেই সন্দেহ-সংশয়ের যৌক্তিকতা পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কেজিবি যে কতটা অনভিজ্ঞ গোয়েন্দা সংস্থা, তা আমরা আফগান ইস্যুতে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।' সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক অবশ্য বলেন, 'এ ব্যাপারে লরেন্স লিফশুলজের বক্তব্য কিংবা সোভিয়েত পার্টির অবস্থান কোনোটিকেই কিন্তু আমরা নাকচ করতে পারি না।' এ ব্যাপারে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) বর্তমান সভাপতি মনজুরুল আহসান খানের বক্তব্য :

> সোভিয়েত পার্টি বলেছিল, সিআইএ মুজিব হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তা নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা এটাও বলে দিয়েছে যে, সিআইএ অন্য কোনোভাবেই জড়িত নয় বা থাকতে পারে না। সিআইএর ব্যাপারে সোভিয়েত পার্টি কীভাবে নিশ্চিত হলো—এ প্রশ্নও আমি তাঁদের কাছে রেখেছিলাম। তাঁরা বলেছেন, আমাদের সূত্র এত দুর্বল নয়, সিআইএ মুজিব হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তা হলে নিশ্চয় আমরা জানতাম।

সাবেক মার্কিন কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জ মনে করেন, সিআইএর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ 'তদন্তযোগ্য'। নাম প্রকাশে অনাগ্রহী আওয়ামী লীগের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য লেখককে বলেন, 'ন্যায়বিচারের স্বার্থে ভবিষ্যতে কখনো মার্কিন কর্তৃপক্ষ মুজিব হত্যায় সিআইএর কথিত যোগসাজশের অভিযোগটি খতিয়ে দেখবে—এটা আওয়ামী লীগসহ মুক্তিকামী জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা।'

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার এন্ড্রু এবং ভাসিলি মিত্রখিন লিখিত *দ্য মিত্রখিন আর্কাইভ : দ্য কেজিবি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড* (পেঙ্গুইন, ২০০৫) গ্রন্থে বলা হয়েছে, মুজিব হত্যাকাণ্ডের পরই কেজিবি সিআইএর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমে পড়ে। আর এ কাজে তারা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিদেশি গণমাধ্যমকেও ব্যবহার করে।

লক্ষ করা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিরাজমান সংগত ও স্বাভাবিক মার্কিন বৈরিতাকে কেজিবি তার অপারেশনগত কৃতিত্ব হিসেবে দেখতে চেয়েছে। একাত্তরে নিক্সন-কিসিঞ্জারের ভূমিকার কারণে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ওই সময়ে মার্কিনবিরোধী একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ছিলই। সুতরাং মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএ জড়িত থাকুক বা না-ই থাকুক, স্নায়ুযুদ্ধে প্রধান প্রতিপক্ষের কার্যকর বিরোধিতার যেকোনো সুযোগ কাজে লাগানো হতে পারে তাদের কাছে মুখ্য বিবেচ্য। কেজিবি তাই বাংলাদেশের মার্কিনবিরোধী

পরিবেশে মুজিব হত্যায় সিআইএর কথিত সম্পৃক্ততার অভিযোগ দ্রুত জনপ্রিয়করণের কৌশলে নেমে পড়ে। মিত্রখিন লিখেছেন, 'প্রত্যাশিতভাবেই বহু দেশের সংবাদপত্রে বাংলাদেশের আগস্ট অভ্যুত্থানের দায়দায়িত্ব সিআইয়ের কাঁধে চাপিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করানোর ব্যবস্থা করে কেজিবি।'

মিত্রখিন লিখেছেন :

> মুজিব হত্যার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো নতুন সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি দেন। তিনি এই ভাবনায় মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে এখন কনফেডারেশন গঠনে ইচ্ছুক হতে পারে। ভুট্টো পরে তাঁর এই আগাম অতি উৎসাহের জন্য অনুতপ্ত হন। কারণ, তিনি লক্ষ করেন যে, পটপরিবর্তনের পরও ইসলামাবাদের চেয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গেই বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকছে।[১]

মিত্রখিন ও এন্ড্রুর মন্তব্য : 'পঁচাত্তরের ওই অভ্যুত্থান ভুট্টোর জন্যও ফল বয়ে আনে। কারণ, পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের জন্য বাংলাদেশের এই ঘটনা একটি গর্হিত দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিভাত হয়, পরে ভুট্টোর জীবনে যা সত্যে পরিণত হয়েছিল।'

২২ আগস্ট ১৯৭৫ ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি স্যাক্সবি পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানান, মস্কোঘেঁষা সিপিআই বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ও মুজিব হত্যাকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার বিষয়ে প্রচারণায় বিশেষভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। ভারতীয় কমিউনিস্টরা এই প্রচারণার কাজে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্ব শান্তি পরিষদকে বেছে নিয়েছে। ১৯ আগস্ট পরিষদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সিআইএর ষড়যন্ত্রের ফসল।

২২ আগস্ট ১৯৭৫ মস্কোর মার্কিন দূতাবাস ওয়াশিংটনে তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে সোভিয়েত প্রেসে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে যা ছাপা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত সার পাঠায়। এতে উল্লেখ করা হয়, *প্রাভদা*য় বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। 'পর্যবেক্ষকে'র নামে প্রকাশিত এই নিবন্ধে শেখ মুজিবের বিভিন্ন অর্জনের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে উপসংহারে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। নিবন্ধে খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতি তাঁর পূর্বসূরিদের অনুসৃত নীতি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়।

---

১. *মিত্রখিন*, পৃষ্ঠা : ৩৫১।

২৩ আগস্ট ১৯৭৫

২৩ আগস্ট ১৯৭৫ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করেছিল, তাতে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও মূল্যায়ন করা হয়। এই তারবার্তার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল, তা হুবহু নিচে তুলা ধরা হলো :

> বাংলাদেশ : ক্ষমতা এখনো অনিশ্চিত।
>
> শেখ মুজিব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার এক সপ্তাহ পর সামরিক বাহিনীর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। এর প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী গুটিকয় মেজর এবং তাঁদের অনুগত সৈন্যবাহিনী এবং সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, যাঁরা সেনাবাহিনীর মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা সংহত করা নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। ওই মেজররা তাঁদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারে উদ্‌গ্রীব হলেও কী উপায়ে তাঁরা অগ্রসর হবেন, সে বিষয়ে অনিশ্চিত। এর মধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আবার অপেক্ষা করার কৌশল নিয়েছেন এবং তাতে তাঁরা সুফলও পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।
>
> এখনো পর্যন্ত তাঁরা, বিশেষ করে বেসামরিক সরকার ও সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে মেজরদের সঙ্গে সমন্বয় করে যাচ্ছেন।
>
> ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এটা বিবেচনায় রাখছেন যে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে নারী ও শিশুদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল রূপ নিতে পারে। তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহী কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনীর মধ্যকার লড়াইয়ের ফলাফল দেখতে তাঁদের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে।

সোভিয়েতরা বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সম্পর্কে সোভিয়েতের প্রথম প্রকাশ্য বা আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে *প্রাভদার* এক নিবন্ধে। এতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সোভিয়েতরা নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই নিবন্ধে মুজিব সরকারের বিভিন্ন অর্জনের ঢালাও প্রশংসা করা হয়েছে এবং মোশতাককে আহ্বান জানানো হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে। যদিও নিবন্ধটিতে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে বিদেশি শক্তির (যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান কিংবা চীন) সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

মস্কোর মার্কিন দূতাবাস থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে সোভিয়েত দূরপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ কাপিতসা এই মর্মে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মস্কো বাংলাদেশ

সরকারকে সহযোগিতা দিয়ে যাবে কিন্তু নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেবে না। দূতাবাসের মন্তব্য হচ্ছে, সোভিয়েতরা যেহেতু বাংলাদেশে চীনা প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, তাই তারা এখনই প্রকাশ্য কোনো বিবৃতি প্রদানের দিকে যাবে না।

উল্লেখ্য যে, ২৪ আগস্ট ১৯৭৫ মস্কোর মার্কিন দূতাবাস ওয়াশিংটন পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছিল যে *প্রাভদা* এএফপির বরাত দিয়ে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলেছে যে পাকিস্তান সরকারের একজন মুখপাত্র বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে ইসলামাবাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২৬ আগস্ট ১৯৭৫

২৬ আগস্ট ১৯৭৫ মস্কোর মার্কিন দূতাবাস থেকে রাষ্ট্রদূত স্টোয়েসেল ওয়াশিংটন পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানান, বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্ব শান্তি পরিষদ সচিবালয় থেকে যে বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে, তার কোনো উল্লেখ *প্রাভদা* কিংবা *ইজভেস্তিয়া* পত্রিকায় পরিবেশিত কোনো খবরে পাওয়া যায়নি। তবে ২২ আগস্ট সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র প্রথম পৃষ্ঠায় তা প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ যে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে চলছিল তা যেসব 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির' চক্ষুশূল ছিল তারাই ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের জন্য দায়ী। ওই নিবন্ধে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ বিশ্বের সব শান্তিকামী ও স্বাধীনতাকামী জনগণের সমর্থন লাভের দাবিদার। ওই নিবন্ধে অবশ্য ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে নির্দিষ্টভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সিআইএর অংশগ্রহণ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

স্টোয়েসেল মন্তব্য করেন :

> অবশ্য এ কথাও সত্য যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি' বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বর্তমানে সিআইএর সংশ্লিষ্টতাই বুঝে থাকবেন। তবে এটা বলা যায় যে, ঢাকার অভ্যুত্থানের বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে যে সিআইএ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা হলো না, সেটা প্রত্যাশার তুলনায় কিছুটা হলেও কম নোংরা। কিছুটা বিলম্ব হলেও *প্রাভদা* ও *ইজভেস্তিয়া* এবার যে সংযত আচরণ দেখাল, সেটা সোভিয়েত প্রেসের আমেরিকাবিরোধী প্রচারণার অপেক্ষাকৃত শিথিল নীতি অনুসরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, মস্কো সম্ভবত উপমহাদেশে তার

> আমেরিকাবিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে এবার সরাসরি অঙ্গুলিনির্দেশ করার মানসিকতা পরিহার করে চলতে আগ্রহী।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছেন :

> ঢাকার সংবাদপত্র আজ প্রথম পৃষ্ঠায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি ফলাও করে প্রচার করেছে। *বাংলাদেশ টাইমস* পত্রিকার শিরোনাম ছিল 'সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দিয়েছে'। বাসস পরিবেশিত খবরটি নিম্নরূপ: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং আশ্বস্ত করেছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তারা সম্পর্ক অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ সকল দেশের সঙ্গে সমঝোতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সব আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে, তাকে তারা স্বাগত জানায়।' বাংলাদেশে নিযুক্ত সোভিয়েত চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স রোববার সকালে বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁকে তাঁর সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২৫ আগস্ট ১৯৭৫ স্টোয়েসেল সোভিয়েত সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত বিভিন্ন খবরের একটা সংক্ষিপ্তসার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন। এতে উল্লেখ করা হয় যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী এবং মুজিব সরকারের ২৫ জন কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারের খবর *প্রাভদা* কোনো মন্তব্য ছাড়াই প্রকাশ করেছে।

মার্কিন হেলিকপ্টারের আশায় মোশতাক

ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, খন্দকার মোশতাক আহমদ একজন মার্কিনপন্থী। অভ্যুত্থানের পর ওয়াশিংটনে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ বিষয়ে প্রশ্নও ছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মার্কিন মুখপাত্র তা এড়িয়ে যান। মোশতাক আহমদ প্রমুখের সঙ্গে কিসিঞ্জার প্রশাসনের পূর্বযোগাযোগ থাকাটা লিফশুলজের অনুসন্ধানের অন্যতম মুখ্য বিষয়। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত এখনো জানা যায় না। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপ্রত্যাশী ছিলেন। চরম বিপদের মুহূর্তে মোশতাক আহমদ ও তাঁর মিত্রদের মার্কিন হেলিকপ্টারযোগে রাজধানী ঢাকা থেকে পলায়নের পরিকল্পনা ছিল তারই ধারাবাহিকতা মাত্র।

১৫ আগস্ট ডেভিস ইউজিন বোস্টার মোশতাকের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে ওয়াশিংটন এক তারবার্তা পাঠান। এর সূচনাতেই তিনি লেখেন :

> বাংলাদেশের নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের যে জীবনবৃত্তান্ত নিচে দেওয়া হলো, তা থেকে এটা দেখা যাবে যে, তিনি অব্যাহতভাবে নিজেকে একজন আমেরিকাপন্থী হিসেবেই চিত্রিত করে এসেছেন এবং সম্ভবত তার ফলাফল হিসেবে একজন ভারতবিরোধী ও সোভিয়েতবিরোধী হিসেবে তাঁর পরিচিতি রয়েছে।

বোস্টারের বিবরণটি এরকম :

> কুমিল্লা জেলায় মোশতাকের জন্ম সম্ভবত ১৯১৮ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনসহ অন্য বিষয়ে ডিগ্রি নেন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন তিনি।

স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে প্রথম গ্রেপ্তার হন ১৯৪৬ সালে। ভাষা আন্দোলনে জেলে যান ১৯৫২ সালে। সামরিক আইনে অন্তরীণ হন ১৯৫৮ সালে। তিন বছর জেলে থাকেন। একাত্তরে মুজিবনগর সরকারের আইনমন্ত্রী [প্রকৃতপক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী] ছিলেন। স্বাধীনতার পর কিছুকাল আইনমন্ত্রী [তথ্যটি সঠিক নয়] পরে জ্বালানি, সেচ ও '৭৪-এ বাণিজ্যমন্ত্রী হন। ওই পদে তিনি এ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। মোশতাক লোকটি ছোটখাটো, দেখতে নাজুক। তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া থেকে অনেক দূরে। শেখ মুজিবের যে রকম গতি ও কর্মশক্তি ছিল, তা মোশতাকের চরিত্রে প্রায় পুরোপুরি অনুপস্থিত। স্বাধীনতার পর থেকে শাসকদলে পাশ্চাত্যপন্থী ও মধ্যপন্থী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তিনি তাজউদ্দীন আহমদের বিরোধী ছিলেন। জানা যায়, স্বাধীনতার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ হারানোর জন্য তিনি ভারতীয় নেতাদের দোষারোপ করে থাকেন। তাঁকে খুব বেশি আমেরিকাপন্থী বলে মনে করা হয়ে থাকে। (আমাদের কাছে অসমর্থিত গুজব রয়েছে, তাজউদ্দীন, মুজিব যাঁকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং সেই থেকে যিনি প্রকাশ্যে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন, তিনি হয়তো অভ্যুত্থান সমর্থন করতে পারেন।)

মোশতাক ১৯৭২ সালে মার্কিন দূতাবাস-কর্মকর্তাদের বলেছিলেন, তিনি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি সমর্থন করেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রকে নয়। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র অগণতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিত (রেজিমেন্টেড)। তিনি এই ধারণা দিয়েছিলেন, বাংলাদেশে মাত্রাতিরিক্ত ভারতীয় ও সোভিয়েত প্রভাবের সম্ভাবনায় তিনি সন্তুষ্ট নন। যদিও পাকিস্তান আমলে আইয়ুবের নিপীড়নমূলক শাসনের প্রতি অব্যাহত মার্কিন সহায়তার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সমালোচক ছিলেন। ১৯৭২ সালে দূতাবাস-কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সোভিয়েত ও ভারতীয় প্রভাবের লাগাম টানতে প্রতিসাম্য রক্ষা করে চলবে।

১৯৭৪ সালের মে মাসে মোশতাকের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মোশতাক এ সময় রাষ্ট্রদূতকে একান্তে বলেন, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় একজন আমেরিকাপন্থী সদস্য হিসেবে তাঁর যে পরিচিতি রয়েছে, তাকে তিনি তাঁর 'সুনাম' বলেই গণ্য করেন। তাঁর শত্রুরা বিষয়টি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। মোশতাক এ কথা বলার পর শেখ মুজিবকে সহায়তার জন্য ব্যাপকভিত্তিক মার্কিন সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মুজিবকে তিনি তখন তাঁর ভাষায় অন্তর থেকে 'সাচ্চা গণতন্ত্রী' হিসেবে বর্ণনা করেন। মোশতাক আরও ধারণা দেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি মুজিবকে ব্যাপক অর্থনৈতিক সহায়তা

দেয়, তাহলে বামের দিকে ঝোঁকার চাপ থেকে মুজিব নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।

সেই থেকে অনেকবার মোশতাকের সহযোগীদের মুখ থেকে তিনি যে আমেরিকাপন্থী তা শুনতে হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১০ আগস্ট একটি নৈশভোজ ছিল। সেখানে রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। মোশতাক অন্যান্য বাঙালির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় বাংলাদেশে খাদ্যসহায়তার জন্য 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড সোর্সেস'-এর উল্লেখ করেন এবং মন্তব্য করেন, 'নো ওয়ান ভোটস ইন বাংলাদেশ নাউ।' আমরা জানি না, মুজিবের একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে মোশতাক কতটা জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। বাকশালের তরুণ নেতারা, যাঁরা এই ধারণার বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের বলেছিলেন, বর্তমান পার্টি কাউন্সিল সম্পর্কে মোশতাক ছিলেন প্যাসিভ বা অপ্রতিরোধী। আমরা এটাও জানি না, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি কী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটাও জানা নেই, কী মাত্রায় তিনি অভ্যুত্থানের 'ফিগার হেড' বা নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমরা একটি প্রতিবেদন পেয়েছি এবং তা থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, আজ সকালে তাঁকে প্রেসিডেন্ট হতে আমন্ত্রণ জানানোর আগ পর্যন্ত অভ্যুত্থান সম্পর্কে তাঁর কিছুই জানা ছিল না।

পরদিন ১৬ আগস্ট বোস্টার তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেন, মাত্র গত সন্ধ্যায় 'নতুন সরকারের সামরিক কর্মকর্তাদের' সঙ্গে দূতাবাসের প্রত্যক্ষ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়েছে। বেঙ্গল ল্যান্সারের দুই কর্মকর্তা প্রায় সাড়ে আটটায় দূতাবাসে পৌঁছান। তাঁরা এসে বলেন, দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সন্ধ্যার পর দূতাবাস ও তাঁদের বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাঁরা নিরাপত্তা প্রহরা দিতে চান। ওই সেনা কর্মকর্তারা খুবই আন্তরিকতা ও বিনয়ের সঙ্গে কারফিউ চলাকালীন নিরাপত্তা পাহারা ছাড়া যাতায়াত না করার জন্য তাঁদের অনুরোধ করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তারা তাঁদের জানিয়ে দেন, এ সময় এ ধরনের সুবিধা নেওয়া তাঁদের উচিত হবে না।

১৭ আগস্ট বোস্টার বাংলাদেশ পরিস্থিতি-সংক্রান্ত তাঁর ষষ্ঠ প্রতিবেদনে বলেন, অভ্যুত্থানের পর এই প্রথম ঢাকার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রাতারাতি 'ব্যক্তিত্বহীন' হয়ে পড়েছেন। তাঁর ছবি, যা সবখানে শোভা পাচ্ছিল, তা অপসারণ করা হচ্ছে। উপসংহারে বোস্টারের মন্তব্য : 'পরিবর্তন যে পূর্ণতা পেয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, অনুমিত বামপন্থী ও বাঙালি রাজনীতির বোলতা (গ্যাডফ্লাই) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

আশ্রয়ে রাজি কিসিঞ্জার

খন্দকার মোশতাক আহমদ, ফারুক এবং রশিদ ছাড়াও তাঁদের আরও কয়েকজন সহযোগী পঁচাত্তরের ৩ নভেম্বর সূর্যাস্তের আগে পালাতে চেয়েছিলেন। মোশতাক আশা করেছিলেন, তাঁদের নিয়ে যেতে একটি মার্কিন হেলিকপ্টার ঢাকায় আসবে। কিন্তু তাতে নিঃশর্তে সায় দেননি তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার। তবে খন্দকার মোশতাকসহ মেজরদের আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে দরকার হলে মার্কিন দূতাবাসে তাঁদের আশ্রয় দিতে বোস্টারকে নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি।

খালেদ মোশাররফের পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর। এ দিন হঠাৎ টেলিফোন পান ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার। তখন সময় বেলা দুইটা ২০ মিনিট। ফোনের অপর প্রান্তে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের মুখ্য সচিব মাহবুব আলম চাষী। বোস্টার ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো ৫৩০৪ নম্বর তারবার্তায় ওই কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন। চাষী এ দিন খালেদ মোশাররফ বা তাঁর সহযোগী কারও নাম নেননি। কিন্তু বুঝিয়ে দেন, মোশতাকের পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে। চাষীর কথায়, প্রেসিডেন্ট খোঁজ নিতে বলেছেন যে যদি তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তাহলে 'বাংলাদেশের কয়েকজন লোক'কে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে কি না। তাঁর প্রশ্ন, তেমন কিছু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না? 'আমি [বোস্টার] জানতে চাইলাম, আপনি যে কয়েক ব্যক্তির কথা বলছেন, এর মধ্যে দুই মেজর রয়েছেন কি না। সচিব উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, বিদেশের মাটিতে বসে কাউকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া আমাদের স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এবং এভাবে আমি তাঁকে (চাষীকে) কোনো উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিইনি। তবে পরিস্থিতির গভীরতার বিচারে এবং তিনি যেহেতু প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন তাই বলেছিলাম, আমি আপনাকে চূড়ান্ত কিছু বলতে অপারগ। তবে আমরা বিষয়টি নিশ্চয় ভেবে দেখব। চাষী বললেন, 'দেখুন, সময় অতি দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে।' এবং তাঁরা বড়ই বিপাকে রয়েছেন।

'আমি জানতে চাইলাম, কবে, কখন এর দরকার পড়তে পারে? সচিব জবাব দিলেন, যদি আদৌ ওরকম কিছুর প্রয়োজন পড়েই তাহলে তা আজ সন্ধ্যায়—সূর্যাস্তের আগে। (ওয়াশিংটন সময় ০৬১৮, ৩ নভেম্বর)।'

বোস্টার এরপর লিখেছেন, 'সচিব জানালেন, দুই মেজর ছাড়াও স্বয়ং প্রেসিডেন্ট তাঁদের সঙ্গী হতে পারেন।' কথাটি শুনে বোস্টার যে অবাক হয়েছিলেন তা আঁচ করা যায়। কারণ বোস্টারের বর্ণনায়:

> কথাটি শুনে আমি তাঁকে [চাষী] আবার তা উল্লেখ করতে বললাম। তিনি আমাকে বললেন, প্রেসিডেন্ট এমনটাই আশা প্রকাশ করেছেন। মেজরদের সঙ্গে তিনিও যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে চান এবং তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সহযোগীও অনুরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন।
>
> টেলিফোনের আলোচনা এখানেই শেষ হয়। তবে পাঁচ মিনিট পরই আবার ফোন আসে। দুইটা ২৫ মিনিটে। এ পর্যায়ে চাষীর প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে ধারণা করা চলে, ৩ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানের নায়ক খালেদ মোশাররফদের সঙ্গে মোশতাক, ফারুক-রশিদের একটি আপসরফার ব্যাপারে দর-কষাকষি হয়েছিল। বোস্টারের বর্ণনায় বিষয়টি ফুটে উঠেছে এভাবে—'চাষী বললেন, তিনি যে একটু আগে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের কথা বলেছেন তা নির্ভর করছে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা-সমঝোতার ওপর। ওই সৈন্যদের সঙ্গে তাঁরা এখন সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। আমি বললাম, আসলে আপনারা যদি প্রাথমিকভাবে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নেন এবং তারপর যদি আপনাদের যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো হয়, তাহলে আপনারা কোন দেশে যেতে চাইবেন? এর জবাবে চাষী যুক্তরাজ্যের নাম বলেন। আমি বললাম, 'একই অনুরোধ আপনারা অন্য কোনো বড় দেশকে করেছেন কি না।' চাষী বললেন, 'না।' চাষী বলেন, প্রেসিডেন্টের এবং তাঁর সরকারের প্রতি অতীতে যুক্তরাষ্ট্র যে সহানুভূতিসূচক মনোভাব দেখিয়েছে, মূলত তা বিবেচনায় রেখেই তাঁরা এই অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁকে সচেতন করে দিলাম যে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার মতো অনুরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হাতে আমাদের সময় খুবই কম। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব।

বোস্টার এই বার্তার উপসংহার টানেন এই বলে যে, 'দয়া করে অবিলম্বে নির্দেশনা দিন। আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের কোনো প্রকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে কি না।' ধারণা করা যায় ৩ নভেম্বর মোশতাক ও তাঁর সহযোগীদের রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের বার্তা চালাচালি হয়, তবে ওই দিন কী উত্তর বোস্টার পেয়েছিলেন তা জানা সম্ভব হয়নি। এটা খুবই লক্ষণীয় যে বোস্টারের এই তারবার্তার জবাব দেন স্বয়ং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। ৫ নভেম্বর

১৯৭৫ কিসিঞ্জার ২৬১৭৮৫ নম্বর তারবার্তায় বোস্টারকে নির্দেশনা দেন :

> আপনি প্রেসিডেন্ট মোশতাককে অব্যাহতভাবে এই নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন রয়েছে। আমরা এটা জেনে সন্তুষ্ট, যে উপায়ে সংকটের সুরাহা হতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, তাতে রক্তপাত এড়ানো যাবে। আপনি মোশতাককে এটা জানিয়ে দিতে পারেন যে, তিনি যদি আসতে চান তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে স্বাগত জানাবে। তাঁকে এটাও জানাতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে তাঁর জীবনের নিরাপত্তাজনিত হুমকি অত্যাসন্ন, তাহলে অস্থায়ীভাবে তাঁকে দূতাবাসে আশ্রয় দিতে আমরা প্রস্তুত থাকব। ঢাকা থেকে তাঁদের আনতে একটি মার্কিন হেলিকপ্টার পাঠানোর প্রস্তাবে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা পাঠানো দরকার বলে মনে হয় না।

কিসিঞ্জার যে খালেদ মোশাররফের পাল্টা অভ্যুত্থান-প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তা স্পষ্ট হয় তাঁর মন্তব্যের পরবর্তী অংশ থেকে। তিনি লিখেছেন :

> একটি জবরদস্তি অথচ মানবিক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাসনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে বাঙালিরা ইতিমধ্যে তাদের সামর্থ্যের প্রমাণ রেখেছে। বর্তমানে যাঁরা নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যদি মোশতাককে বাংলাদেশের বাইরে পাঠাতেই চান, তাহলে সে ধরনের অভিযান পরিচালনায় সামরিক ও বেসামরিক বিমানের অভাব হবে না। মোশতাকের নির্বাসনের বিষয়ে যদি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তাঁরা না-ই পারেন, তাহলে সেখানকার কর্তৃপক্ষের সম্মতি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষে কোনো বিমান সরবরাহ করা সম্ভব হবে না।

উল্লেখ্য, কিসিঞ্জারের ওই ফিরতি তারবার্তায় ৪ নভেম্বর চাষীর আরেকটি টেলিফোন-কথোপকথনের উল্লেখ দেখা যায়। বোস্টার ৪ নভেম্বর ০৫৩৩১ নম্বর তারবার্তায় উল্লেখ করেছিলেন, 'চাষী ভোর সাড়ে ছয়টায় (৪ নভেম্বর) আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি জানতে চান, তাঁদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আরও কোনো উত্তর পেয়েছি কি না।' এখানে 'আরও' (Further) শব্দটির ব্যবহার থেকে ধারণা মেলে, ৩ নভেম্বর ও ৪ নভেম্বরের মধ্যে বোস্টার-চাষীর মধ্যে আরও যোগাযোগ হয়ে থাকতে পারে। বোস্টার লিখেছেন, 'আমি জানালাম, আমি কোনো উত্তর পাইনি। চাষী তখন আমাদের মধ্যকার সমঝোতার উল্লেখ করে বলেন, তিনি পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তনের বিষয়ে আমাকে অবহিত রাখবেন।'

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে রাজনৈতিক আশ্রয়ের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন চাষী। ৩ নভেম্বরের সূর্যাস্তের মধ্যে যাঁরা

পালাতে চেয়েছিলেন, তাঁরা ৪ নভেম্বরের সূর্যোদয়ের লগ্নে বোস্টারকে বলছেন, 'পরিস্থিতি এখন যেদিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে বর্তমান সময়ে আর সহায়তার দরকার নেই। এবং পরিস্থিতির অবনতি না ঘটলে এর আর দরকারও পড়বে না। তবে যা-ই হোক না কেন, নীতিগতভাবে আমরা এটা শুনতে চাই, যে সহায়তা আমরা চেয়েছিলাম, তা দরকার হলে আমরা পাব।' বোস্টার বললেন, 'আপনি যা বলেছেন তা আমি রিপোর্ট করব।'

উল্লেখ্য, রশিদ-ফারুক গ্রুপ ৪ নভেম্বর ব্যাংকক পৌঁছান। ৩ নভেম্বর রাত সাড়ে আটটায় চাষীকে ফোন করেন বোস্টার। তিনি বলেন :

> চিফ অব প্রটোকলের কাছ থেকে মেজরদের ঢাকা ত্যাগের খবর পেয়েছিলাম। এর ফলে কি তবে এর আগে আশ্রয়লাভের যে অনুরোধ করা হয়েছিল, তার দরকার ফুরাল?' চাষী জবাবে বললেন, এর আগে তিনি যে অনুরোধ তাঁকে করেছিলেন, এটা সেই ব্যবস্থারই একটা অংশ। তবে প্রেসিডেন্টের আশ্রয় প্রার্থনার ইচ্ছা এখনো বহাল। এটা নির্ভর করছে এ দেশ এখন 'যাঁরা শাসন করছেন', তাঁদের মর্জির ওপর। 'আমি তাঁকে [চাষী] বললাম, 'যাঁরা শাসন করছেন' কথাটায় আমি অবাক হচ্ছি। এর মানে কী? তিনি বললেন, 'এটা ব্যাখ্যা করার সময় এখন নয়। তবে এটুকু বলতে পারি, আমাদের আশ্রয় দিলে আপনারা বিব্রত হবেন না। সুতরাং প্রেসিডেন্টের অনুরোধের প্রশ্নে আমার করণীয় জানা দরকার।'

উল্লেখ্য, বোস্টার কিসিঞ্জারের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন ৫ নভেম্বর। তিনি লিখেছেন :

> আমি বেলা দেড়টায় প্রেসিডেন্টকে ফোন করি। কিন্তু ফোন ধরেন চাষী। বলেন, প্রেসিডেন্ট এখন ফোন ধরতে অপারগ।' তবে লক্ষণীয়, ফারুক-রশিদ চলে যাওয়ার পরও বোস্টার চাষীকে বলেন, 'বাংলাদেশ ত্যাগের আগে দরকার হলে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সহযোগী দল মার্কিন দূতাবাসে থাকবেন।' জবাবে চাষী তাঁকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। বোস্টার লিখেছেন, 'চাষী আর মার্কিন হেলিকপ্টারের কথা মুখে আনেননি। আমিও আর এ প্রসঙ্গ তুলিনি।'

উল্লেখ্য, ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি আলফ্রেড বাইরোড ৫ নভেম্বর পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানান, এ দিন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ ডেস্কের পরিচালক আজমত হোসেনের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তাদের বৈঠককালেই ঢাকার সুইস দূতাবাস থেকে ফোন আসে। তাদের সূত্র জানিয়েছে, মোশতাককে ৫ নভেম্বর সকালে ঢাকা বিমানবন্দরে দেখা গেছে। কিন্তু সামরিক বাহিনী তাঁকে দেশত্যাগ করতে দেয়নি।

সিআইএর মুজিব-মূল্যায়ন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সিআইএর কিছু অবমুক্ত করা দলিলপত্র লেখক সম্প্রতি তাঁর যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে (১ নভেম্বর ২০১২ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০১৩) দেশটির জাতীয় মহাফেজখানা থেকে সংগ্রহ করেন। এর কতিপয় দলিলের ভাষান্তর তুলে ধরা হলো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবমুক্ত করা নথিপত্রের (প্রধানত ২০০১ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে) বাংলাদেশ-সম্পর্কিত সবটুকু অংশ অনুবাদ করা হয়েছে। কেবল কিছু ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি এড়ানো হয়েছে। মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনামল এবং তাঁর প্রতি সিআইএর একটা দৃষ্টিভঙ্গি এসব দলিল থেকে কিছুটা হলেও অনুমান করা যেতে পারে। তবে এটা অনুমেয় যে, সংশ্লিষ্ট সময়কালে তাদের প্রস্তুত করা আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল অপ্রকাশিত কিংবা অবমুক্ত করা হলেও তা এই লেখকের সংগ্রহের বাইরে থেকে গেছে। প্রাপ্ত দলিলগুলোর শিরোনাম লেখকের দেওয়া।

৩ জানুয়ারি ১৯৭২ : পাশ্চাত্যপন্থীকে সরিয়ে

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন (ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স) সিক্রেট নম্বর ০৪২। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ১৯ মে, ২০০৩।

> বাংলাদেশে মুজিবের প্রত্যাবর্তন ঢাকার নতুন সরকারকে দেশের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় দারুণভাবে উজ্জীবিত করবে। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চোখে তিনি বাংলাদেশের বৈধ নেতা। গত সপ্তাহে যখন মন্ত্রিসভার দপ্তর পুনর্বণ্টন করা হলো, তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। আবদুস সামাদকে তাজউদ্দীনের মতোই মস্কোর প্রতি

বন্ধুপরায়ণ বিবেচনা করা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে একজন পাশ্চাত্যপন্থী রাজনীতিককে সরিয়ে সামাদকে বসানো হয়েছে।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ : মিডল অব দ্য রোডার

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন (ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স) সিক্রেট নম্বর ০৪২। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ১৯ মে, ২০০৩।

শেখ মুজিবুর রহমানের আজ ঢাকায় ফিরে আসার কথা। তাঁর সামনে অনেক সমস্যা। সবচেয়ে বড় সমস্যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ। নতুন সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় রত বিভিন্নমুখী উপদলীয় প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে হবে তাঁকে। কার্যত তিনি একজন 'মিডল অব দ্য রোডার', কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগকে দৃশ্যত বামপন্থীরা পেয়ে বসেছে। আওয়ামী লীগ নিজেই অন্যান্য বামপন্থী দলের চাপের মুখে রয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তিনি কতটা কার্যকরভাবে সামলাতে পারেন, সেদিকে বামপন্থী দলগুলো নজর রাখবে। আপাতত তারা তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

২১ ডিসেম্বর ১৯৭২ : আকস্মিক আঘাতে

সিআইএ, এনআইসি ফাইলস, জব ৭৯-আর০১০১২এ

সিআইএর বাংলাদেশ রিপোর্টে (এফবিআই বাদে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্য সব সংস্থা এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত পোষণ করে) বলা হয়, সরকার পরিবর্তন হবে এক আকস্মিক আঘাতে। মুজিবের উত্তরসূরি তাঁর দল থেকেই আসবে।

২ নভেম্বর ১৯৭৩ : সহিংস পদ্ধতিতে

আউটগোয়িং মেসেজ। সিক্রেট। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ১৪ আগস্ট ২০০১।

বাংলাদেশ : সরকার আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি রক্ষা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অপব্যবহার শোধরাতে অক্ষম হওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমানের প্রতি বিরোধিতা বাড়ছে।

সরকার অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখলেও কিছু সময় ধরে বিরোধী গ্রুপ এবং তাদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিরোধী দলগুলো কেবল প্রকাশ্যে মুজিবের সমালোচনাই করছে না, এই কিছুদিন আগ পর্যন্তও যে মুজিব এক অলঙ্ঘনীয় (Inviolable) রাজনৈতিক টার্গেট ছিলেন, আজ বিরোধী দল এমনকি তাঁর সরকার

উৎখাতের জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানাচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বামপন্থী বিরোধীদলীয় সংগঠনের একজন নেতা একান্ত আলোচনায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ইতিপূর্বে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের যে কথা বলা হয়েছিল, এখন তা পরিত্যাগ করা হতে পারে। কারণ, এখন অধিকতর সহিংস একটি পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনাটা দরকারি মনে হতে পারে।

বিশেষ করে, গ্রাম এলাকায় আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে হালে যুক্ত হয়েছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ঘাটতি। এসব বিষয় এখন সরকার ও জনগণ উভয়ের জন্যই উদ্বেগজনক। অধিকতর অস্ত্র ও গোলাবারুদ পেতে আগ্রহী সশস্ত্র গ্রুপগুলো সম্প্রতি বিশটি পুলিশ ফাঁড়িতে সাফল্যজনকভাবে হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনা পরিস্থিতিতে একটি নতুন ভীতিকর মাত্রা যুক্ত করেছে। যদিও স্বাধীনতার সময় থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চমাত্রার অপরাধ ও সহিংসতা ঢাকাকে পর্যুদস্ত করে আসছে। কিন্তু এই আক্রমণসমূহ সাধারণ অপরাধীদের পরিবর্তে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যদিও কোনো সংঘটিত গ্রুপের সঙ্গে এই হামলার যোগসূত্র আছে বলে অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মুজিব এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলের ওপর অধিকতর তীব্র দমননীতি পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। নিরাপত্তাব্যবস্থা কঠোর করেছেন। অনেককে গ্রেপ্তার করেছেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে হিংসাশ্রয়ী পদক্ষেপ নিয়েছেন। গত মাসে জাতীয় সংসদ, যেখানে মুজিব-দলীয় সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে একটি সাংবিধানিক সংশোধনী পাস করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে তাঁকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং নিবর্তনমূলক আটকাদেশ দেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যদিও এসব ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য দরকারি আইনের এখনো কোনো অভাব নেই। তবে সংশোধনীর ফলে মুজিব এখন আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী এবং সরকারের বিরোধীদের মোকাবিলায় অতিরিক্ত বিকল্প হাতিয়ার পেয়ে গেছেন।

নভেম্বর ১৯৭৩ : শক্তিশালী সমর্থন

রেসপন্স টু এনএসএসএম নম্বর ১৮৮

এই দলিল ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে তৈরি। এতে দক্ষিণ এশীয় পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ধ্বংস ও বিভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। গত জানুয়ারিতে ইউসিস লাইব্রেরি ধ্বংসসহ নানাবিধ ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের মুজিবের প্রতি শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে বলেই

প্রতীয়মান হচ্ছে। তাঁর দল মার্চে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

১ মার্চ ১৯৭৪ স্বীকৃতি সহজতর

উইকলি রিভিউ। টপ সিক্রেট কপি নং-৪২৬, পৃষ্ঠা: ৭। ইসলামি রাষ্ট্র: লাহোর শীর্ষ সম্মেলন।

গত ২২, ২৪ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ইসলামি নেতাদের নেওয়া সরকারি সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য সিদ্ধান্তের ছায়ার আড়ালে চলে গেছে। সম্ভবত মিসরীয় প্রেসিডেন্ট সাদাতের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এতে বিরাট ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে।

এ সম্মেলনের ফলে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় সহজতর হয়েছে। দুই বছর ধরে ইসলামাবাদ বাংলাদেশের প্রতি তার স্বীকৃতি প্রদানের প্রক্রিয়া ধীরগতিতে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। আর এখন সাদাত এবং অন্যদের উদ্যোগ পাকিস্তানের প্রতি বাংলাদেশের অনুকূল সিদ্ধান্ত নিতে বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। কারণ, তাদের বিবেচনায় বাংলাদেশ হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।

২৬ জুন ১৯৭৪ অগ্রগতি মন্থর

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড। কপি নম্বর ৬৩১। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৭ জানুয়ারি, ২০০৮।

গভীর সন্দেহ, সংশয় ও বিদ্বেষ সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো ও মুজিবুর রহমানের মধ্যকার বৈঠকের অগ্রগতি মন্থর রাখবে। বৃহস্পতিবার ঢাকায় তাঁরা বৈঠক শুরু করেছেন। ভুট্টো ১৯৭১ সালের মার্চে সবশেষ ঢাকায় এসেছিলেন। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া তখন মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে সরে আসতে রাজি করাতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশে এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের জন্য ভুট্টোকে বহুলাংশে দায়ী করা হয়। কিন্তু ভুট্টোর দাবি, পাকিস্তানে অন্তরীণ থাকাকালে মুজিবের ফাঁসি তিনি ঠেকিয়েছেন। ইসলামাবাদের ক্ষমতায় এসে মুজিবের মুক্তি ও তাঁর দেশে ফেরা নিশ্চিত করেছেন।

২৬ জুন ১৯৭৪ : সেনার অনুকূলে

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড। টপ সিক্রেট, নম্বর ৬৪৮ প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭।

প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান বামপন্থী অর্থমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভায় সমাজতন্ত্রের

পক্ষে মুখ্য প্রবক্তা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের বড় বন্ধু তাজউদ্দীন আহমদকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। তিন তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।

তাজউদ্দীনের অপসারণ, বিশেষ করে যাঁরা মুজিবের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, সেই সামরিক কর্মকর্তাদের প্রতি একটি সংকেত হিসেবে গণ্য হতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। এমনকি তা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের কান্ডারিদের পরিত্যাগের বিনিময়ে হলেও।

তাজউদ্দীন শাসক আওয়ামী লীগে বামপন্থীদের নেতা। তিনি বহুদিন ধরে অর্থনৈতিক সমস্যার একটি বাস্তবানুগ সমাধানের বিরোধিতা করে আসছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘন ঘন সরকারকে আক্রমণ করতেন। সম্প্রতি তিনি মুজিবের সংবিধান সংশোধনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। মুজিব সংবিধান সংশোধন করে একটি অধিকতর কেন্দ্রীভূত ও সম্ভবত কর্তৃত্বপরায়ণ প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকার-পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চাইছেন। এই পরিবর্তনকে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা তাঁদের পক্ষে অনুকূল মনে করছেন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

তাজউদ্দীন আহমদকে অপসারণের সম্ভাব্য একটি কারণ হতে পারে এই যে, বাংলাদেশের জন্য পাশ্চাত্যের দাতা দেশগুলোর একটি কনসোর্টিয়াম গঠনের তিনি বিরোধিতা করছেন। মুজিব হয়তো ভেবেছেন যে মন্ত্রিসভায় তাজউদ্দীনের অব্যাহত উপস্থিতি সাহায্যসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সমস্যার মধ্যে ফেলে দেবে।

৩ জানুয়ারি ১৯৭৫ : শিকদার হত্যাকাণ্ড

সিআইএ স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া সিক্রেট নম্বর ০৪০৫/৭৫। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৩০ জুলাই, ২০০১।

বাংলাদেশ : পুলিশের গুলিতে চরমপন্থী নিহত

সন্ত্রাসী নেতা সিরাজ শিকদার তাঁর কথিত পালানোর চেষ্টাকালে ১ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। ২৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকে সিরাজ শিকদার হত্যাকাণ্ডই সবচেয়ে বড় নাটকীয় ঘটনা।

শিকদার বামপন্থী পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির রাজনৈতিক প্রধান ছিলেন। ১৯৭২ থেকে এই সংগঠন সরকারবিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত আছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দলটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মফস্বল এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে গেরিলা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

[একটি বাক্যের অংশবিশেষ প্রকাশ করা হয়নি] সর্বহারা পার্টি (সিপিইবি) মধ্য ডিসেম্বরে শহর এলাকায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যার

জন্য প্রচারণা শুরু করেছে। সেই থেকে মুজিবের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য, যাঁদের মধ্যে একজন সংসদ সদস্য রয়েছেন, নিহত হয়েছেন। কিন্তু এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য সিপিইবিকে অভিযুক্ত করা হয়নি। সরকার দাবি করেছে যে আওয়ামী লীগের ছয়জন সংসদ সদস্যসহ দলটির তিন হাজার সদস্য স্বাধীনতার পর থেকে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

শিকদারকে হত্যার মধ্য দিয়ে সম্ভবত রাজনৈতিক সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে না। সিপিইবির সামরিক শাখার নেতৃত্বে রয়েছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও যোগ্য লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে যিনি বিদায় নিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলা হয় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সেনাবাহিনীর অনেক জুনিয়র কর্মকর্তাকে প্রভাবিত করছে। জিয়াউদ্দিন সন্দেহাতীতভাবে তাঁর সরকারবিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন। এমনকি তিনি সর্বহারা পার্টির নতুন রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও আবির্ভূত হতে পারেন।

১৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ : ড. কামাল হতাশাগ্রস্ত

সিআইএ স্টাফ নোটস: মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। পৃষ্ঠা: ৫। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০০।

বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম মুখ্য রূপকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন, ধারণা করা হয় হতাশাগ্রস্ত; কারণ, প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান সংসদীয় সরকার-পদ্ধতি পরিবর্তন করে একটি কর্তৃত্বপরায়ণ একদলীয় প্রেসিডেন্ট-ব্যবস্থা কায়েমের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা তিনি সমর্থন করতে পারছেন না। হোসেন ও তাঁর পরিবার এক মাসের এক সফরে এ সপ্তাহে দেশ ত্যাগ করেছেন। [এর পরের একটি বা দুটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুজিবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে পরিচিত। তাঁর সপক্ষ ত্যাগ, অন্যদের, যাঁরা মুজিবের পরিকল্পনার বিরোধী, তাঁদের উৎসাহিত করতে পারে। কতিপয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ঘরোয়াভাবে প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতির বিরোধিতা করছেন। তাঁদের আশঙ্কা, এর ফলে তাঁদের ক্ষমতা ও প্রভাব মুছে যাবে।

মুজিবের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা এই সপ্তাহান্তে সোমবার থেকে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনকে সামনে রেখে বৈঠকে বসছেন। কিছু বাঙালি পর্যবেক্ষক মনে করেন, এই সময়ে মুজিব তাঁর নতুন সরকারের প্রস্তাবিত রূপরেখা প্রকাশ করবেন এবং আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত তাঁকেই সমর্থন দেবে। মুজিব তাঁর অনুসারীদের সমর্থন নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন এবং তিনি আশা করতে পারেন যে তিনি তাঁদের সমর্থন আদায় করতে পারবেন।

[একটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি] মুজিব সচেতন রয়েছেন যে তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন। তিনি হয়তো সংসদ বিলোপ না করে তাঁকে প্রদত্ত নতুন ক্ষমতাবলে একটি প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতির সরকার ঘোষণা করবেন। গত ডিসেম্বরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য হচ্ছে দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও রাজনৈতিক সহিংসতা মোকাবিলাই এর লক্ষ্য। কিন্তু এসব সমস্যা ঢাকায় এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে। কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর ফলে বাংলাদেশে এই জল্পনাকল্পনা জোরালো হচ্ছে যে একটি অধিকতর কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যবস্থার দিকে যেতে জরুরি অবস্থা জারি ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ : কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যবস্থা

সিআইএ স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। টপ সিক্রেট নম্বর ১৩৪। পৃষ্ঠা : ০৮, প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ১৬ আগস্ট, ২০০৪।

প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান একটি অধিকতর কর্তৃত্বপরায়ণ প্রেসিডেন্ট-ব্যবস্থা প্রবর্তনকে যৌক্তিকতা দিচ্ছেন। তাঁর যুক্তি, দেশের উল্লেখযোগ্য সমস্যাবলি, বিশেষ করে অবনতিশীল অর্থনীতি মোকাবিলায় এই ব্যবস্থা তাঁকে সাহায্য করবে। তবে অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক নীতি বদলের লক্ষ্যে তিনি তাঁর কোনো পরিকল্পনা প্রকাশ করেননি। এমনকি তাঁর নতুন ক্ষমতা করায়ত্ত করার পরও তিনি যে অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেন, তা মনে হয় না।

মুজিবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর কাজের গতি মন্থর এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণের বর্তমান জটিল পদ্ধতি পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তিনি উদাসীন থাকবেন। গত তিন মাসে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে তিনটি ছোটখাটো বিষয়ে উদারীকরণের সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পেরেছেন। কিন্তু বাজারদর নির্ধারণ ও বাজারজাতকরণের যে নীতি চলে আসছিল, তাতে বিরাট কোনো পরিবর্তন আসবে, সে রকম কোনো লক্ষণ নেই। নির্দিষ্ট কতিপয় বাধা দূর করতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় [এরপর একটি বড় প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]।

৬ মার্চ ১৯৭৫ : স্বস্তির নিঃশ্বাস

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন। ইউএসআইবি। টপ সিক্রেট। নম্বর ৬৩৮। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৩ ডিসেম্বর, ২০০৭। পৃষ্ঠা : ২১-২২।

আসন্ন বসন্ত ও গ্রীষ্মের মাসগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমানকে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিতে পারে। তাঁর

নবপ্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে বেড়ে ওঠা সমালোচনা থেকে তিনি কিছুটা পরিত্রাণ পেতে পারেন। [এখানেও একটি বড় অংশ প্রকাশ করা হয়নি]

৬ মার্চ ১৯৭৫ : দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন। পৃষ্ঠা : ২১।

বাংলাদেশে ফসল কাটা ও ঘরে তোলার প্রধান মৌসুমের শুরু মধ্য নভেম্বরে। কিন্তু তার পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলোতে বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষের বিপদ থেকে মুক্ত নয়। এ ধরনের একটি বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে, যদি অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় কিংবা খাদ্যশস্য আমদানির ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব ঘটে। [এক বা একাধিক বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যসাহায্য এবং পরিকল্পিত ধান-চাল সংগ্রহের তোড়জোড় লক্ষ করা যাচ্ছে। অল্প কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাব বিদ্যমান থাকতে পারে। কিন্তু আগামী কয়েক মাসের জন্য দেশের বেশির ভাগ এলাকায় ন্যূনতম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে।

বসন্ত ও গ্রীষ্মের মাসগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমানের জন্য একটা দম ফেলার অবকাশ সৃষ্টি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নবগঠিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের সমালোচনার প্রকোপ থেকেও সাময়িকভাবে বাঁচতে পারেন। মুজিব রাজনৈতিকভাবে অশান্ত শহরাঞ্চলগুলোতে খাদ্য বন্টনের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সন্দেহাতীতভাবে তিনি তাঁর অবস্থান বজায় রাখতে এটা অব্যাহত রাখবেন।

৯ মে ১৯৭৫ : মুজিবের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

সিআইএ স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নম্বর ০৬৬৭/৭৫। পৃষ্ঠা : ০৬। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট, ২০০১। বাংলাদেশ : 'দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রথম ১০০ দিন'।

মুজিবুর রহমানের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাস পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি তাঁর দারিদ্র্যপীড়িত জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যকর নেতৃত্ব দিতে পারেননি। তাঁর বহুল প্রচারিত 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নিম্নোক্ত বিষয়ে সামান্য অগ্রগতি এনেছে : একটি কার্যকর বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা; দেশের একক জাতীয় রাজনৈতিক দলকে সংগঠিত করা; নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-পরিস্থিতি নাজুক রয়ে গেছে। যদিও এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট চোরাচালান ও সন্ত্রাস

নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে ব্যবহার করেছেন। চোরাচালান রোধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা এই মুহূর্তে কার্যকর, কিন্তু তা অস্থায়ী হতে পারে।

অর্থনৈতিক ইস্যুতে, বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং জিনিসপত্রের ঘাটতি নিয়ে মানুষের স্বপ্নভঙ্গ ও অসন্তোষ চরম রূপ নিয়েছে। বেশির ভাগ বাঙালি অনুভব করে যে মুজিবের সরাসরি বিরোধিতা করা ভয়ংকর ব্যাপার। সুতরাং তারা তাদের মতামত প্রকাশে দীর্ঘ সময় নিচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও গতিশীল নীতিনির্ধারণী উদ্যোগ গ্রহণে মুজিবের নেতৃত্ব অনিচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে। সব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুজিব নিজেই গ্রহণ করেন। কিন্তু যেহেতু অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা খুবই কম, সে কারণে এ ক্ষেত্রে বেশ সময় লেগে যাচ্ছে। তিনি এখনো পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্য অর্জনে আপস, প্রতিশ্রুতি ও কৌশলের ওপর নির্ভর করে চলছেন। কিন্তু যদি প্রয়োজন পড়ে, তিনি বল প্রয়োগ করবেন। সমস্যাগুলো উপলব্ধি করার পরিবর্তে তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্পর্কই অব্যাহতভাবে অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে হয়। সে অনুসারে সরকারের উচ্চপদগুলোতে আগের মতোই অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে তিনি তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য কিংবা রাজনৈতিক একান্ত সহচরদের রেখে দিয়েছেন।

তাঁর এই ঘাটতি ও জনপ্রিয়তা সমর্থনে অব্যাহতভাবে ক্ষয় ঘটতে থাকলেও মুজিব এখনো পর্যন্ত ব্যাপকভাবে শ্রদ্ধাভাজন এবং একমাত্র ব্যক্তি, বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ ও নেতৃত্ব দিতে যাঁর জাতীয় গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এটা অনুমেয়, তিনি বিশ্বাস করেন যে নতুন সরকার-পদ্ধতির আওতায় ভবিষ্যতের সব সাফল্য ও ব্যর্থতার দায়ভার ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই বহন করতে হবে।

মুজিব সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর অধিকাংশ সদস্যের আনুগত্য ধরে রাখতে সক্ষম হবেন বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থিতির ক্ষেত্রে যেসব লক্ষণ ফুটে উঠেছে, তা দেখে সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওই সদস্যরা ইতিমধ্যে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন এবং তাঁরাই তাঁর অব্যাহত শাসনের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে থাকবেন।

৪ জুন ১৯৭৫ : তিন গুণ

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। টপ সিক্রেট। নম্বর ০৬৮৫/৭৫। পৃষ্ঠা : ২।

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ও অতিরিক্ত বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে পশ্চিমা কনসোর্টিয়াম এ সপ্তাহে বৈঠকে বসছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়ে মুজিব দাতাদের চাপের প্রতি সাড়া দিয়েছেন। তিনি অবশ্য চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ ধান-চাল সংগ্রহ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা ছাড়াও প্রেসিডেন্ট মুজিবকে দাতাদের পরামর্শ বিবেচনায় নিতে হতোই। ১৯৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশকে ৯০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এটা অতীতের চেয়ে তিন গুণ বেশি এবং পরিমাণে রপ্তানি থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সমান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, ইরাক ও আবুধাবি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দাতা। কিন্তু তারা কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণ করে না।

৯ জুন ১৯৭৫ : বৃহত্তম হুমকি

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। কনফিডেনশিয়াল। নম্বর ০৬৮৮/৭৫। পৃষ্ঠা : ১-২। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট ২০০১।

প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান গত সপ্তাহান্তে বাংলাদেশে একদলীয় শাসনের কাঠামো ও মুখ্য কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে গত জানুয়ারিতে তাঁর জারি করা কর্তৃত্বপরায়ণ প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতি পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর নবগঠিত দলীয় সংগঠন তাঁর সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতার জন্য মুজিবের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা আরও বেশি স্পষ্ট করেছে।

মুজিব দলের প্রতিটি স্তরের নেতৃত্বের পদে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোগীদের নিয়োগ দিয়েছেন। ১৫ সদস্যের নির্বাহী কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন মুজিব নিজেই। এবং অন্যদের টেনেছেন তাঁর পুরোনো আওয়ামী লীগ থেকে। আর এটাই হবে দলের প্রধান নীতিনির্ধারণী স্তর।

মুজিব তাঁর দলে যেভাবে নিয়োগের নীতি অনুসরণ করেছেন, তাতে তিনি যে তাঁর দল ও সরকারকে ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং নিচের দিকে ভিন্নমত অবদমন করতে চান, সেটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। যদিও তাত্ত্বিকভাবে দলের সদস্যপদ ১৮ বছরের বেশি যেকোনো নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত কিন্তু সাবেক বিরোধী দল থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্যের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা সীমিত।

যদিও নতুন নিয়োগের ফলে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ বাঙালি প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুজিব

কীভাবে দায়িত্ব পালন করেন, সেটা দেখার ও তাদের মতামত প্রকাশে আরও একটু সময় নিতে আগ্রহী। সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষুব্ধ সদস্যরা, যাঁরা মুজিবের অব্যাহত শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তম সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে গণ্য হচ্ছেন, তাঁরা সম্ভবত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

২৫ জুন ১৯৭৫ : সেনা সমর্থন

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নম্বর ০৬৯৬/৭৫। পৃষ্ঠা : ৫-৬। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট ২০০১।

বাংলাদেশের রাজনীতির অভ্যন্তরীণ সমালোচকেরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আনতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট মুজিবকে দোষারোপ করছেন। এখনো পর্যন্ত তিনি অধিকাংশ বাঙালি, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর সমর্থন লাভ করছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা সামলাতে তিনি একটি অধিকতর কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করেছেন, যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

১ জুলাই ১৯৭৫ : ক্ষমতায় টেকা নয়

স্টাফ নোটস: মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নম্বর ০৪৩৮৯/৭৫। পৃষ্ঠা : ৫-৬। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট ২০০১।

প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান ২২ জুন নতুন জেলা প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করার মধ্য দিয়ে নতুন করে দেশের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করেছেন। সাবেক প্রশাসনিক মহকুমাকে পুনর্বিন্যাস করে ৬০টি নতুন জেলা সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব জেলা প্রশাসন কার্যত মুজিবের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রত্যেক জেলা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগকৃত গভর্নরের নেতৃত্বাধীন একটি প্রশাসনিক পরিষদ দ্বারা শাসিত হবে। এই গভর্নরদের বাছাই করা হবে একটিমাত্র আইনসম্মত জাতীয় দলের বিশ্বস্ত সদস্যদের মধ্য থেকে। প্রতিটি পরিষদের সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনিক ও উন্নয়নকাজের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। পুনর্গঠিত পদ্ধতি ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

গত ১৯ জুন জাতীয় দলের প্রথম বৈঠকে মুজিব উল্লেখ করেছেন যে তাঁর প্রবর্তিত একদলীয় প্রেসিডেন্ট-ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্য সমালোচকদের ভাষ্য অনুযায়ী কেবলই তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকা নয়। মুজিব বলেছেন, এসব পদক্ষেপ তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং

অচিহ্নিত বৈদেশিক ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

প্রেসিডেন্ট মুজিব বলেছেন, একটি ফ্রি স্টাইল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে কাজ করেনি। সে কারণেই দেশের জন্য একটি অনন্য দেশজ 'মুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি' দরকার। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে তাঁর একক জাতীয় দলই পরিবর্তনের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য চালিকা শক্তি। মুজিব আরও উল্লেখ করেন যে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সরকার পরিচালনায় দেশের সবচেয়ে মেধাবীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে তিনি যদি তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি সৎ থাকেন, তাহলে এই প্রক্রিয়া সফলের চেষ্টা ভেস্তে না গেলেও রাজনৈতিক বিবেচনা তাকে জটিল করে তুলবে।

৩ জুলাই ১৯৭৫ : ইন্দিরাকে সমর্থন

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নম্বর ০৮২১/৭৫। পৃষ্ঠা : ২। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট ২০০১।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং ভারতে তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিতে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো সরকারিভাবে এ বিষয়ে নীরবতা পালনের জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। সরকার-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমকেও মন্তব্যদানে বিরত থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ভারতের অন্য ক্ষুদ্র প্রতিবেশীরাও উদাসীন থাকার নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ যদিও সরকারিভাবে কোনো মন্তব্য করেনি, কিন্তু তার সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমে মিসেস গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রতি প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমানের সন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। মুজিব তাঁর নিজের স্বৈরাচারী আচরণকে যৌক্তিকতা দিতে ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করছেন। এবং একই সঙ্গে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিও একটা সমর্থন এতে ব্যক্ত হচ্ছে আর সেটা হলো, দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের কোনো জায়গা নেই। কতিপয় বাঙালি অবশ্য উদ্বেগ অনুভব করছেন। তাঁরা মনে করেন, ভারতের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে আর তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বাংলাদেশে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ : এখনো পরিষ্কার নয়

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন (ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড)। এই বুলেটিন প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ১৪ মার্চ ২০০৭।

অভ্যুত্থানে মুজিবুর রহমান অপসারিত

সেনাবাহিনী আজ দিনের শুরুতে মুজিবুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে একটি সফল অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছে। মুজিবের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সে বিষয়ে বিরোধপূর্ণ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কিছু রিপোর্টের দাবি, তিনি গৃহবন্দী রয়েছেন। অন্যদের মতে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। [এর পরের একটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। ঢাকায় ২৪ ঘণ্টার সান্ধ্য আইন কার্যকর রয়েছে। বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, দেশটি এখন থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিতি পাবে।

এটা এখনো সুনির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার নয় যে সামরিক বাহিনীর কোন অংশটি এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত। কিংবা নতুন সরকারের ধরন কেমন হবে।

মোশতাক আহমদ অবশ্য একজন উদারপন্থী। তাঁকে মন্ত্রিসভার সবচেয়ে পাশ্চাত্যপন্থী এবং শাসকদলের উদারপন্থী গ্রুপের নেতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। মোশতাক আহমদ তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা যেহেতু সংহত করতে চাইছেন, তাই তিনি তাঁর দলের ডানপন্থীদের সমর্থন চাইতে পারেন। এই ডানপন্থীরা সম্প্রতি রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের বামমুখিতার কারণে বহুদিন ধরে অসন্তুষ্ট ছিলেন। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর মুজিবের কথিত নির্ভরশীলতা এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনের কারণেও তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন।

অভ্যুত্থানের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি এখনো অজ্ঞাত রয়ে গেছে; সাম্প্রতিক মাসগুলোয় যদিও কতিপয় বাঙালি মুজিবের বিরুদ্ধে সাহসী বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তাঁর শাসন নিয়ে অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে, দেশের অব্যাহত গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলায় তিনি অসমর্থ হয়ে পড়েছিলেন। [এর পরের একটি বা দুটি প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]

ভারত বাংলাদেশের ঘটনাবলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। নয়াদিল্লি ঢাকায় একটি স্থিতিশীল ও বন্ধু-সরকারের উপস্থিতিকে তার স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। তবে ভারতীয়রা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অব্যাহত ভারতীয় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ যদি আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়া ঠেকাতে একেবারেই অক্ষম না হয়ে পড়ে, তাহলে তারা সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে খুব শিথিল মনোভাব দেখাবে। এমনকি তখন সেই পরিস্থিতিতেও ঢাকার সরকারের অনুরোধ না পেলে নয়াদিল্লি সম্ভবত অপেক্ষা করবে। [এর পরের একটি বা দুটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

১৬ আগস্ট ১৯৭৫ : অবিতর্কিত প্রাধান্য

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন (ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড) টপ সিক্রেট। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ মার্চ, ২০০৭।

সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বাধীন গতকালের অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। একটি নতুন বেসামরিক সরকার স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু একটি সামরিক জান্তার জন্য সরকারটি শুধুই একটি ফ্রন্ট হতে পারে। প্রেসিডেন্ট আহমদ ১০ সদস্যের মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেছেন। এতে প্রেসিডেন্ট মুজিবের সাবেক সরকার এবং আওয়ামী লীগের অবিতর্কিত সদস্যদের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। দলে ও সরকারে মুজিবের যাঁরা ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

নতুন সরকার সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্যে সমর্থন লাভ করছে। এর মধ্যে ১৬ হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের ভারপ্রাপ্ত প্রধানও রয়েছেন। এই বাহিনী, বিশেষ করে যাঁরা মুজিবের ঘনিষ্ঠ এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিয়ে গঠিত। [এর পরের একটি বড় অংশ প্রকাশ করা হয়নি]

পাকিস্তানই হলো প্রথম রাষ্ট্র যারা নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঢাকার এই পরিবর্তন দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার সুযোগ এনে দিয়েছে। এখানে একটা অচলাবস্থা বিরাজ করছিল, যার জন্য অংশত ইসলামাবাদের প্রতি নানা বিষয়ে মুজিবের আপসহীনতা দায়ী ছিল।

নয়াদিল্লির তরফ থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়নি। ভারত সরকার, যার সঙ্গে মুজিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তারা নতুন সরকারকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু নতুন সরকারের বিরুদ্ধে যদি প্রতিরোধ গড়ে না ওঠে এবং তা গৃহযুদ্ধ ডেকে না আনে, তাহলে তাদের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কম। মোশতাক আহমদ ভারতীয় স্পর্শকাতরতার বিষয়ে সতর্ক রয়েছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ভাগ্যের বিষয়ে এবং দৃশ্যত নয়াদিল্লির এই আশঙ্কা প্রশমনে তিনি সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেবেন। এর পরের একটি বা দুটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

১৮ আগস্ট ১৯৭৫ : মধ্যপন্থী ও রক্ষণশীলদের ঠাঁই

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন। ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড (ইউএসআইবি)। টপ সিক্রেট। নম্বর ৬৬৯। পৃষ্ঠা নম্বর ৩। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৬ মার্চ ২০০৭।

শুক্রবার সংঘটিত সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের পরে প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। সামরিক আইন দৃশ্যত কার্যকর রয়েছে।

নতুন সরকার পাকিস্তানসহ অন্য ইসলামিক দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষার দিকে এগোচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক খুবই সীমিত পর্যায়ে থেকে গেছে। ঢাকা সম্ভবত ভারতের সঙ্গে যতটা সম্ভব সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইছে। তবে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুজিবের আমলে যে রকম ছিল, ততটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। [এর পরের একটি প্যারা প্রকাশ করা হয়নি] মোশতাকের নতুন মন্ত্রিসভায় মুজিব সরকার ও আওয়ামী লীগ দলের মধ্যপন্থী ও রক্ষণশীল সদস্যদের ঠাঁই দেওয়া হয়েছে।

মোশতাক ঘোষণা দিয়েছেন যে তাঁর সরকার তিনটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চায়। পাকিস্তান প্রথম দেশ, শুক্রবার যারা নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তারা ৫০ হাজার টন চাল এবং ১৫ মিলিয়ন গজ কাপড় পাঠানোর অঙ্গীকার করেছে। বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পাকিস্তান অন্য ইসলামি দেশগুলোর প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে। সৌদি আরব ও সুদান একই পথ ধরেছে। বাংলাদেশের নতুন শাসকেরা সন্দেহাতীতভাবে ইসলামি দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পেতে ব্যগ্র।

নতুন সরকারের ব্যাপারে ভারত এ পর্যন্ত সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। তাদের অবস্থানটি মুজিব সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ এবং সাধারণভাবে ভারতঘেঁষা বৈশিষ্ট্য থেকে একটি বিচ্যুতি বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। রোববার প্রকাশিত ভারতের এক সরকারি বিবৃতিতে বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভারত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। তাসের প্রতিবেদন ইঙ্গিত দিচ্ছে, মস্কো নিজেও অপেক্ষা করার নীতি অনুসরণ করছে। পিকিংয়ের সংবাদ সংস্থা অভ্যুত্থানের খবর দিয়েছে কিন্তু এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

১৯ আগস্ট ১৯৭৫ : মস্কোর বিস্ময়

স্টাফ নোটস : সোভিয়েত ইউনিয়ন ইস্টার্ন ইউরোপ। টপ সিক্রেট। পৃষ্ঠা : ৪-৫। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ১৬ মে ২০০২। বাংলাদেশে অভ্যুত্থান : মস্কোর প্রতিক্রিয়া।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের বিষয়ে সোভিয়েতরা প্রকাশ্যে কোনো বক্তব্য দিতে বিরত থাকছে। কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষক সন্দেহাতীতভাবে লক্ষ করছেন যে, ওই অভ্যুত্থান বাংলাদেশে সোভিয়েত ও ভারতীয় স্বার্থের জন্য একটি আঘাত।

সাবেক প্রেসিডেন্ট মুজিবের সঙ্গে মস্কোর সমস্যা চলছিল। কারণ, অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে মস্কোর কার্পণ্যে মুজিব রুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েতরা মনে করছেন, মুজিবই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি অর্থনৈতিক সমস্যার বোঝায় পীড়িত দেশটিকে বিভক্তি (ডিজইন্টেগ্রেটিং) থেকে বাঁচাতে পারবেন। তাঁরা মুজিবের অধিকতর কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কেবলই মস্কোর নিজেদের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল বলে নয়, তাঁরা আশা করেছিলেন যে এ ব্যবস্থার মধ্যে মুজিব বাংলাদেশের সমস্যাবলিকে অধিকতর কার্যকরভাবে সামলাতে পারবেন।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকে মস্কো বিস্ময়ের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে বলে মনে হচ্ছে। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের আগের দিন মস্কোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন দক্ষিণ এশীয় 'বিশেষজ্ঞ' বলেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন, বাঙালি সরকারকে তার প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি থেকে মুক্তি দিতে মুজিবের সামনে ভালো একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, মুজিবের ব্যাপকভিত্তিক, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় সমর্থন ছিল। অভ্যুত্থানের দিনটিতে ঢাকায় সোভিয়েত কর্মকর্তাদের অভ্যুত্থানের উৎস এবং নতুন সরকারের পক্ষপাতের ওপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুধাবনের জন্য ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে।[১]

বাংলাদেশের নতুন সরকারকে পাকিস্তানের আগাম স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনায় সোভিয়েতরা সম্ভবত অস্বস্তি বোধ করেছে। কারণ, তাদের আশঙ্কা রয়েছে পাকিস্তানি ও বাঙালিদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন শুধু ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লি এবং মস্কোর সম্পর্কের অবনতির বিনিময়েই ঘটতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অভ্যুত্থানের নেতাদের কথিত সহানুভূতিশীলতার বিষয়টিও তাদের অখুশি করেছে। তাদের সবচেয়ে বড়

---

১. মূল ইংরেজি ভাষ্য : 'The coup seems to have taken Moscow by surprise. The day before, one of the USSR's South Asian "experts" in Moscow had said he thought Mujib had a good chance of ridding the Bengali government of its administrative chaos and corruption because Mujib enjoyed broad popular support, especially among younger cadres. The day of the coup, Soviet officials in Dacca were busily scurrying about town trying to find out about the origins of the coup and the orientation of the new regime.'

উদ্বেগ হচ্ছে, নতুন সরকার চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেবে।

এখন কোন দিকে বাতাস বইছে সে বিষয়ে তাদের ধারণা পরিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত সোভিয়েতরা এমন কিছুই করবে না কিংবা এমন কিছুই বলবে না, যাতে তাদের প্রতি নতুন নেতারা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ আগের মতো একই পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে বলে নতুন সরকার যে সংকল্প ব্যক্ত করেছে, তার বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে ভারতকেই নেতৃত্বের আসনে রাখতে চাইবে তারা। যদিও দৃশ্যত ভারতের পক্ষে কোনো উপদেশের দরকার নেই, তার পরও সোভিয়েতরা সম্ভাব্য অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকতে ভারতকে হুঁশিয়ার করে দেবে। [এর পরের বাক্য বা বাক্যাংশ প্রকাশ করা হয়নি] ভারত যখন বিশ্বাস করে নতুন সরকার ভারতবিরোধী এবং সোভিয়েতবিরোধী, তখন তারা কী ঘটে তা দেখার জন্য অপেক্ষার নীতি অনুসরণ আশা করবে।

সোভিয়েতরা বাংলাদেশের কিংবা প্রতিবেশীর ঘটনাবলির 'domino effect'[২] নিয়েও উদ্বিগ্ন হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর ক্ষমতালিপ্সাকে মস্কো সমর্থন দিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের আগে ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক পদক্ষেপের ফলে একটি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে তারা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। [এর পরের এক বা একাধিক বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

২০ আগস্ট ১৯৭৫ : পিকিং ও মস্কোর নীরবতা

ফরেন ব্রডকাস্ট ইনফরমেশন সার্ভিস—এফবিআইএস। কনফিডেনশিয়াল। ভলিউম. ২৪, নং-৩৩। ট্রেন্ডস ইন কমিউনিস্ট মিডিয়া। পৃষ্ঠা : ২৯। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

বাংলাদেশ : পিকিং, মস্কো অভ্যুত্থানের খবর দিয়েছে। কিন্তু সরকারি মন্তব্য পরিহার করেছে

মস্কো ও পিকিং বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার উৎখাতের জন্য সংঘটিত ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাতে রহমানের প্রশাসনের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাতের প্রতিফলন ঘটেছে। মস্কো কিংবা পিকিং কেউ এখন পর্যন্ত কোনো

---

২. ডমিনো তত্ত্ব পঞ্চাশ থেকে আশির দশকে মার্কিনরা ব্যবহার করতেন। কোনো এক অঞ্চলের একটি দেশ যদি কমিউনিজমের প্রভাবে চলে যেত, তখন পার্শ্ববর্তী অন্য দেশগুলোর ওপরও তার প্রভাব পড়ত।

কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্য প্রচার করেনি। পিকিং অভ্যুত্থান সম্পর্কে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য ১৬, ১৮ ও ১৯ আগস্টের এনসিএনএ [নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি] প্রতিবেদনগুলোতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—কোনোভাবেই ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ওই ক্যু-কে ক্ষতিকর হিসেবে চিত্রিত করেনি। তবে এতে নতুন সরকারের প্রতি শক্তিশালী চীনা অনুমোদনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কোনো রাখঢাক ছাড়াই নতুন সরকারের প্রতি পাকিস্তানের চীনঘেঁষা ভুট্টো সরকারের সমর্থনের বিষয়টি তারা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে। মস্কো মূলত তাস পরিবেশিত সংক্ষিপ্ত, তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রচার করেছে এবং মস্কোর নিউজ আইটেম ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ায় সম্প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে মস্কোর উদ্বেগ ১৭ আগস্টের বেতার মারফত প্রচারিত হয়েছে। তাদের রেডিও ভারতে উর্দু, বাংলা ও হিন্দিতে শোনা যায়। ওই খবরে ভারত সরকারের বিবৃতির এই অংশ উদ্ধৃত করা হয় যে, 'এসব ঘটনার প্রতি উদাসীন থাকা যায় না।' কিন্তু একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, ভারত সরকারের 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ' করার কোনো উদ্দেশ্য নেই। ১৭ আগস্ট মস্কো রেডিওর সাপ্তাহিক 'আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক গোলটেবিল কর্মসূচি'তে রাজনৈতিক ভাষ্যকার দুনায়েভ বলেন, অভ্যুত্থান সম্পর্কে 'মন্তব্য করা কঠিন' কিন্তু পরিস্থিতি 'সম্ভবত আগামী কয়েক দিনের মধ্যে স্পষ্টতর হবে।'

এনসিএনএর ১৬ আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা আগের দিন পরিচালিত এক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সরকার উৎখাত হয়েছে। কিন্তু এ সময় রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। ওই প্রতিবেদনে নতুন সরকারের ঘোষিত 'জোটনিরপেক্ষ নীতি' অনুসরণ, 'ইসলামি দেশগুলো ও জোটনিরপেক্ষ জাতিগুলো'র সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা এবং নির্দিষ্ট না করেও 'বাইরের হস্তক্ষেপের' বিরোধিতার ঘোষণা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখিত হয়। এ প্রতিবেদনে নতুন সরকার যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তার স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে অভ্যুত্থানের পর রাজধানী ঢাকা 'শান্ত' রয়েছে। ১৯ আগস্টের এনসিএনএ প্রতিবেদন বিদেশি সংবাদ সংস্থার যে প্রতিবেদনের বরাতে উল্লেখ করে অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে'। ১৮ আগস্ট এনসিএনএ নতুন সরকারকে পাকিস্তান যে দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েছে এবং 'অবিলম্বে' সাহায্য প্রেরণ করেছে তা ফলাও করে প্রচার করে। ওই প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, নতুন সরকার

অন্য মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সৌদি আরব ও সুদানের যৌথ ঘোষণার বরাতে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়, নতুন সরকার 'ইসলামি সংহতি শক্তিশালীকরণের পথে' সাফল্য অর্জন করবে।

২১ আগস্ট ১৯৭৫ : সামরিক বাহিনীর ভাগাভাগি

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন। ইউএসআইবি। টপ সিক্রেট নং ৬৬৯। পৃষ্ঠা : ৫-৭। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত : ৭ মার্চ ২০০৭।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেতরে মধ্যম ও জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের পদগুলোর জন্য বিভিন্নমুখী প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ায় মন-কষাকষি ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। সরকারের কার্যক্রমগুলো যখন নিশ্চল, তখন কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা নতুন সরকারের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, তারা নিজেদের সম্পর্কের হিসাব চুকিয়ে নিচ্ছে।

মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীর মধ্যে যে ঐক্য বজায় রয়েছে তা যাতে বাইরে থেকে চোখে পড়ে, সে জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি তাঁদের মধ্যকার বিরোধ তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা রয়েছে। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা যুক্তি দিচ্ছেন, মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত চেইন অব কমান্ডের প্রতি সম্মান দেখাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলেছে। তরুণ কর্মকর্তারা দৃশ্যত মনে করছেন, এ সপ্তাহের গোড়ায় একটি সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব হয়েছে। এ সমঝোতার অনুসারে একটি নতুন নীতিনির্ধারণী গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হবে। যেখানে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁরা ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেবেন।

জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদমর্যাদায় তৃতীয় অবস্থানে থাকা চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্তৃত্বময় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন। বলা হচ্ছে, তিনি শৃঙ্খলাভঙ্গকারী অভ্যুত্থানের নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মেজর ফারুক, তাঁর নেফিউ (ভাতিজা/ ভাগিনেয়) অভ্যুত্থানের আগের বিশ্বস্ত ব্যক্তি মেজর রশিদ, তিনি প্রেসিডেন্ট মোশতাকেরও নেফিউ। [এরপর একটি বা দুটি প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]

২২ আগস্ট ১৯৭৫ : চীনকে অনুরোধ

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন। ইউএসআইবি। টপ সিক্রেট। নং ৬৭৪। পৃষ্ঠা : ৬। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৬ মার্চ, ২০০৭।

ঢাকার নতুন শাসকেরা গত সপ্তাহের অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সম্ভাব্য মনোভাবের কথা ভেবে দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। এবং তাঁরা নয়াদিল্লির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ধর্মনিরপেক্ষ এবং ভারতপন্থী মুজিব সরকারের পরিবর্তে একটি অধিকতর ইসলামিঘেঁষা সরকারের উত্থানে ফাঁপরে পড়েছেন।

ঢাকা প্রকাশ্যে ও ঘরোয়াভাবে নয়াদিল্লিকে আশ্বস্ত করেছে যে, তারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাইছে এবং বাংলাদেশকে একটি 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' করার প্রাথমিক অবস্থান থেকে নিজেদের সরিয়ে এনেছে। তাদের এ ধরনের পদক্ষেপ ভারতীয়দের আশ্বস্ত করলেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো, যিনি ঢাকার অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁর তা ভালো লাগবে না। ভুট্টো বাংলাদেশে একটি পাকিস্তানপন্থী সরকারের উত্থানকে বিবেচনায় রেখেই পাকিস্তানের বন্ধুদের, বিশেষত পিকিং ও ইসলামি দেশগুলোর কাছে নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য আবেদন রাখছেন।

বলা হচ্ছে, ভারত এ সপ্তাহের গোড়ায় বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে সামরিক ইউনিটগুলো মোতায়েন করেছে। কিন্তু ভারতে মার্কিন কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন না যে নয়াদিল্লি বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁরা মনে করেন যে সৈন্য-সমাবেশের তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য কোনো এক আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই। কারণ, নতুন কোনো অস্থিতিশীলতা কিংবা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটলে ভারতে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটতে পারে। গতকাল প্রধানমন্ত্রী গান্ধী মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন, সীমান্তের কাছ থেকে তিনি ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করতে যাচ্ছেন।

পাকিস্তান ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মনে হচ্ছে, তারা বিষয়টি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তুলতে চীনকে অনুরোধ করেছে। [এর পরের এক বা দুটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

২২ আগস্ট ১৯৭৫ : জ্যেষ্ঠরা জানতেন

উইকলি সামারি। সিক্রেট। নং-০০৩৪/৭৫। কপি নং-৬১। পৃষ্ঠা : ৬-৭। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৫ এপ্রিল, ২০০৭।

বাংলাদেশ : সামরিক অভ্যুত্থান

গত শুক্রবার সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে নতুন সরকারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা কোনোভাবেই প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে মর্মে কোনো আভাস মিলছে না। সরকারের ভেতরে অবশ্য অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী মধ্যম পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তা এবং ষড়যন্ত্রকারীদের সমর্থনকারী জ্যেষ্ঠ
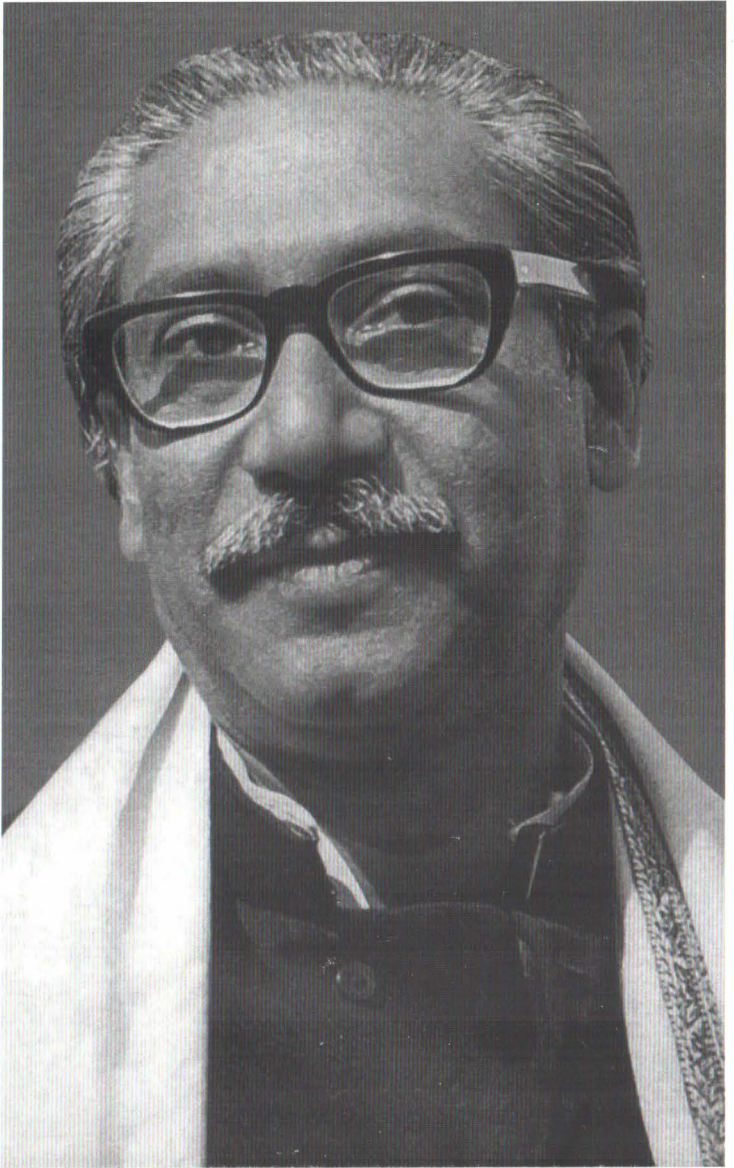
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৭ মার্চ ১৯২০-১৫ আগস্ট ১৯৭৫)

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ির সিঁড়িতে নিহত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সৌজন্যে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। জুমার নামাজ শেষে বঙ্গভবন মসজিদের বাইরে এসে দাঁড়ান খন্দকার মোশতাক আহমদ। সঙ্গে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও বঙ্গবন্ধু হত্যায় জড়িত সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা

ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী
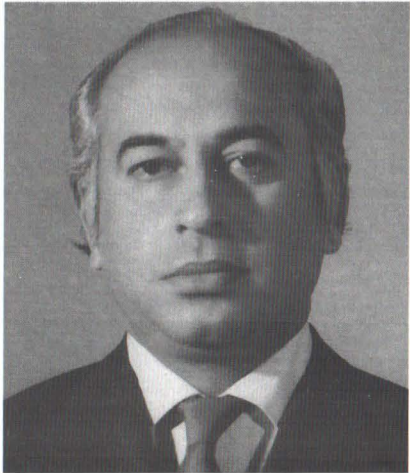
জুলফিকার আলী ভুট্টো, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
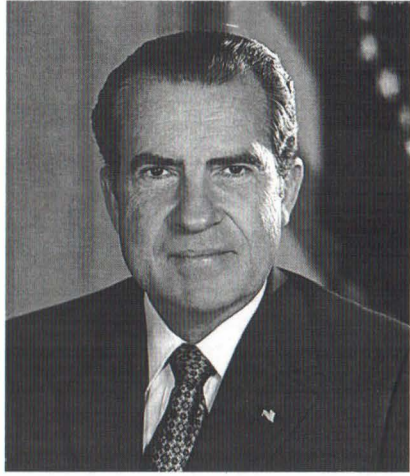
রিচার্ড নিক্সন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

হেনরি কিসিঞ্জার, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ডেভিস ইউজিন বোস্টার, বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

উইলিয়াম স্যাক্সবি, ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হেনরি আলফ্রেড বাইরোড, পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত
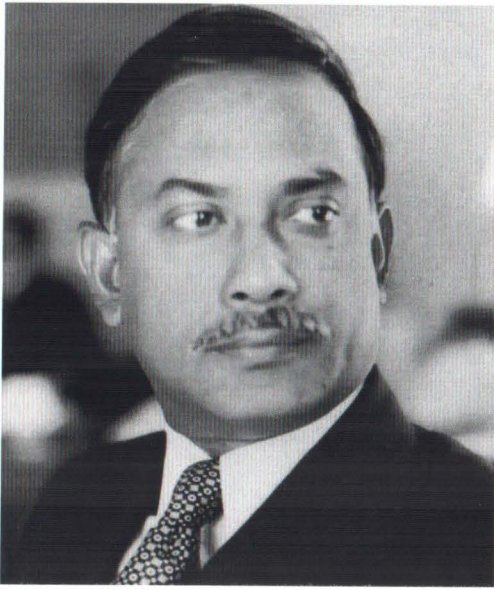
জিয়াউর রহমান
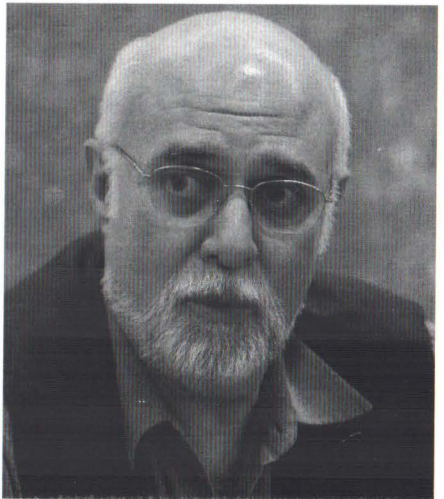
লরেন্স লিফশুলজ
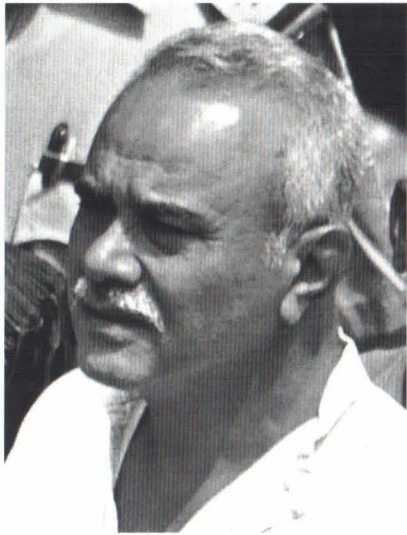
সৈয়দ ফারুক রহমান

খন্দকার আবদুর রশিদ

শরিফুল হক ডালিম

কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি ক্ষমতার লড়াই দানা বাঁধতে পারে। কিন্তু এখন তাঁরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

কিছুসংখ্যক মেজর অভ্যুত্থানের উসকানিদাতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁরা কিছু সময় ধরে প্রেসিডেন্ট মুজিবের দুর্নীতিগ্রস্ত, অদক্ষ এবং ক্রমশ কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন। এটা অনুমেয় যে, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত তাঁরা অভ্যুত্থানে অংশ নেননি। এ সপ্তাহে এ রকম ইঙ্গিত মিলেছে যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই গ্রুপের মধ্যে একটা উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে।

ষড়যন্ত্রকারীরা মুজিবের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বাছাই করেছেন। তাঁরা দেশ শাসনের জন্য তাঁকে ব্যাপক কর্তৃত্ব দিয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। মোশতাক অবশ্য সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যক্তিদের, যাঁরা নতুন সরকারে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবেন বলে মনে হয় না।

মোশতাক দীর্ঘকাল ধরে মুজিবের অধিকতর পাশ্চাত্যপন্থী এবং রক্ষণশীল অন্যতম রাজনৈতিক সহচর হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। তিনি মুজিব সরকার ও আওয়ামী লীগের মধ্যপন্থী বেসামরিক ব্যক্তিদেরই প্রধানত মন্ত্রিসভায় জায়গা দিয়েছেন। তাঁর সরকার দৃশ্যত চলতি বছরের গোড়ায় মুজিব যে গণতান্ত্রিক সরকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছিল, তা পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা শিগগিরই সামরিক আইন পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে সরকারের প্রাথমিক বিবৃতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে অন্য ইসলামি দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে যে পাকিস্তানের সঙ্গে মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ের সম্পর্ক ছিল, তারাই নতুন সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে। পাকিস্তানিরা চাল ও কাপড় পাঠিয়ে জরুরি অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেছে। সৌদি আরবসহ কিছু আরব দেশ ব্রিটেন ও জাপানের মতো স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

ইসলামি সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ এবং নতুন সরকারের ব্যাপারে পাকিস্তানিদের উৎসাহ নয়াদিল্লিকে কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তারা মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ এবং সাধারণভাবে ভারতপন্থী সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক ভোগ করে আসছিল। ভারতীয়রা সম্ভবত এটা ভেবেও অস্বস্তি বোধ করছে যে

নতুন সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের বদলে চীনের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে। তবে এখন পর্যন্ত ভারত সতর্কতামূলক অবস্থান নিয়েছে। বলা হয়, তারা সীমান্ত সিল করেছে এবং সন্নিহিত এলাকায় পুলিশ এবং সেনা ইউনিট মোতায়েন করেছে। কিন্তু ভারতে মার্কিন কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন, এ পদক্ষেপ কেবলই সম্ভাব্য কোনো আকস্মিক অবস্থা মোকাবিলার জন্য। বাংলাদেশের হিন্দুরা ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে শঙ্কিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারে। এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি সামলাতেই ভারতের ওই পদক্ষেপ।

ভারতীয়রা সম্ভবত বাংলাদেশে তেমন মাত্রায় অস্থিতিশীলতা না ঘটলে কিংবা নতুন সরকার কঠোরভাবে ভারতবিরোধী নীতি অনুসরণ না করলে সামরিক হস্তক্ষেপ করবে না। মোশতাককে ভারতের প্রতি কিছুটা শীতল হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে। গত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব আবার ফিরে এসেছিল। কিন্তু নতুন সরকার তার সীমান্তবর্তী বৃহৎ ও শক্তিশালী প্রতিবেশীকে বিরক্ত না করার নীতি গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশকে প্রাথমিকভাবে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' করার উদ্যোগ নিয়েও তারা সেখান থেকে সরে এসেছে।

মোশতাক ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর সরকার তিন বৃহৎ শক্তির সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। মুজিবের সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সাধারণভাবে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। চীনের সঙ্গে অবশ্য তাদের সম্পর্ক খারাপ ছিল। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে ইসলামাবাদের পক্ষ নিয়েছিল।

সোভিয়েতেরা প্রকাশ্যে অভ্যুত্থানের বিষয়ে মতামতহীন কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের মতোই তারা ধরে নিচ্ছে, এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার মিত্র ভারতের জন্য ক্ষতিকর। নতুন শাসকদের মার্কিনমুখী ঝোঁক দেখে মস্কো অবশ্য নিজেকে অসুখী ভাবছে। তার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ঢাকা এখন পিকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি সাধন চাইতে পারে।

ঢাকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সোভিয়েতেরা স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা হয়তো কিছুই করবে না। কিংবা এমন কিছুই বলবে না, যাতে নতুন নেতারা অসন্তুষ্ট হন। মস্কো সম্ভবত নতুন সরকারের সবার প্রতি বন্ধুত্ব নীতির বিশ্বস্ততা যাচাই করার জন্য ভারতের নেতৃত্বই মেনে নেবে। সোভিয়েতেরা অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ভারতকে সতর্ক করতে পারে, যদিও দৃশ্যত ভারতের তেমন কোনো উপদেশের দরকার নেই।

চীন সতর্কতার সঙ্গে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। অভ্যুত্থান সম্পর্কে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিবেদনগুলোতে এর প্রতিফলন ঘটেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে নতুন সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা দেখে পিকিং উৎসাহিত। এ ধারা যদি

অব্যাহত থাকে এবং নতুন সরকার যদি ক্ষমতায় টিকে যায়, তাহলে চীনারা, দৃষ্টিতে ভারতকে মোকাবিলা করতে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, তারা ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সম্ভবত দ্রুততার সঙ্গে ছুটে যাবে এবং অর্থনৈতিক সাহায্যও দেবে।

২৭ আগস্ট ১৯৭৫ : বৈধ ক্রুদ্ধতা

ট্রেন্ডস ইন কমিউনিস্ট মিডিয়া। কনফিডেনশিয়াল। ফরেন ব্রডকাস্ট ভলিউম ২৪, নং ৩৪, পৃষ্ঠা : ২০-২১। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

মুজিবের নীতির প্রতি অনুগত থাকতে *প্রাভদা* 'পর্যবেক্ষক'-এর আহ্বান

বাংলাদেশের ১৫ আগস্টের প্রতি মস্কোর প্রথম কর্তৃপক্ষীয় প্রতিক্রিয়া ২২ আগস্ট *প্রাভদায়* প্রকাশিত একটি নিবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। এই নিবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে এক দিকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে এবং অন্য দিকে নতুন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি অপরিবর্তিত থাকবে বলে যে ঘোষণা দিয়েছেন, তার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। *প্রাভদা* পর্যবেক্ষকের নামে প্রকাশিত নিবন্ধগুলোতে ঐতিহ্যগতভাবে সোভিয়েতের সরকারি অবস্থানের প্রতিফলন ঘটে থাকে। এসব নিবন্ধ গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধের নিচে কিন্তু নাম উল্লেখ করে যেসব নিবন্ধ ছাপা হয় তার ওপরে স্থান পেয়ে থাকে। পর্যবেক্ষকের নামে প্রকাশিত সর্বশেষ নিবন্ধে পর্তুগালের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য ছাপা হয়েছিল। *প্রাভদায়* সেটি প্রকাশিত হয় ১৯ আগস্ট ১৯৭৫।

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সাবেক প্রেসিডেন্টের অবদান বিষয়ে প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশের পর 'পর্যবেক্ষক' উল্লেখ করেন যে, মুজিব ও তাঁর পরিবারকে হত্যাকারী 'কসাই'দের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে 'বৈধ ক্রুদ্ধতা' (লেজিটেমেট ইনডিগনেশন) ছড়িয়ে পড়েছে। এবং তাঁর 'বিয়োগান্ত' মৃত্যুর ঘটনায় 'সোভিয়েত জনগণ তীব্র শোক প্রকাশ করছে।'

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করতে গিয়ে 'পর্যবেক্ষক' স্বীকার করেন যে প্রেসিডেন্ট আহমদের নতুন সরকার 'বৈদেশিক নীতির অপরিবর্তিত রূপরেখা' ঘোষণা করেছিলেন। এবং আহমদ 'ইতিপূর্বে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত ট্রিটি ও চুক্তিসমূহের প্রতি অনুগত থাকারও' ঘোষণা দিয়েছেন। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, 'বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকবৃন্দ' প্রশ্ন তুলছেন, 'সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদ এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার' শক্তিগুলো 'বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে 'কোনো প্রভাব' ফেলবে কি না।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পররাষ্ট্রনীতির 'ইতিবাচক ধারা'কে স্বাগত জানিয়ে পর্যবেক্ষক স্মরণ করেন যে সোভিয়েত-বাংলাদেশ সম্পর্কে 'উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি' ঘটেছিল। এবং তা 'আঞ্চলিক শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়'। নিবন্ধের উপসংহারে বলা হয়, বাংলাদেশের 'বন্ধুগণ' আশা প্রকাশ করেন যে দেশটি 'তার বৈদেশিক নীতির মৌলিক ধারার প্রতি অনুগত থাকবে' এবং বিশ্বশান্তির স্বার্থে অব্যাহতভাবে 'তার প্রতিবেশী এবং অন্যান্য দেশগুলোর' সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখবে।

এর পরবর্তী সোভিয়েত মিডিয়া রুটিনগতভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে পূর্বানুমান অনুযায়ী ওই পর্যবেক্ষকের নিবন্ধের প্রতিধ্বনি তুলেছে। মস্কো রেডিওর সাপ্তাহিক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক গোলটেবিল কর্মসূচির ২৪ আগস্টের সংস্করণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনৈতিক ভাষ্যকার দ্রাজিনিন (Druzhinin) পর্যবেক্ষকের নিবন্ধের আশঙ্কাই হুবহু পুনর্ব্যক্ত করেছেন। দ্রাজিনিন জাতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি বৈরী শক্তিগুলোর প্রভাব সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের 'বন্ধুদের' পক্ষে 'আশাবাদ' ব্যক্ত করেন যে বাংলাদেশের নতুন সরকার পূর্বের বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে যাবে।

২৯ আগস্ট ১৯৭৫ : কম ধর্মনিরপেক্ষ

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট। নং ০৮৪৯/৭৫। পৃষ্ঠা : ৬-৭। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট ২০০১।

পাকিস্তান : বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে ইসলামাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামাবাদ অব্যাহতভাবে মনে করছে যে ঢাকার অভ্যুত্থান পাকিস্তানের জন্য একটি অনুকূল অগ্রগতি। নতুন সরকার যদিও ভারতের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বের সঙ্গে আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। এবং আগেকার ইঙ্গিত অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' ঘোষণার অবস্থান থেকে সরে এসেছে।

ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস মনে করে যে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা স্বীকার করেন যে ভারতীয়কে হস্তক্ষেপের পক্ষে কোনো অজুহাত এড়িয়ে চলতে ঢাকার নতুন সরকারকে অবশ্যই নয়াদিল্লির প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানিরা—যারা নতুন সরকারকে অভ্যুত্থানের দিনই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—তারা আশাবাদী থাকছে যে অন্তত খুব সামান্য সীমিত পরিমাণে হলেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে একটা পরিবর্তন আসন্ন। তারা আশা করছে যে মুজিব সরকারের সঙ্গে নয়াদিল্লি ও মস্কোর যে মাত্রায় দহরম-

মহরম চলছিল তার প্রভাব হ্রাস পাবে। এবং একই সঙ্গে ঢাকার সঙ্গে ইসলামাবাদ, ওয়াশিংটন ও আরব দেশগুলো এবং পিকিং, যারা বাংলাদেশকে কখনো স্বীকৃতি দেয়নি, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। পাকিস্তানিরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করছে যে, সে ধরনের একটি নবতর পরিবর্তন আসন্ন। আর দক্ষিণ এশীয় আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্কে পাকিস্তানের অনুকূলে একটি পরিমিত পরিবর্তন ভারতের পূর্বাঞ্চলে একধরনের অনিশ্চয়তার সূচনা ঘটাবে।

বাংলাদেশ তার পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান মনে করে, আরব এবং চীনাদের শুভেচ্ছা ও অর্থনৈতিক সহায়তা পেতে হলে বাংলাদেশকে তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে হবে।

পাকিস্তানিরা চলতি এবং আসন্ন কতগুলো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখছে, যার মধ্যে তারা ঢাকার মনোভাবের ইঙ্গিত পাবে। তারা আশা করছে যে লিমায় অনুষ্ঠেয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে পাকিস্তানের পর্যবেক্ষক ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যকার যোগাযোগের ফলে পুরোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ঢাকার সম্মতি মিলবে। তারা আশা করছে যে, আগামী মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এশীয় আসনের জন্য ভারত ও পাকিস্তান যখন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, তখন বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করবে। পাকিস্তানিরা অবশ্য এই আশাবাদ ব্যক্ত করে যাবে যে মুজিবের আমলের পর বাংলাদেশ একটি অধিকতর ইসলামি রাষ্ট্র এবং মুজিবের তুলনায় অনেক কম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

ইসলামাবাদ বিশ্বাস করে যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার উন্নত সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানিরা সিমলা-প্রক্রিয়ার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। ১৯৭২ থেকে শুরু হওয়া ধারাবাহিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সিমলা-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান তাদের মধ্যকার কতিপয় মতভিন্নতা দূর করতে পেরেছিল। ইসলামাবাদ উপলব্ধি করতে পারছে যে তারা যদি এখন সিমলা আলোচনা পরিত্যাগ করে তাহলে নয়াদিল্লি এ বিষয়ে সন্ধিগ্ধ হয়ে পড়বে যে ঢাকার পরিবর্তন পাকিস্তানকে একটি সংঘাতের নীতি অনুসরণে উৎসাহিত করেছে। ভারতও অধিকতর সমঝোতার জন্য আগ্রহী রয়েছে। কিন্তু উভয় দেশ একে অন্যের প্রতি গভীরভাবে সন্দেহপ্রবণ রয়ে গেছে এবং আকাশ-যোগাযোগের ক্ষেত্রে চার বছর আগের স্থগিতাবস্থার এবং কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘ বিরোধের অবসানে কোনো ত্বরিত অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই।

২৯ আগস্ট ১৯৭৫ : জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের হুমকি

উইকলি সামারি। সিক্রেট। নং ০০৩৫/৭৫। প্রকাশের জন্য অনুমোদন ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬।

বাংলাদেশ শাসনক্ষমতা সংহত

দুই সপ্তাহ আগে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার নতুন সরকার সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কোথাও উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধের চিহ্ন নেই।

সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা সরকারে প্রভাব বিস্তার করে আছে, তাদের মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক একটি লড়াই চলছে। অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দানকারী তরুণ কর্মকর্তা এবং জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যকার লড়াই অন্তত এখন প্রশমিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের অংশটি এ সপ্তাহে সামরিক বাহিনীর শীর্ষপদে অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নিয়োগকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। নতুন সেনা নেতৃবৃন্দ আপাতদৃষ্টিতে অভ্যুত্থানের নেতাদের সমর্থন পেয়েছে।

অসন্তুষ্ট জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা অখুশি। কারণ, অভ্যুত্থানের নেতারা সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করেছে। এবং সরকার পরিচালনায় ভূমিকা রাখতে চাইছে। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের অংশটি এখন অভ্যুত্থানের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিচ্ছে। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা আপাতদৃষ্টিতে পিছু হটার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে শীর্ষ সেনা ইউনিটগুলোর আনুগত্যের ওপর তাঁরা কতটা ভরসা করতে পারেন সে বিষয়ে তাঁরা সম্ভবত সংশয়গ্রস্ত। এবং তাঁরা এটা ভেবেও সচেতন রয়েছেন যে, সামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরু হলে সেই অজুহাতে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে।

সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে সরকারি নীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ সমস্যায় পড়েছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোশতাক কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেননি। তবে তিনি বেসরকারি উদ্যোক্তা এবং বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়ে একটি বর্ধিত ভূমিকার অনুকূলে মনস্থির করেছেন।

এ পর্যন্ত তাঁর সরকার দুর্নীতির সমস্যা নিয়ে মনোযোগ দিতে সচেষ্ট রয়েছে। কঠোর সামরিক আইনবিধি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বিধানে অতীত এবং বর্তমান সরকারের কর্মকর্তাদের দুর্নীতিসংক্রান্ত কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অবৈধভাবে সহায়-সম্পদ অর্জনের অভিযোগে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুজিব সরকারের এবং আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নতুন সরকার অব্যাহতভাবে ভারতকে আশ্বস্ত করে চলেছে যে তার সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রেখে চলাই তার লক্ষ্য। ভারতীয়রা, বিশেষ করে মোশতাক সরকারের ইসলামি ভাবধারার দিকে ঝুঁকে পড়ায় উদ্বিগ্ন। এটা মুজিব সরকারের নীতি থেকে একটু বিচ্যুতি। মুজিব ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এখন ইসলামীকরণের ফলে বাংলাদেশের এক কোটি হিন্দুর পালিয়ে পূর্ব ভারতে আশ্রয় নেওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। নয়াদিল্লিকে আশ্বস্ত করতে নতুন সরকার বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে তারা ইসলামাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেও আগ্রহী। আর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা প্রয়োজনীয়ও। যদি তারা ইসলামি দেশের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

নয়াদিল্লি আপাতত হলেও ঢাকার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। ভারতীয়রা তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নতুন সরকারের কাছে ব্যক্ত করেছে। এবং জানামতে, ভারতে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা নিষিদ্ধ করেছে। তারা বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে সেনা ইউনিট মোতায়েনের আগেকার গুজবও প্রত্যাখ্যান করেছে। নয়াদিল্লি অবশ্য স্বীকার করেছে যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হলে একটি সম্ভাব্য উদ্বাস্তু স্রোত ঠেকাতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তারা আধা সামরিক বাহিনীর অবস্থান সীমান্তে শক্তিশালী করেছে। ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন সরকারকে 'ডিফ্যাক্টো' স্বীকৃতিও দিয়েছে। [এরপর একটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : মৃদু হাসি

স্টাফ নোটস : চায়নিজ অ্যাফেয়ার্স। টপ সিক্রেট। নং ১৬৩, প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৩১ আগস্ট ২০০৪। পৃষ্ঠা : ১৫-১৬।

ঢাকার জন্য মৃদু হাসি [এর পরের কথাগুলো প্রকাশ করা হয়নি]
বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় তার অবস্থান উন্নত করার ক্ষেত্রে পিকিং বরং দ্রুততার সঙ্গে সাড়া দিয়েছে। গত রোববার মুজিবুর রহমানকে উৎখাতের মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে চীন বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ আগের সরকারের আমলে পিকিং এ পর্যন্ত এগোতে অব্যাহতভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে এসেছে। [এরপর এক বা দুটি প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]

মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে পিকিং সম্ভবত সোভিয়েতকে সর্বাগ্রে মনে রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। [এর পরের একটি বা দুটি প্রকাশ করা হয়নি]

পিকিং এ ব্যাপারে ভালোভাবেই সচেতন রয়েছে যে ঢাকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ভারতীয়রা সুনজরে দেখবে না। কিন্তু তারা হিসাব কষে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে একটি চীনা স্বীকৃতি নয়াদিল্লিকে উসকে দেওয়ার পরিবর্তে বরং অনেক বেশি সামলানোর কাজে লাগবে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ভারতের কিছুটা অধিক পরিমাণে ঢাকাকে মেনে নেওয়ার মনোভাব হয়তো তাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে প্রভাবিত করেছে। চীনারা বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে ভারতীয়দের চটানোর বিষয়টি সব সময় সযত্নে এড়িয়ে চলেছে।

ঢাকায় সরকার পরিবর্তনের ফলে পিকিং ওই অঞ্চলে তার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘাটতি মেটাতে পারবে। এখন তারা সহজেই ভারতকে সামলাতে পারবে। একই সময়ে চীনারা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ সংকটের বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে সাধারণভাবে বিরত থাকছে। নয়াদিল্লির প্রতি তাদের এই মনোভাব হারিয়ে যাবে না। ভারতীয়রা ঢাকার সঙ্গে যেকোনো চীনা মেলবন্ধনকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করবে। এবং তাদের স্বার্থের জন্য অহিতকর হিসেবেও দেখবে। [এর পরের একটি বাক্য বা প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : মৈত্রী চুক্তিই ভিত্তি

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। টপ সিক্রেট। নং ১৪০, প্রকাশের জন্য অনুমোদন ৪ সেপ্টেম্বর ২০০২। পৃষ্ঠা : ৪-৬।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি

গত মাসে অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের নতুন সরকার ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে আসছে। প্রেসিডেন্ট মোশতাক 'সব জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ' সম্পর্ক গড়তে চাইছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশীদের সঙ্গে। ঢাকা পাকিস্তান ও চীনকে সতর্কতার সঙ্গে ও বাস্তবানুগভাবে সঙ্গে রাখছে। এই দুটি দেশের সঙ্গে সাবেক প্রেসিডেন্ট মুজিবের সীমিত যোগাযোগ ছিল। মোশতাক সরকার একই সঙ্গে মুজিব আমলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নকেও চটাতে চাইছে না। এ পর্যন্ত এই নীতি কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখেছে।

গত মাসের অভ্যুত্থান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ার পটভূমি তৈরি করেছে। ইসলামাবাদের সঙ্গে মতপার্থক্য দূর করার ব্যাপারে মুজিব আপসহীন থাকায় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা অংশত বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। অভ্যুত্থানের অল্প পরই মোশতাক প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে লিখেছেন—তিনি দুই দেশের মধ্যে একটি 'নতুন অধ্যায়' উন্মোচনের দিকে নজর রাখছেন।

ঢাকা অবশ্য মনে করে যে, অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদ ও দায়দেনার মতো সমস্যার সমাধানে ভুট্টোর সহযোগিতা তাদের প্রয়োজন।

পাকিস্তানিরা তাদের দিক থেকে ঢাকার নতুন সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল। অন্তত ইসলামাবাদ প্রথমেই নতুন সরকারকে এভাবে দেখেছে যে, মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ, ভারতপন্থী সরকারের সঙ্গে এই সরকারের বিরাট ব্যবধান। মোশতাক সরকার গোড়াতে রাষ্ট্রের ইসলামি চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল।

মোশতাক এবং তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী সামরিক কর্মকর্তারা অবগত রয়েছেন যে ভারতের শুভেচ্ছা তাঁদের দরকার এবং তাঁরা সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ঢাকা বুঝতে পেরেছে যে, প্রধানমন্ত্রী গান্ধী যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, বাংলাদেশে একটি সেনা হস্তক্ষেপ ভারতীয় স্বার্থের জন্য দরকার, তাহলে ভারত এখনো সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। বাংলাদেশ এটাও অবগত যে নয়াদিল্লির প্রতি কম অনুকূল নীতি গ্রহণের ফলে ভারত তাদের সন্দেহের চোখে দেখবে। ভারতের কথা মনে রেখেই ঢাকার সরকার বাংলাদেশকে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা থেকে বিরত থেকেছে। এর পরপরই মোশতাক প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর কাছে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আশ্বাসসূচক বার্তা পাঠিয়েছেন। ভারতকে নির্দিষ্টভাবে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান মৈত্রী চুক্তি এখনো দুই দেশের সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। ভারতীয়রা তাদের পক্ষ থেকে নতুন সরকারের পদক্ষেপগুলো ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে চলবে। তবে বর্তমানে ঢাকার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে যেতে ভারত সচেষ্ট থাকবে।

পিকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশের নতুন সরকার তার পূর্বসূরির চেয়ে অনেক বেশি জোরালো পদক্ষেপ নেবে। বাঙালিরা চীনের সাহায্য ও তাদের সঙ্গে বর্ধিত বাণিজ্য সম্পর্ক করতে চাইছে। এবং তারা নয়াদিল্লি ও মস্কোর সঙ্গে একটি অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্য অর্জনে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চাইবে। তারা একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অব্যাহত উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেবে।

গত বছর কিংবা তার কাছাকাছি সময় থেকে সোভিয়েতের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটেছে। এখন নতুন সরকারের আমলে তা আরও শীতল হবে, বিশেষ করে ঘনিষ্ঠ চীনা-বাঙালি সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালিরা সন্দেহাতীতভাবে আশা করবে যে, তারা সোভিয়েতের সঙ্গেও অপেক্ষাকৃত ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে এবং সে বিষয়ে তাদের সম্ভবত আশ্বস্ত করবে। মস্কো সম্ভবত মনে করছে যে, ঢাকার অভ্যুত্থান এবং নতুন সরকারের প্রতি পিকিংয়ের স্বীকৃতি সোভিয়েত ও ভারতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। মস্কো অবশ্য ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের

নতুন নেতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে তার ইচ্ছা স্পষ্ট করেছে। [এরপর একটি অংশ প্রকাশ করা হয়নি]

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : গৌরব-দ্যুতি ম্লান

স্টাফ নোটস : মিডিল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নং-০৮৫২/৭৫। পৃষ্ঠা : ৬-৭। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ২০ নভেম্বর, ২০০১।

বাংলাদেশ : অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা উদ্বেগ

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে নতুন সরকারের মধ্যে বিচলিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

গত সপ্তাহান্তে সরকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুজিবের একজন সাবেক বিশেষ সহকারী, বর্তমানে নিষিদ্ধ মুজিবের রাজনৈতিক দলের দুজন বিশিষ্ট নেতা এবং একজন পুলিশ সুপারকে গ্রেপ্তার করেছে। এই গ্রেপ্তারের খবর যথাসম্ভব কম প্রচার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি। সাম্প্রতিক কালে সামরিক আইন বিধির অধীনে যেসব গ্রেপ্তার ঘটেছে তা থেকে এবারের ধরনটা ভিন্ন। দৃশ্যত নতুন সরকারের ভেতরে কেউ কেউ এই তিনজনকে মুজিব সরকারের সম্ভাব্য উত্তরসূরি বেসামরিক নেতা হিসেবে গণ্য করছেন।

সপ্তাহান্তের আরেকটি ঘটনায় ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যারা অবৈধ অস্ত্র জমা দেবে, তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধারের এই অভিযানে অবশ্য কোনো বিস্ময় নেই। ক্ষমতায় আসার পরপরই সরকার বলেছে, ব্যাপক অবৈধ অস্ত্রের অস্তিত্ব সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয়। মুজিবের দলের অনেক সাবেক সদস্য এখনো অস্ত্র রেখে দিয়েছেন। এগুলো তাঁরা সাবেক সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

সরকারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি আরও নাজুক হয়ে পড়েছে গুজব ছড়িয়ে পড়ার কারণে। গুজব হলো, মুজিব-সমর্থকেরা প্রতিশোধ নিতে চোরাগোপ্তা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ছাড়া এমন খবর রয়েছে যে রেডিও বাংলাদেশ থেকে কয়েক ব্যক্তিকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা মুজিবের ভাষণের টেপ কপি করছিলেন। অনুমান করা হয় যে, কোনো গোপন বেতার থেকে এসব সম্প্রচার করাই ছিল এর লক্ষ্য।

আমাদের হাতে এমন কোনো অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, যার ভিত্তিতে গোপন গ্রুপগুলোর সঙ্গে মুজিবের অনুসারীদের একত্র হওয়ার কথা বলা যায়। কিন্তু নতুন সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি নাকচ করা যায় না। মুজিবকে যখন উৎখাত করা হয়, তখনো তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা কম ছিল না। যদিও গত বছর কিংবা এ রকম সময়ে তাঁর গৌরব-দ্যুতি ম্লান হয়ে

গিয়েছিল। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ অভ্যুত্থানের প্রতিশোধ নিতে এবং ক্ষমতা ও প্রভাব পুনরুদ্ধারে আগ্রহী।

চূড়ান্তভাবে নতুন সরকার কিছু মারাত্মক অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা করছে। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে দলাদলি এবং অভ্যুত্থানের তরুণ নেতারা যাঁরা সরকারে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী তাঁদের বিষয়টি এখনো অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। বাংলাদেশের গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখা যেকোনো সরকারের পক্ষেই একটি কঠিন বিষয়। বিশেষ করে, মুজিব তাঁর শুরুর দিনগুলোতে যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তার কিছুই বর্তমান সরকারের নেই। বরং সরকার অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত এবং তার জনপ্রিয়তাও সামান্য।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : মস্কো এয়ারক্রাফট দেবে

স্টাফ নোটস : মিডলইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নং-০৮৫৩/৭৫। পৃষ্ঠা : ৩-৫। সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি : সেনসেটিভ ইন্টেলিজেন্স সোর্সেস অ্যান্ড মেথডস ইনভলবড। প্রকাশের জন্য অনুমোদন : ৭ নভেম্বর ২০০১।

বাংলাদেশ সরকারের কিছু ভাবমূর্তি-উন্নয়নপ্রয়াস

অভ্যুত্থানের পর থেকে নতুন সরকার দ্রুতই নীতিনির্ধারণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে মনে হয়। অভ্যুত্থান-মুহূর্তে মুজিবকে অপসারণ করা ছাড়া অভ্যুত্থানের চক্রান্তকারীদের সামনে অন্য কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না।

প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদ্যোগের মধ্যে মুজিব আমলে সামরিক বাহিনী থেকে যাঁরা অযৌক্তিকভাবে অপসারিত হয়েছিলেন, তাঁদের বিষয়গুলোর পর্যালোচনা রয়েছে। এ সপ্তাহে সরকার অবশ্য কিছু মাঝারি অর্থনৈতিক উদ্যোগও নিয়েছে। যেমন কাপড় ও সিমেন্টের দাম কমিয়েছে এবং বিতরণ ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করেছে। অভ্যুত্থানের পরপরই কতিপয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া ঢাকা এখনো পর্যন্ত কোনো নাটকীয় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়নি। ওই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে মুজিব ও তাঁর কতিপয় সহযোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার বিষয়টিও রয়েছে।

নতুন সরকারের নেওয়া অন্যান্য ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে :

মুজিব সরকার এবং তার অধুনালুপ্ত দলের কথিত দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার।

গত জুনে মুজিব কর্তৃক জাতীয়করণকৃত দুটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র তাদের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

কোনো কারণ দর্শানো কিংবা আপিলের সুযোগ ছাড়াই সরকারি

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপসারণের বিধানসংবলিত মুজিবের জারি করা একটি আদেশ বাতিল করা।

এ সপ্তাহান্তে যাঁরা তাঁদের অবৈধ অস্ত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

এসব পদক্ষেপের সঙ্গে সরকার ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে কতিপয় বিধিনিষেধও আরোপ করেছে। তারা সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেছে এবং কঠোর সামরিক আইন জারি করেছে। সামরিক আইন বিধির আওতায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ব্যক্তি দণ্ডিত হয়েছেন। এমন জল্পনাকল্পনাও রয়েছে যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকার ঢাকায় কঠোর সান্ধ্য আইন পুনরায় বলবৎ করতে পারে। সরকার মনে করছে, এই পদক্ষেপের ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে, যেখানে অবৈধ অস্ত্রের মজুত থাকে বলে সন্দেহ করা হয়, তা উদ্ধার করা সহজ হবে।

বাংলাদেশ-ইউএসএসআর
উড়োজাহাজ-সংক্রান্ত আলোচনা শুরু।

যদিও সোভিয়েতের সঙ্গে মুজিবের যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল নতুন সরকার তা থেকে সরে এসেছে। তবু বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর এয়ারক্রাফটের জন্য অব্যাহতভাবে নির্ভরশীল থাকবে। [এর পরের একটি বাক্যাংশ প্রকাশ করা হয়নি]

১৫ আগস্টে অভ্যুত্থানের সময় এয়ারক্রাফট ক্রয়সংক্রান্ত একটি আলোচনা এগিয়েছিল। সেটা এখন আবার শুরু করা হয়েছে। [এর পরের একটি প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]

যদিও নতুন সরকারের বিদেশনীতির ঝোঁক দেখে মস্কো সন্দিহান, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা দৃশ্যত বাংলাদেশের কাছে এয়ারক্রাফট সরবরাহে আগ্রহী থাকার নীতি বজায় রাখবে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : প্রতিরক্ষা চুক্তি

স্টাফ নোটস : মিডিল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নং ০৮৫৫/৭৫। পৃষ্ঠা : ৬-৭। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট ২০০১।

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনা পরিবর্তন

প্রেসিডেন্ট মোশতাক জানামতে, সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগে কিছু পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করছেন। এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশে ভারতীয় ও সোভিয়েত উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর মনে যে সন্দেহ ও উদ্বেগ রয়েছে তার প্রতিফলন ঘটছে।

[এখানে একটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

মোশতাক বাংলাদেশের তুলনামূলক সামরিক দুর্বলতা উপলব্ধি করে ৩০ হাজার সদস্যের সেনাবাহিনীকে ৪৭ হাজারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছেন। এটা চলতি বছরের শেষের দিকে সম্পন্ন হবে, এমন আশাবাদ রয়েছে। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা কমিউনিটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আয়তন ২৮ হাজার বলে অনুমান করেছিল)। জানা মতে, তিনি পাকিস্তানের কাছ থেকেও সামরিক সরঞ্জাম সহায়তা চাইছেন। সেনাবাহিনীর লোকবল বাড়ানোর পরিকল্পনা অংশত বাস্তবায়িত হবে। কারণ, ১৫ হাজার সদস্যের আধা সামরিক রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট মুজিব রক্ষীবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং বিশ্বাস করা হতো যে, তারা মুজিবের প্রতি অনুগত থাকবে। মোশতাক সম্ভবত বিশ্বাস করছেন যে, রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের সহজেই নিয়মিত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সহজ হবে।

[এখানে একটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]

মোশতাক বাংলাদেশ গোয়েন্দা বিভাগের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে উদ্বেগ অনুভব করেন। কারণ তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে সম্ভাব্য সোভিয়েত কিংবা ভারতীয় নাশকতামূলক কার্যক্রমের বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য দিতে তারা ব্যর্থ হবে। [এর পরের একটি প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]

মোশতাক মধ্য আগস্টে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে, বিশেষ করে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিষয়ে সন্দেহপ্রবণ। [এর পরের বাক্য বা বাক্যাংশ প্রকাশ করা হয়নি]

মোশতাক এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির কথাও ভাবছেন। সম্ভবত তিনি ভারতীয় ও সোভিয়েত হস্তক্ষেপ থেকে তাঁর দেশকে রক্ষা করার ব্যাপারে চীনের ওপর ভরসা করছেন না।

সোভিয়েত ও ভারতীয়দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোশতাকের উদ্বেগ সম্ভবত যথার্থ। কিন্তু ইসলামাবাদ কিংবা পিকিংয়ের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা দৃশ্যত সুদূরপরাহত। মোশতাক উপলব্ধি করছেন যে, ভারতকে তাঁর অবশ্যই দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না। ভারত বাংলাদেশে যাতে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ না করে তার জন্য তিনি নয়াদিল্লিকে বুঝিয়েসুঝিয়ে সম্মত রাখছেন। ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই মোশতাক সরকারের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কারণ, তারা তার সরকারকে মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ ভারতপন্থী সরকার থেকে একটি বিচ্যুতি হিসেবে দেখছে। যদিও মোশতাক মুজিব শাসনামলের ঘনিষ্ঠতা পরিহার করে ইতিমধ্যেই কিছুটা দূরে সরে এসেছেন। কিন্তু তার পরও মস্কো যাতে বিরূপ না হয় সে দিকেও মোশতাক নজর রাখছেন। সামরিক এয়ারক্রাফটের জন্য মোশতাক মস্কোর ওপর নির্ভরশীল থাকতে চাইছেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : 'কেউ একজন'-এর জন্য

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নং-০৮৩৬০/৭৫। সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি : সেনসিটিভ ইন্টেলিজেন্স সোর্সেস অ্যান্ড মেথডস ইনভলবড। পৃষ্ঠা : ৩-৪। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট ২০০১।

বাংলাদেশ [এর পরের একটি অংশ প্রকাশ করা হয়নি] প্রায় ছয় মাস ক্ষমতায় থাকার পরও বাংলাদেশের নতুন সরকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুজিবের আগের শাসনামল থেকে নিজেকে পৃথক করতে খুব সামান্যই পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন সরকার বাংলাদেশ সংবিধানের চার মূলনীতি বজায় রাখার ব্যাপারে তাদের দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই চার মূলনীতি হলো—জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। কিন্তু তারা কার্যত অন্য কোনো নীতি ঘোষণা করেনি।

অভ্যন্তরীণভাবে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সরকার তার পূর্বসূরির মতোই কর্তৃত্বপরায়ণ নিরাপত্তাব্যবস্থা বহাল রেখেছে। দেশের দুর্দশার জন্য মুজিবের ক্ষমতার অপব্যবহারকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মুজিব অনুসৃত নীতিসমূহে বিরাট কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। নতুন নেতারা মুজিব ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার মতো যে অল্পসংখ্যক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এমনকি এর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ রয়েছে, যাতে অভ্যুত্থানপূর্ব নীতিসমূহেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

পররাষ্ট্র বিষয়ের ক্ষেত্রে [এখানে কয়েকটি শব্দ প্রকাশ করা হয়নি] পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টির মধ্য দিয়েও মুজিবের অনসৃত সবার প্রতি বন্ধুত্বের নীতিই পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। মুজিব নিজেই বাংলাদেশের ওপর ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ভারসাম্যপূর্ণ করতে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে অসফলভাবে হলেও চেষ্টা চালিয়েছিলেন। নতুন সরকার ইসলামাবাদ ও পিকিংয়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায় না, যাতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। এবং তারা ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে আশ্বস্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে।

বেসামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকি থেকে তাদের সুরক্ষার মতো যেসব রাজনৈতিক উদ্বেগের বিষয় রয়েছে তা চিহ্নিতকরণে সরকারের দৃঢ় নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সঙ্গে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী মেজর এবং জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের সম্পর্ক এখনো স্পষ্ট নয়।

অভ্যুত্থানের পর মেজরদের এবং কিছু জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তার মধ্যে নেতৃত্বের যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু তরুণ কর্মকর্তারা এখনো তাঁদের ইউনিটে ফিরে আসেননি। মোশতাককে তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন এবং একটি ঘটনায় তাঁর সিদ্ধান্তকে তাঁরা উল্টে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। মোশতাক সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর অনিশ্চিত অবস্থান সম্পর্কে সজাগ রয়েছেন। এবং তাঁদের স্বার্থের প্রতি সযত্নে মনোযোগ দিয়ে চলেছেন। সম্প্রতি তিনি মুজিব আমলে সামরিক বাহিনী থেকে যাঁরা অযৌক্তিকভাবে অপসারিত হয়েছিলেন, তাঁদের বিষয়গুলো পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যায়ভাবে অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি এই ক্যাটাগরিতে পড়ছেন।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি সরকারের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সামরিক আইনবিধি কঠোরভাবে জারি করা ছাড়াও সরকার মুজিবের কতিপয় সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত করেছে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সারা দেশে অভিযান শুরু করেছে। রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সরকারের শঙ্কিত হওয়ার আরও বড় একটি কারণ হলো, এ মর্মে অব্যাহত গুজব রয়েছে যে মুজিবের কতিপয় অনুসারী প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছেন।

এই নথিটিতে কোনো তারিখ নেই। তবে নথি পড়ে বোঝা যায়, এটি মোশতাক আহমদের বিশেষ দূত হিসেবে মহিউদ্দিন আহমদের মস্কো সফরের সময় প্রস্তুত করা হয়েছিল। এটি সিআইএর কোন বিভাগের তা-ও উল্লেখ নেই। তবে এর শ্রেণীকরণ হলো 'সিক্রেট'। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ২২ জুন ২০০৫।

সোভিয়েত-বাংলাদেশ: বাঙালি সরকার গত সপ্তাহে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিন দিনের এক আলোচনায় অংশ নিতে একজন বিশেষ দূতকে মস্কো পাঠিয়েছিল। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সোভিয়েতরা তাদের মনে দুটি সম্ভাব্য কার্যকারণ বিবেচনায় রাখছে বলে মনে হচ্ছে। [এর পরের একটি অংশ প্রকাশ করা হয়নি]

সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশীয় বিভাগের প্রধান [সম্ভবত এখানে কারও নাম ছিল কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়নি] ইঙ্গিত দিয়েছেন যে অভ্যুত্থানের উসকানিদাতা মেজররা 'কেউ একজন'-এর জন্য কাজ করেছিলেন [এর পরের একটি অংশ প্রকাশ করা হয়নি] এবং তিনি কিছুটা উঁচু গলায় বিস্ময় প্রকাশ করেন যে তিন বছর অপেক্ষার পর চীন কেন বর্তমান মুহূর্তে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে গেল। [এর পরের একটি অংশ প্রকাশ করা হয়নি]

কোনো কিছুরই যেন পরিবর্তন ঘটেনি, এমনভাবে মস্কো নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখছে। কিন্তু তারা একই সঙ্গে একধরনের প্রচারণার ঢাক বাজিয়ে চলেছে যাতে নতুন বাঙালি সরকারটি মুজিব অনুসৃত বিদেশনীতির যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকে।

এই দলিলের বক্তব্যের কাছাকাছি আরেকটি সুনির্দিষ্ট দলিল পাওয়া গেছে। এতে মুজিবের বিরুদ্ধে কেন অভ্যুত্থান চালানো হয়েছিল তার কারণ উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু তা সোভিয়েত পক্ষের।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা

'স্টাফ নোটস: সোভিয়েত ইউনিয়ন ইস্টার্ন ইউরোপ। টপ সিক্রেট। নং-০০৫১০/৭৫, পৃষ্ঠা : ৪, প্রকাশের জন্য অনুমোদন ৮ আগস্ট ২০০১।

সোভিয়েতদের বাঙালি দূত গ্রহণ

বাঙালি সরকার সোভিয়েত কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিন দিনের এক আলোচনায় যোগ দিতে একজন বিশেষ দূত মস্কোয় পাঠিয়েছে। এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সোভিয়েতদের পুনরায় আশ্বস্ত করা যে মস্কোর সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে ঢাকার নতুন সরকার আন্তরিক।

এ পর্যন্ত অন্তত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সোভিয়েতদের মনে দুই ধরনের বিষয় রেখাপাত করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। 'ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে পাকিস্তান-বাংলাদেশ সেকশনের সোভিয়েত-প্রধান সম্প্রতি একজন পশ্চিমা কর্মকর্তাকে বলেছেন যে মুজিব এবং অভ্যুত্থানের নেতাদের মধ্যকার একটি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণে আগস্টের অভ্যুত্থান ঘটে (মুজিব ও অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ) এবং এতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সংশ্লিষ্টতা নেই।'[৩]

তিনি নতুন সরকারকে চীনের আগাম স্বীকৃতির বিষয়ে পুরোপুরি শিথিল মনোভাব দেখান এবং যুক্তি দেন যে অভ্যুত্থান সংঘটনের ফলে বাংলাদেশকে চীনা স্বীকৃতির বিষয়টি কয়েক মাস এগিয়ে এসেছে মাত্র। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশীয়বিষয়ক প্রধান অবশ্য তার চেয়ে কম আশাবাদী

---

৩. ইংরেজি ভাষ্য : The Soviet who heads the Pakistan-Bangladesh section at the Oriental Studies Institute recently told a western official that the coup was result of a personal vendetta between Mujib and the coup leaders (this was indeed one of the causes of the coup) and that there was no significant external involvement.

লাইন নিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত দেন যে অভ্যুত্থান সংঘটনকারী মেজররা কেউ একজন ('some one') এর জন্য কাজ করছিলেন এবং তিনি কিছুটা উঁচু গলায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলছিলেন যে তিন বছর অপেক্ষা করার পর চীন কেন এখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই কর্মকর্তা তাঁর বর্তমান চাকরিতে নতুন এবং তাঁর পেশাগত জীবনের বেশির ভাগ সময় দক্ষিণ এশীয় নয়, দূরপ্রাচ্য বিষয় নিয়ে কেটেছে। তাঁর ওই মন্তব্য অভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েত প্রেসের কভারেজের সঙ্গে অধিকতর সংগতিপূর্ণ এবং সম্ভবত তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনোভাবেরও প্রতিফলন ঘটেছে। যেন কোনো কিছুরই পরিবর্তন ঘটেনি, এমনভাবে মস্কো নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখছে, আবার একই সঙ্গে প্রচারণার এই ঢাকও পিটিয়ে চলেছে যাতে নতুন বাঙালি সরকার মুজিবের বিদেশনীতির কাছাকাছি থাকে।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : অঙ্গীকারহীন

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নং ০৮৩৬১/৭৫। পৃষ্ঠা : ২, সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি : সেনসিটিভ ইন্টেলিজেন্স সোর্সেস অ্যান্ড মেথড ইনভলবড। প্রকাশের জন্য অনুমোদন : ৮ আগস্ট ২০০১।

বাংলাদেশ-ইউএসএসআর : মস্কো মিশন

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মোশতাকের বিশেষ প্রতিনিধি মহিউদ্দিন আহমদ গত সপ্তাহে মস্কোতে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই মিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, সোভিয়েতদের পুনর্নিশ্চয়তা দেওয়া যে ঢাকা আগের মতোই জোটনিরপেক্ষতায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। এবং মোশতাক সরকারকে পাকিস্তান ও চীন কর্তৃক দ্রুত স্বীকৃতি প্রদানের অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক জলাঞ্জলি দেওয়ার বিনিময়ে ওই দুটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে। [এরপর একটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি] মহিউদ্দিন বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত মনোভাবকে 'নন কমিটাল' (অঙ্গীকারহীন) হিসেবে লক্ষ করেন। সোভিয়েত গণমাধ্যম সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান এবং সোভিয়েতের বন্ধু সাবেক প্রেসিডেন্ট মুজিবের হত্যাকাণ্ডকে সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখছে। মস্কো ধারাবাহিকভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে, যাতে ঢাকার নতুন সরকার মুজিব অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতিকেই আঁকড়ে ধরে।

সোভিয়েত অভিসন্ধি নিয়ে ঢাকার নতুন সরকারের উদ্বেগ রয়েছে। কিন্তু তারা আশা করে যে মস্কোর সঙ্গে যুক্তিসংগত ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলাও

তাদের পক্ষে সম্ভব। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হতে পারে মস্কোতে একজন নুতন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ। এই পদ দুই মাসের বেশি সময় ধরে শূন্য রয়েছে।

৩ অক্টোবর ১৯৭৫ আলোচনা করেননি ইন্দিরা

স্টাফ নোটস: সোভিয়েত ইউনিয়ন ইস্টার্ন ইউরোপ। সিক্রেট। নং-১৭২। পৃষ্ঠা: ১৬, প্রকাশের জন্য অনুমোদন: ৬ মার্চ ২০০৭।

দক্ষিণ এশিয়া

ভারত, বাংলাদেশ: প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সোভিয়েতরা যে প্রচারণা শুরু করেছিল তা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মনে হচ্ছে, মস্কো এটা বিবেচনায় নিয়েছে যে গান্ধীর পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নিম্নগামী। গান্ধী যদিও সোভিয়েত সমর্থনের ব্যাপারে সন্দেহাতীতভাবে আস্থাশীল। তবু তিনি তাঁর সোভিয়েত ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি কম করে প্রদর্শনের ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সোভিয়েত পলিটব্যুরোর বিকল্প সদস্য সোলেমেন্তসেভ (Solomentsev)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের একটি সুযোগ এড়িয়ে গেছেন। পলিটব্যুরোর ওই সদস্য উত্তর ভিয়েতনাম থেকে মস্কো ফেরার পথে নয়াদিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের ঘটনা নিয়ে গান্ধী সোভিয়েতদের সঙ্গে আলোচনা করেননি।

মস্কো ও নয়াদিল্লি বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখছে। (উদাহরণস্বরূপ, মস্কো সম্প্রতি অস্ত্র সহায়তা-সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেছে।) কিন্তু দুটি দেশই এটা ভেবে উদ্বিগ্ন যে নতুন সরকার সোভিয়েতবিরোধী ও ভারতবিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হবে। [এর পরের একটি বা দুটি প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]

৬ অক্টোবর ১৯৭৫ ভুট্টোর সন্তুষ্টি

স্টাফ নোটস: মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নং-০৮৬৩/৭৫। পৃষ্ঠা: ২-৩। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৮ আগস্ট ২০০১।

চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত

বাংলাদেশের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পাকিস্তানি ও চীনা চুক্তির সাম্প্রতিক ঘোষণা সম্ভবত নয়াদিল্লি ও মস্কোতে কিছুটা উদ্বেগ সৃষ্টি করবে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তান বা চীন কারও কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না। মুজিবুর

রহমানের অনেকাংশে ব্যক্তিগত শাসনামলে, যা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা থেকে আগস্টের অভ্যুত্থান পর্যন্ত টিকে ছিল, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার গুরুত্ব দিয়ে বলেছে যে একটি অধিকতর 'ভারসাম্যপূর্ণ' বৈদেশিক নীতি অনুসরণ তাদের লক্ষ্য। ঢাকায় এই পরিবর্তনকে ইসলামাবাদ ও পিকিং স্বাগত জানিয়েছে। এবং আগাম কূটনৈতিক মিশন বিনিময়ের বিষয়টি প্রত্যাশিত ছিল।

ঢাকার নাটকীয় বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত সোভিয়েত আশঙ্কা প্রশমিত করতেই সম্ভবত মস্কোতে একজন বিশেষ দূত পাঠানো হয়েছিল।

পাকিস্তান-বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সহজে এগিয়ে যাবে যে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ১৯৭১ সালের গৃহযুদ্ধের পর দুই দেশের মধ্যে সম্পদ বণ্টন এবং পাকিস্তানে উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন-সংক্রান্ত দুটো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা সফল হয়নি। অতীতের চেয়ে বর্তমানে উভয় দেশ আপসে অধিকতর আগ্রহী হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে কঠিন দর-কষাকষিও চলবে বলে অনুমান করা যায়।

বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে ঢাকা আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে এখন বাণিজ্য সম্ভব। ঢাকা এবং অন্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নে পাকিস্তান সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো ঢাকার সঙ্গে উন্নত সম্পর্কের ফলে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ফায়দা ছাড়াও সম্ভবত ভারত একটি রাজনৈতিক আঘাত পেয়েছে, এটা দেখেও সন্তুষ্টি পেতে পারেন।

চীন, যারা অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে মূলত পাকিস্তানের পীড়াপীড়িতেই ঢাকার সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, তারা এখন, জানামতে, বাঙালি কর্মকর্তাদের বলেছে, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রথম হওয়ার বাসনায় তারা পাকিস্তানের মনোভাব জানার জন্য অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানি ও চীনা চুক্তিসমূহের বিস্তারিত বিষয়গুলো জাতিসংঘে বসে বাংলাদেশের ও চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভুট্টোর শীর্ষ বৈদেশিক নীতি উপদেষ্টা চূড়ান্ত করেছেন। বাঙালিরা চীনের কাছ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে বর্ধিত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা পাওয়ার আশা করছে।

৬ অক্টোবর ১৯৭৫ : ভারতীয় হস্তক্ষেপ

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন। ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড (ইউএসআইবি)। টপ সিক্রেট। কপি নং ৬৬৯। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৬ মার্চ ২০০৭।

ভারতের অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি। বাংলাদেশে একটি নতুন সরকারের আত্মপ্রকাশ ওই সম্পর্কগুলোর ওপর লক্ষণীয় পরিবর্তন ইতিমধ্যেই বয়ে এনেছে। ঢাকায় সরকার পরিবর্তনের ঘটনা বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। তবে অভ্যুত্থানের আগে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে যে সম্পর্ক একেবারেই ছিল না, বলা চলে, সেটা এখন বস্তুত হচ্ছে। ইসলামাবাদ ও পিকিং উভয়ে অভ্যুত্থানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। এবং নিকট ভবিষ্যতে উভয় দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বিশেষ করে, পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নয়ন করতে ব্যগ্র। পাকিস্তান সচেতন রয়েছে যে, এর ফলে দক্ষিণ এশীয় রাজনৈতিক ভারসাম্যে কিছুটা হলেও তার অনুকূলে একটা বাতাবরণ তৈরি হবে। অন্য দিকে ভারতের জন্য তার উত্তরাঞ্চলে কিছুটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে। (আসলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইতিমধ্যে মতৈক্যে পৌঁছেছে।

নয়াদিল্লি স্পষ্টত বাংলাদেশের নতুন সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট। এবং প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের ভারতের প্রতি হিমশীতল মনোভাবের কারণে উদ্বিগ্ন। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একধরনের 'প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট' সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ভিত্তি ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের প্রভাবশালী ভূমিকা। মোশতাক সরকার ভারতীয় উদ্বেগের বিষয়ে সচেতন রয়েছে। এবং ১৯৭২ সালে সম্পাদিত বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি যে এখনো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি, সে কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে তার বৃহৎ প্রতিবেশীকে আশ্বস্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ছাড়া সরকারের মধ্যে যাঁরা আছেন, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা-নির্বিশেষে, তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভারতের সঙ্গে মতভিন্নতা শান্তিপূর্ণভাবে সুরাহা করতে হবে। তাঁদের এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছার একটা বড় কারণ হলো, তাঁরা শঙ্কিত যে বাংলাদেশে গোলযোগ হলে সেই অজুহাতে ভারত হস্তক্ষেপ করে বসতে পারে।

বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের নানাবিধ বাধা রয়েছে। ভারতীয় নেতারা সজাগ রয়েছেন যে সে ধরনের হস্তক্ষেপ করা হলে তাঁদের বাংলাদেশের অন্য অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। আর তার ফলে ইতিমধ্যে অর্থনৈতিকভাবে নাজুক হয়ে পড়া ভারতের কাঁধে বোঝার পরিমাণ আরও বাড়বে। সর্বোপরি ভারতকে এমন একটা

পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে, সম্ভবত বাংলাদেশে, ভারতবিরোধী মনোভাব চাঙা থাকবে। নয়াদিল্লির আন্তর্জাতিক অবস্থানের ওপর তাতে কী প্রভাব ফেলবে, সেটাও তাঁদের শিরঃপীড়ার কারণ হবে। নির্দিষ্ট করে বললে ভারতীয়দের বিষয়ে শঙ্কিত থাকতে হবে যে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করলে তাদের গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। ইরান থেকে ভারতের জন্য তেলের সরবরাহ তাতে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এবং একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সহায়তা কনসোর্টিয়াম এবং বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তিও সমস্যার মধ্যে পড়তে পারে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় হস্তক্ষেপের একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি এখনো বিদ্যমান। বাংলাদেশের ভেতরকার পরিস্থিতি খুব বেশি মাত্রায় ভঙ্গুর। নতুন সরকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার মুখে পড়েছে, সেসবের অধিকাংশই মুজিব সরকারকেও পর্যুদস্ত করেছে। এসব সমস্যা একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে। আর এর ফলে একটি হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হতে পারে, যা বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু গমনের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে সেটা হয়তো ভারত সরকারকে আরও ইন্ধন জোগাতে পারে, যা একটি অভ্যুত্থান কিংবা ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি করবে। (ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ বিশ্বাস করে, একটি অভ্যুত্থানের যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। সম্ভবত ভারতের সহায়তায় আগামী বছরের মধ্যেই সেটা ঘটতে পারে। কিন্তু সরাসরি ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খুব কম। যদি সে ধরনের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয় এবং যদি ভারতে উদ্বাস্তু-স্রোত বইতে শুরু করে, তাহলে তেমন একটি ভারতীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।)

আরেকটি সম্ভাবনা রয়েছে, যা ঘটলে ভারতীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। আর সেটা হলো, মোশতাক কিংবা তাঁর অন্য কোনো উত্তরসূরি যদি পাকিস্তান ও চীনের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়ার নীতি গ্রহণ করে। [এর পরের একটি প্যারা প্রকাশ করা হয়নি]

১০ অক্টোবর ১৯৭৫ : মোশতাক শঙ্কিত

উইকলি সামারি। সিক্রেট নং-০৪১/৭৫। কপি নং-৭১। পৃষ্ঠা: ১৫। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ২ নভেম্বর, ২০১০।

বাংলাদেশ : অগ্রগতি প্রতিবেদন

নতুন সরকার তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় বাক্‌স্বাধীনতার বিষয়টিকে ব্যক্তি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সৎ শাসন প্রদানের একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চাইছে। তবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ উদারীকরণে সে কত দূর পর্যন্ত যাবে, সে বিষয়ে স্পষ্টতই তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কিছু ক্ষেত্রে তার কূটনৈতিক সাফল্য নিশ্চিত হয়েছে।

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট মোশতাক তাঁর সরকারকে বিগত মুজিব সরকারের আমল থেকে পৃথক দেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন। গত আগস্টে পতনের আগ পর্যন্ত মুজিবের সরকার খুব বেশি মাত্রায় স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। মোশতাক ঘোষণা দিয়েছেন যে, এক হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পর্যালোচনা করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি কাজ শুরু করবে। তিনি আরও ঘোষণা দিয়েছেন যে, অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা আগামী আগস্টে তুলে নেওয়া হবে। এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এসব পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও সরকার দৃশ্যত এখন পর্যন্ত তার কঠোর সামরিক আইনবিধি কার্যকর করে চলেছে। সারা দেশে ব্যাপক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং নতুন করে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী মধ্য সেপ্টেম্বরে এই অভিযান শুরুর পর থেকে দেড় হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকেই মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হবেন। সরকার এখন পর্যন্ত দৃশ্যত মুজিবের কতিপয় ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে অন্তরীণ রেখেছে, যাঁদের অভ্যুত্থানের পরই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগ প্রতিফলিত হচ্ছে। অন্তত সাময়িকভাবে হলেও অভ্যুত্থানের পর সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই স্তিমিত হয়েছে। কিন্তু অন্য অনেক সমস্যাও রয়েছে। উগ্রপন্থীদের দ্বারা সন্ত্রাসী হামলার অব্যাহত হুমকি ছাড়াও নতুন সরকার এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে মুজিবের সশস্ত্র সমর্থকেরা অভ্যুত্থানের প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের অগ্রগতি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কারণ, মুজিব চেয়েছিলেন, ইসলামাবাদ প্রথমেই অবাঙালি উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করবে এবং অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদ ভাগাভাগিতে

রাজি হবে। অন্য দিকে মোশতাক স্পষ্টতই কূটনীতিক বিনিময়ের পূর্বশর্ত হিসেবে এসব দাবি বিসর্জন দিতে সম্মত রয়েছেন।

বাঙালিরা এটা দেখাতে সতর্ক থাকবে যে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কের গুরুত্বকে তারা বড় করে দেখছে না। কারণ, ভারতের দিক থেকে একটা শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া যাতে না ঘটে সেটা তারা চাইবে। ভারত ইতিমধ্যেই নতুন সরকারের বিদেশি বন্ধু খোঁজার প্রবণতা সম্পর্কে উদ্বেগ অনুভব করতে শুরু করেছে। মোশতাক দৃশ্যত বাংলাদেশে ভারতের উদ্দেশ্য নিয়ে শঙ্কিত। এবং তাই ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আশ্বস্ত করতে তিনি পুনঃপুন উদ্যোগ নিয়েছেন।

১৭ অক্টোবর ১৯৭৫ : আবার টগবগিয়ে ফুটতে পারে

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া সিক্রেট নং ০৮৭০/৭৫। পৃষ্ঠা : ৫, প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৭ নভেম্বর ২০০১। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা বিদ্যমান।

ঢাকার সরকার দৃশ্যত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন রয়েছে। [পরের একটি বড় অংশ প্রকাশ করা হয়নি] এদিকে বাংলাদেশজুড়ে বিপুলসংখ্যক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান দ্বিতীয় মাসে পড়েছে। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এবং অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলবে। গত মাসে সরকার জানিয়েছে, অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে প্রায় দেড় হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকাটা আরও কিছু সময় স্থায়ী হবে। মুজিব-সমর্থকদের বিরোধিতা এবং বিগত সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষত ছাড়াও মোশতাক ও তাঁর সহযোগীদের অন্য অনেক জটিল সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। সামরিক বাহিনীতে অভ্যুত্থান-পরবর্তী নেতৃত্বের লড়াই যদিও বর্তমানে নিষ্ক্রিয় রয়েছে, তা আবার টগবগিয়ে ফুটতে পারে। মোশতাক সম্ভবত অনুভব করতে পারছেন, দেশের বিরাজমান সমস্যা সমাধানে তিনি যদি কিছুটা অগ্রগতি না আনতে পারেন, তাহলে জনগণ বিরূপ মনোভাব দেখাবে। এ পর্যন্ত তাঁরা কিছু নীতিনির্ধারণী উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু তার প্রতি যে মানুষ যথেষ্ট সাড়া দিয়েছে, তার তেমন কোনো লক্ষণ নেই।

২২ অক্টোবর ১৯৭৫ : সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবি

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নম্বর ০৮৭৩/৭৫, পৃষ্ঠা : ৪, ৫। প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ৩০ জুলাই ২০০২।

বাংলাদেশ : মোশতাকের সামনে চ্যালেঞ্জ

সশস্ত্র গেরিলাদের দ্বারা সেনাদলের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা এবং দেশটির স্থগিত হয়ে যাওয়া সংসদ সদস্যদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কঠোর সমালোচিত হওয়ার ঘটনায় নতুন সরকারের কার্যকারিতা ও স্থিতি নিয়ে সরকারি মহলে কিছুটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। যদিও এ ঘটনাগুলো সরকারের প্রতি কোনো গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করেনি। তবে এতে তাদের মৌলিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যতে আরও গুরুতর চ্যালেঞ্জ সামনে রয়েছে। আর তখন তা মোকাবিলায় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। নতুন কর্তৃপক্ষের সামনে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলকে বাগে রাখার চ্যালেঞ্জও রয়েছে।

গত আগস্টের অভ্যুত্থানের পর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন একটি গেরিলাদল বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সিদ্দিকী প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুজিবের একনিষ্ঠ সমর্থক। গত সাপ্তাহের গোড়ায় সরকারি সৈন্যরা একটি দ্বীপে অভিযান পরিচালনা করে। গেরিলারা সেখানে আত্মগোপন করেছে। [এর পরের এক ও একাধিক বাক্য প্রকাশ করা হয়নি] সরকারি বাহিনী ফাঁদে পড়েছিল এবং তাতে অনেকেই প্রাণ হারায়।

বাংলাদেশ সর্বদাই সশস্ত্র, কখনো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক, গেরিলাদের তৎপরতায় বিব্রত থাকে। মুজিব সময়ে সময়ে তাদের পাকড়াও করতে অভিযান চালানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। সাম্প্রতিক অ্যামবুশের পর মোশতাক সরকার ওই এলাকায় অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে, সিদ্দিকী ও তাঁর অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণ করাই এর লক্ষ্য। তবে সরকারের জন্য পদক্ষেপটি অধিকতর জটিল হতে পারে। কারণ, ঢাকার সরকার বিশ্বাস করছে যে ভারত সিদ্দিকীকে সহায়তা ও আশ্রয় দিচ্ছে।

অ্যামবুশের কিছুদিন পর সংসদের কিছু সদস্য মোশতাকের সঙ্গে এক দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা, জানামতে, আইনপ্রণেতাদের আস্থায় না নেওয়ায় প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করেন এবং অনতিবিলম্বে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের দাবি জানান। এর মধ্যে কয়েকজন নতুন সরকারের অধীনে বিভিন্নজনকে হয়রানি এবং মুজিবের পরিবারকে হত্যা করার দরকার ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রতীয়মান হচ্ছে, আইনপ্রণেতারা কার্যকরভাবে প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ঘটনাবলি ইঙ্গিত দিচ্ছে, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আস্থা ধরে রাখতে মোশতাককে ঝামেলা পোহাতে হবে। বিশেষ করে, ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে আগামী আগস্টে

রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবায়িত হয়।

২৯ অক্টোবর ১৯৭৫ উদ্যোগ নেয়নি রক্ষীবাহিনী

স্টাফ নোটস : মিলিটারি ডেভেলপমেন্টস। টপ সিক্রেট, নম্বর-৩৯৩০/৭৫, প্রকাশের জন্য অনুমোদিত ১৪ জানুয়ারি ২০০২। সেনসেটিভ ইন্টেলিজেন্স সোর্সেস অ্যান্ড মেথড ইনভলভড। পৃষ্ঠা : ৩, ৪, ৫। স্টাফ নোটস : সিআইএর অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য সাময়িক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এবং এতে অফিস অব স্ট্র্যাটেজিক রিসার্চের বিশ্লেষকদের তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে।

বাংলাদেশ : সাবেক প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনী বিলুপ্ত

বাংলাদেশ, কথিতমতে, ১৫ হাজার সদস্যের রক্ষীবাহিনী নামের আধা সামরিক বাহিনীকে নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। [এরপর একটি বাক্যাংশ প্রকাশ করা হয়নি]...ইউনিটের ১৭ ব্যাটালিয়নকে বিভক্ত করা হয়েছে। এবং গত মাসের গোড়ায় প্রেসিডেন্ট মোশতাক কর্তৃক ঘোষিত একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনার অধীনে তাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ঢাকায় সম্প্রতি শ্রুত এক বেতার ঘোষণায় সরকার প্রথমবারের মতো রক্ষীবাহিনীর নতুন মর্যাদা সম্পর্কে জানিয়েছে। সরকার আরও জানিয়েছে, এ ইউনিটের সাবেক সদস্যদের মধ্যে যাঁরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান, তাঁদের কঠোর বাছাই বিধিমালা মেনে চলতে হবে। সাবেক প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রক্ষীবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে এ বাহিনী গঠিত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আওতায় ওই ইউনিট স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতো। এটি ছিল সাবেক প্রেসিডেন্টের সরাসরি কমান্ডে ন্যস্ত। বলা হয়ে থাকে, রক্ষীবাহিনী প্রশিক্ষণ এবং সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চেয়ে অগ্রাধিকার পেত। আর এটা কেবলই আন্তবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। রক্ষীবাহিনী মুজিবের অনুগত ছিল বলে বিশ্বাস করা হতো। কিন্তু গত আগস্টে অভ্যুত্থানের সময় তারা দৃশ্যত অভ্যুত্থানকারীদের প্রতিহত করতে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এবং অভ্যুত্থানের কয়েক সপ্তাহ পরও নতুন সরকারের বিরোধিতায় তারা কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

ঢাকায় নয়াদিল্লি ও সাবেক সরকারের মধ্যে একটি সামরিক সহায়তা চুক্তির অধীনে ভারত রক্ষীবাহিনী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ

এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত। [এখানে একটি বা দুটি বাক্য প্রকাশ করা হয়নি]। ইউনিটগুলোকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে সেনাবাহিনীর ওপর ঢাকায় নতুন সরকারের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে প্রেসিডেন্ট মোশতাক সেনাবাহিনীর ইনভেন্টরি এবং প্রতিরক্ষামূলক সামর্থ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। রক্ষীবাহিনীকে গ্রহণ করার ফলে এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অস্ত্রধারী সদস্যের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। জানামতে, ঢাকা পাকিস্তানসহ সহযোগী মুসলিম দেশগুলোর কাছে সামরিক সহায়তা চাইছে। বাংলাদেশ ও চীন সম্প্রতি কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং ঢাকাকে কিছু ছোট অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে পিকিংয়ের সামনে একটা ভালো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। [এর পর একটি বড় অংশ প্রকাশ করা হয়নি এবং তার পরের চার পৃষ্ঠাও গোপন রাখা হয়েছে]

নভেম্বর ১৯৮২ : সংকল্পবদ্ধ তরুণ সেনা

বাংলাদেশ : এ হ্যান্ডবুক। সিক্রেট এনইএসএ৮২-১০৫৪৭। ৪৯ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এর ১৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়, '১৯৭৫ সালের আগস্টে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, অকার্যকর এবং সহিংসতাপ্রবণ হয়ে ওঠা সরকারের পতন ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের পরিচালিত অভ্যুত্থানে মুজিব নিহত হন।'

পূর্বযোগাযোগ ও জর্জ গ্রিফিন

লয়েড আরভিং রুডল্‌ফ ও সুসান হোবার রুডল্‌ফ ১৯৮০ সালে লিখেছেন, '১৯৭১ সালের ঘটনাবলির ব্যাপারে লরেন্স লিফশুলজের সব ব্যাখ্যার সঙ্গে আমি একমত নই। তবে এটা ঠিক যে, যাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ ছিল না, অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সমগ্র শীর্ষ নেতৃত্ব বাদ দিয়ে অন্যরা যাতে ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতায় অংশ নিতে পারেন, সে তথ্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন উল্লেখ করেছেন। কলকাতার যোগাযোগ, যা সর্বশেষ অক্টোবরে হয়েছিল এবং মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগের যে উদ্যোগ (নভেম্বরের শেষে) নেওয়া হয়েছিল, এই দুই সময়ের ব্যবধান এবং নভেম্বরের গোড়ায় ইয়াহিয়া যে শর্তাবলি আরোপ করেছিলেন, তা থেকে যে কেউ অনুমান করতে পারেন যে, এর সবটাই ছিল 'নিষ্ফল প্রয়াস'।[১]

লরেন্স লিফশুলজ পঁচাত্তরে ঢাকায় সিআইএর স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরিকে বলেছিলেন, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও অন্যান্য সূত্র আমাদের ১৯৭১ সালে কলকাতায় মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য দিয়েছে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধের সম্ভাব্য বিকল্প এক অন্য রকম শান্তিচুক্তির (পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন) ব্যাপারে ওখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের সঙ্গে তাঁদের গোপন আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। এখন আমাদের মনে হয়, ১৯৭১ সালে যাঁদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যোগাযোগ করেছিল, '৭৪-এর শেষ দিকে

---

১. *The Regional imperative: The Administration of US Foreign policy towards South Asian States Under Presidents Johnson and Nixon.* Lioyd I. Rudolph, Susanne Hoeber Rudolph, Concept Publishing Company, 1980, P. 424.

ওই একই লোকদের সঙ্গে পুরোনো যোগাযোগ নবায়ন করা হয়। অভিযোগ করা হয়, তাঁরা একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে মার্কিন মনোভাব জানতে দূতাবাসে এসেছিলেন।'

লিফশুলজের এ-সংক্রান্ত বক্তব্য অবশ্য চেরি 'ডাহা মিথ্যে' বলে নাকচ করে দেন। কিন্তু লিফশুলজের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, কলকাতায় ১৯৭১ সালে মোশতাককে ঘিরে তিনজন লোক যে ত্রিভুজ তৈরি করেছিল, মুজিব হত্যার দিন সকালে ঢাকা রেডিও স্টেশনে তাঁদেরকেই আবির্ভূত হতে দেখা যায়। অন্য দুজন হলেন মাহবুব আলম চাষী ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। লিফশুলজ আরও জানতে পারেন যে, এক মাস আগে থেকে তাঁরা কুমিল্লা ও অন্যান্য এলাকায় সভা করেছেন। এবং ১৫ তারিখে তাঁরা যা যা করতে যাচ্ছেন, তা নিয়েই তাঁদের বৈঠক হয়েছে।

লিফশুলজ ও কাই বার্ড নিউ ইয়র্কভিত্তিক *দ্য নেশন* পত্রিকায় যৌথভাবে লেখা এক নিবন্ধে বলেছেন, '১৯৭১-এ কলকাতার মার্কিন মিশনে রাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন জর্জ জি বি গ্রিফিন। ওই সময় তিনি দিল্লিতে রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংকে এড়িয়ে সরাসরি হোয়াইট হাউসে কথা বলতেন স্যান্ডার্স ও কিসিঞ্জারের সঙ্গে।'

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে লিফশুলজের দীর্ঘকালীন অনুসন্ধানের মূল ভিত্তি এই 'পূর্বযোগাযোগ'। আর এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশি 'ত্রিভুজের' সঙ্গে আর যে চরিত্রটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সেটি জর্জ গ্রিফিন। সুতরাং আমরা এই পূর্বযোগাযোগের পটভূমি ও তার ধারাবাহিকতার দিকে বিস্তারিত নজর দেব।

দ্য নেশন-এর অনলাইন আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত ওই নিবন্ধে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন গবেষণা সংস্থা কার্নেগি এন্ডাউমেন্টকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট সূত্র বলেছে, কিসিঞ্জার ১৯৭১-এ সরাসরি মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে কথা বলেছেন। ১৯৭৪ সালের বসন্তে ওই কর্মকর্তারা ছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। কাই বার্ড ও লিফশুলজের নিবন্ধের দাবি, মোশতাক গ্রুপটি সম্ভাব্য সরকার পরিবর্তন নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এবং তা কিসিঞ্জার ও স্যান্ডার্সকেও জানানো হয়।

লিফশুলজ কলকাতায় ১৯৭১-এ মোশতাক-চাষী-ঠাকুর এই ত্রিভুজ সম্পর্কের ওপর অব্যাহতভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। ওই সময়ে মার্কিন মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী গ্রিফিন সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ থেকে আগস্ট ৭২ পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। ১৯৭১-এ কলকাতায় কনসাল জেনারেল ছিলেন হার্ব গর্ডন। ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল

ছিলেন আর্চার ব্লাড। ঢাকায় পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন স্কট বুচার। জুলাই-আগস্টের দিকে ঢাকার দূতাবাস-কর্মকর্তারা তাঁদের পরিবার-পরিজন স্থানান্তর করেন। এ সময় স্কট বুচার তাঁর সংগ্রহে থাকা যাবতীয় নথিপত্র গ্রিফিনের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন বলে গ্রিফিন ৩০ এপ্রিল ২০০২ চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন।

ভারতে গ্রিফিনকে মনে করা হতো যে তিনি সিআইএর এজেন্ট। লেখকের সঙ্গে আলোচনায় জেনারেল জ্যাক জ্যাকবও তা নিশ্চিত করেন। বোম্বের *ব্লিৎজ* পত্রিকা গ্রিফিনকে সিআইএর এজেন্ট হিসেবে বর্ণনা করে। গ্রিফিনের কথায়, 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পত্রিকা *ব্লিৎজ* আমার নিন্দা করে। তারা আমাকে সিআইএর গুপ্তচর হিসেবে অভিযুক্ত করে। এরপর আরও একটি পত্রিকা আমাকে জড়িয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উভয় ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে একজন কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যের দেওয়া বক্তব্যের বরাত দেওয়া হয়। বলা হয় যে, আমি শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির (এসএলএফপি) সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছি। ১৯৬৪ সালে পূর্ব জার্মানিতে প্রকাশিত *হুজ হু ইন দ্য সিআইএ* শীর্ষক বই ছাপা হয়। সেখানে আমার নাম ছিল।' গ্রিফিন মনে করেন, আর্চার ব্লাড ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সৎ রিপোর্টিংয়ের জন্য বিপদে পড়েছিলেন।

সিআইএর ঘাতক গুপ্তচর

সোভিয়েত-সমর্থক ঢাকার বামপন্থী সাপ্তাহিক *একতায়* খবর বেরিয়েছিল, সিআইএ এজেন্ট জর্জ গ্রিফিন ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে যোগ দিচ্ছেন। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তি ছিল গ্রিফিনের উল্লেখিত পূর্বভূমিকা-সংক্রান্ত জল্পনাকল্পনা।

ইন্দিরা গান্ধী সুইজারল্যান্ড যাবেন। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে। কিন্তু ধরা পড়ল যান্ত্রিক ত্রুটি। কতগুলো তার কাটা অবস্থায় সবার নজরে এল। হুলুস্থুল কাণ্ড। এই ঘটনার পেছনে ভারত সরকার সেদিন যাকে অভিযুক্ত করেছিল তিনি জর্জ জি বি গ্রিফিন। তাঁর কূটনৈতিক জীবনের বেশির ভাগ সময় তাঁর নিজেরই কথায় 'সিআইএর একজন ঘাতক গুপ্তচর' হিসেবে অপবাদ জুটেছে। ভারত অভিযোগ করেছিল, গভীর রাতে গ্রিফিন নিজেই ওই তার কেটে রেখেছিলেন।

গ্রিফিন একসময় মার্কিন নৌবাহিনীতে ছিলেন। ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন ১৯৫৯ সালে। ইতালিতে ভাইস কনসাল হিসেবে তাঁর কূটনৈতিক জীবন শুরু।

১৯৬৭-৬৯ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিকট প্রাচ্য/দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরোতে ছিলেন। পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে ১৯৬৯-৭২ সালে কলকাতায়, ১৯৭২-৭৩ সালে ইসলামাবাদে, ১৯৭৩-৭৫ সালে লাহোরে ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার, ১৯৭৫-৭৯ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগে ছিলেন।

২০০২ সালের ৩০ এপ্রিল মার্কিন কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গ্রিফিন ১৯৭১ সালের গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন :

বাংলাদেশ যুদ্ধের আগে আমাদের কনস্যুলেট জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখছিলেন। আর্চার ব্লাড ছিলেন ঢাকার কনসাল জেনারেল। স্কট বুচার্ড ছিলেন পলিটিক্যাল অফিসার। ব্লাড ও বুচার্ড নিয়ে আমরা কৌতুক করতাম। বাঙালিরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। কারণ, জুলফিকার আলী ভুট্টো নির্বাচনী ফলাফল ছিনতাই করেছিলেন। বাঙালিদের নেতা শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছিলেন। কিন্তু ভুট্টো ইয়াহিয়া খান ও অন্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান শাসনের সুযোগ মুজিবকে দেওয়া ঠিক হবে না। পাকিস্তান সরকারের প্রধান হিসেবে কোনো বাঙালির উত্থান এমনই একটি বিষয় ছিল, যা তারা সত্যিই সহ্য করতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের বিষয়ে সত্যিকার অর্থেই বর্ণবাদী ছিল। সুতরাং পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকল। এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী গর্দভের মতো সামরিক অভিযান চালাল। মধ্য ৭১-এ উত্তর-পূর্ব ভারতে আমরা উদ্বাস্তুদের স্রোত লক্ষ করতে থাকি। একপর্যায়ে, ভারতীয়দের মতে, তা ১ কোটিতে পৌঁছায়। বিভিন্নভাবে আমরা এই তথ্য যাচাইয়ের চেষ্টা করি। তবে আমি এটা জোর দিয়ে বলতে পারি, ওই তথ্যের সত্যতা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলিনি। বিপুলসংখ্যক জনমানুষ। আমি বহুবার সীমান্ত এলাকায় গিয়েছি। সেখানে উদ্বাস্তুদের বহু শিবির। আমি অনেক মার্কিন রাজনীতিককেও নিয়ে গিয়েছি। তাঁদের মধ্যে সিনেটর টেড কেনেডি এবং রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান পিটার ফ্রে নিউ জার্সি থেকে নির্বাচিত। তিনি কংগ্রেসের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির নিকট প্রাচ্য/দক্ষিণ এশীয় সাবকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁরা খুবই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের শুধু পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আসাম কিংবা ত্রিপুরায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। যখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো তখন আমরা মার্কিন উদ্বাস্তু দেখতে শুরু করি। তাঁরা বুঝতে পারলেন পূর্ব পাকিস্তানে

থাকা তাঁদের জন্য নিরাপদ নয়। আর্চার ব্লাড ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের ঢাকা ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সর্বত্র রক্তপাত হচ্ছিল। তাই তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে সম্মত হন। আমাদের কর্মিবাহিনী প্রস্তুত ছিল মার্কিন উদ্বাস্তুদের সহায়তা দিতে। কিন্তু আমাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন দিতে হতো। সংকট ঘনীভূত হলে বিপুলসংখ্যক আমেরিকান রিপোর্টার কলকাতায় পৌঁছান। যুদ্ধকালে ৪০০-র বেশি মার্কিন সাংবাদিক কলকাতায় ছিলেন। আমার বস সাংবাদিকদের ব্রিফ করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করেন। তাতে আমার জন্য উপকারই হয়েছিল। কারণ, আমরা তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারতাম। আমার কনসাল জেনারেল হার্ব গর্ডনের কথা উল্লেখ করা দরকার। এর আগে তিনি নয়াদিল্লিতে পলিটিক্যাল কাউন্সিলর ছিলেন।

চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডি : মনে হচ্ছে, সেখানে ব্যাপক দারিদ্র্য ছিল।

গ্রিফিন : ১৯৬৬ সালে বিহারে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল। আমাদের পাবলিক ল ৪৮০-এর ধারায় সেখানে আমাদের বিপুল পরিমাণ খাদ্যসহায়তা কর্মসূচি ছিল, যা বহু মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিল। ১৯৬৯ সালে আমি গিয়ে দেখি মানুষ তা মনে রেখেছে। তখনো অনেক ধরনের কর্মসূচি চালু ছিল। কিন্তু তাতে নাটকীয় পরিবর্তন আসে বাংলাদেশের যুদ্ধকালে। মিসেস গান্ধী ইউসিস লাইব্রেরি বন্ধ করে দেন এবং বলেন যে, ভারতের আর পিএল ৪৮০-এর সহায়তার দরকার নেই। অনেক দিয়েছেন, ধন্যবাদ।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছিল?

গ্রিফিন : ঢাকার কনসাল জেনারেল সততা বজায় রেখে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন সে জন্য তিনি বিপদে পড়েন। আমরা শুনেছিলাম, ইসলামাবাদের পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের সঙ্গে তিনি বিবাদে জড়িয়েছিলেন। ফারল্যান্ড ছিলেন রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত। কোকাকোলা কোম্পানির সাবেক নির্বাহী ছিলেন তিনি। আর্চারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তিনি বড় বেশি বাঙালিদের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু তখন ঘটনা ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। উদ্বাস্তুরা সংঘাত থেকে বাঁচতে ভারতে চলে আসছে। কনস্যুলেট জেনারেলের সদস্যদের পরিবার-পরিজনকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। এমনকি ঢাকার কনস্যুলেট জেনারেল দপ্তরে সংরক্ষিত সবার জীবনবৃত্তান্ত-সংবলিত ফাইল পলিটিক্যাল অফিসার স্কট বুচার আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। মার্কিন মিশনারিদের একটি বড় দল নৌপথে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় পৌঁছান। আমরা তাঁদের সব রকম সহযোগিতা দিই। এ প্রেক্ষাপটে মার্কিন

মিডিয়া এগিয়ে আসে। যাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তিনি বেরি ডান্সমোর (*Barrie Dunsmore*)। তিনি রোমভিত্তিক এবিসি টিভির একজন প্রতিবেদক ছিলেন। যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে তখন প্রায় ৮০০ আমেরিকান সংবাদদাতা কলকাতায় ছিলেন। আমি আমার সব রুটিনকাজ ফেলে পূর্ব পাকিস্তান-সংকটের দিকে পুরো মনোযোগ ঢেলে দিই। উদ্বাস্তুদের মধ্যে একদল রাজনীতিবিদও ছিলেন।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : তাঁরা নিশ্চয় বাঙালি রাজনীতিবিদ।

গ্রিফিন : ঠিক বলেছেন। তাঁরা পূর্ব বাঙালি রাজনীতিবিদ। তাঁরা কলকাতায় একত্র হয়েছিলেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছিলেন। এর মধ্যে একাত্তরের জুলাই মাসের গোড়ায় হেনরি কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পথ প্রশস্ত করতে চীনে গোপন সফর করেন। তিনি প্রথমে আসেন ভারতে, এরপর পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে তিনি কিছুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যান। আমরা শুনেছিলাম, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, তিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। এবং অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় জরুরি সমস্যার দিকে তাঁরা নজর দিয়েছিলেন। পরে আমরা জানতে পারি, তাঁর মনে ছিল অন্য বিষয়।

যা-ই হোক না কেন, ওয়াশিংটনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কলকাতায় অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানিদের একটি ফিলারের (Feeler) প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব প্রথমে দিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত [এল কে ঝা] এবং তাতে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেটকে নির্দেশ দিয়েছিল একটি বার্তা পৌঁছে দিতে। এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন বৈঠক পরিচালনার জন্য আমাকে বাছাই করা হয়েছিল। পররাষ্ট্র দপ্তরের যুক্তি ছিল, যদি এ আলোচনায় কনসাল জেনারেল সংশ্লিষ্ট হন, তাহলে সেটা খুব বেশি সরকারি মর্যাদা পেয়ে যাবে। কিন্তু এ কারণে আমাকে ভীষণ বিপাকে পড়তে হয়েছিল। ভারতীয় পুলিশ আমাদের ওপর কড়া নজরদারি আরোপ করেছিল। তাদের হয়তো নয়াদিল্লি থেকে ভালোভাবে অবহিত করা হয়নি। সে কারণে তারা আমার প্রত্যেকটি মুহূর্ত নজরে রাখছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাদের নজর এড়িয়ে আমি বাথরুমে পর্যন্ত যেতে পারতাম না। সেটা আমাকে খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল। তবে আমি তাদের নজর এড়িয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশিদের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি উপায় বের করেছিলাম। সেটা তাদের

পছন্দ হয়নি। একই সময়ে ঊর্ধ্বতন ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতেরও আমি সুযোগ সৃষ্টি করেছিলাম। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডের সব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ থেকে পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক জেনারেল অরোরা, তাঁর উপ-অধিনায়ক লে. জেনারেল জ্যাক জেকব, পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী ও কলকাতা পুলিশের প্রধান রণজিৎ গুপ্ত—যাঁদের লোকেরা আমার পিছু লেগেছিল।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : নয়াদিল্লি থেকে কি কোনো সমস্যা ছিল?

গ্রিফিন : আমি এটা পুরোপুরি কখনো যাচাই করে দেখিনি। কিন্তু প্রবাসী পূর্ব পাকিস্তানিরা এটা নিয়ে ভেবেছে। ভারত সরকার চায়নি যে তাদের কাজে একজন আমেরিকান কূটনীতিক নাক গলাক। কারও সঙ্গে সমঝোতা করতে আমাকে অবশ্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমি একান্তভাবেই একজন বার্তাবাহক ছিলাম। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এবং তাদের কাছে বার্তা আদান-প্রদান করতাম। হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর *দ্য হোয়াইট হাউস ইয়ার্স*-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। বহু বছর পর তিনি তাঁর বইয়ের একটি কপি আমাকে উপহার দিয়ে বইয়ের মার্জিনে লিখেছিলেন : 'জর্জ, আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ'।

এদিকে যুদ্ধের দামামা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। ভারতীয়রা আমাদের সঙ্গে ইঁদুর-বিড়াল খেলছিলেন। তাঁরা আমাদের কাছ থেকে কিছু বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন, যা অন্যদের কাছ থেকে তাঁদের জানার আগ্রহ ছিল না। সুতরাং আমরাও খেলছিলাম এবং সেই সঙ্গে এটা খুঁজে দেখতে সচেষ্ট ছিলাম যে, আমরা কী মিস করছি। সাংবাদিকেরা সবাই আমাকে ঘিরে থাকতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, আমি এমন কিছু জানি যা তাঁদের জানা নেই। আমি তাঁদের উৎসাহ দিতাম। কারণ, তাঁরা এমন কিছু বিষয় জানতেন, যা আমার জানা দরকার। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতাকালে কিংবা তার পরে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ঢুকে পড়তে পারতেন এবং ফিরে এসে আমার কাছে বলতেন তাঁরা কী দেখে এসেছেন। আমি কতিপয় শীর্ষ ইঙ্গ-মার্কিন রিপোর্টারের সঙ্গে তথ্যের সুষ্ঠু আদান-প্রদান করতাম, যা তাঁরা জেনেছেন কিংবা শুনেছেন। তখন আমার অফিসে সাংবাদিকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। তাঁদের বসতে দেওয়ারও জায়গা ছিল না। তাই আমি তাঁদের ছোট দলে ভাগ করে সাক্ষাৎ দিতাম।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : আপনি যেমনটা বলছেন, আপনি ওই সময় একজন রিপোর্টার এবং বার্তাবাহক হিসেবে ভূমিকা রাখছিলেন। আপনি কি এটা

অনুভব করতে পেরেছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তর কী করছিল? প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের চোখে আপত্তিকর হিসেবেই গণ্য হওয়ার কথা।

গ্রিফিন: বিষয়টিকে একাধিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা চলে। আমরা একটি সম্পূর্ণ শেকলের শেষ ধাপে ছিলাম। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি যে, আমাদের অবস্থান কী হবে সেটা নির্ধারণ করা নিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তর, নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাস, ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস বিতণ্ডায় (Squabbling) লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে, ইসলামাবাদে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ও নয়াদিল্লিতে সাবেক সিনেটর কেনেথ কিটিং পরস্পর ক্রুদ্ধ গর্জন করছিলেন বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। আমরা সব সময় আমাদের রিপোর্টগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট থেকেছি। ওই সব রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমাদের সবারই সহযোগিতা করা উচিত। ধরে নিতে হবে, আমরা সবাই একই টিমের সদস্য। তবে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই এই দুটো দূতাবাসের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাত একটি সমস্যা হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। নয়াদিল্লির দূতাবাস চূড়ান্তভাবে একটি বৈঠকের আয়োজন করেছিল এবং তাতে ইসলামাবাদে তার পলিটিক্যাল কাউন্সিলরকে উপস্থিত হতে আহ্বান করেছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। তাঁর ডেপুটি বিল সিমন্স (Bill Simmons) অংশ নিয়েছিলেন। আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সুতরাং আমি দিল্লিতে যাই এবং ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলোতে অংশ নিই। এসব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন দিল্লির মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলর লি স্টাল (Lee Stull)। ওই সময় রাষ্ট্রদূতের স্টাফ-এইড ছিলেন ডিক ভিটস (Dick Viets) ও ডেপুটি চিফ অব মিশন ছিলেন গ্যালেন স্টোন[২] (Galen Ston)। তাঁরা এবং আরও অনেকে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে সিআইএর স্টেশন চিফও জড়িত হয়েছিলেন। বিল সিমন্স বলেছিলেন, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড হতাশ হয়ে পড়েছেন। কারণ, আমরা আন্দাজ করতে পারিনি যে পূর্ব পাকিস্তানের সংকট ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তিনি

---

২. গ্যালেন স্টোন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং ও রাষ্ট্রদূত দানিয়েল প্যাট্রিক মইনিহানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন দিল্লির মার্কিন দূতাবাসে। ১৯৮৮ সালে স্টুয়ার্ট কেনেডিকে স্টোন বলেন, ষাটের দশকে ভারতে থাকার পর দ্বিতীয় দফায় তিনি ভারতে প্রায় চার বছর ছিলেন। কিটিংয়ের প্রস্থান ও প্যাট্রিক মইনিহানের আগমনের মধ্যবর্তী ছয় মাস তিনি ভারতের মার্কিন দূতাবাসে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ছিলেন।

এমনকি সুপারিশ করেছিলেন যে, আমাদের তৎপরতা বন্ধ করা উচিত এবং ভারত কী করছে সে বিষয়ে আমাদের খোঁজখবর নিতে মনোযোগী হওয়া দরকার। কারণ, ভারত আমাদের সেন্টো মিত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। আমরা বলেছিলাম, 'একটু অপেক্ষা করুন'। আমি আজও বিলের বন্ধু হয়ে আছি।

হতাশাগ্রস্ত হয়ে আমি কলকাতায় ফিরেছিলাম। আমি আমার কাজে মনোযোগ দিয়েছিলাম। এক সন্ধ্যায় আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে এক নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানো হলো। সেই নিমন্ত্রণ এসেছিল পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের উপ-অধিনায়ক মেজর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকবের কাছ থেকে। একজন আকর্ষণীয় ভদ্রলোক। যুদ্ধের পর তিনি পদোন্নতি পেয়েছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম ইহুদি, যিনি উচ্চতম পদে আসীন হয়েছিলেন। এটা এমন একটা বিষয়, যার জন্য তিনি গর্ব করতে পারেন। আমরা সেই সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক আলোচনার পর মূল আলোচনায় আসি। তিনি আমাকে তাঁর পুরস্কার হিসেবে পাওয়া কতিপয় চৈনিক হাতিয়ার দেখালেন এবং আমরা শিল্পকলা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করি। চূড়ান্ত পর্যায়ে জেনারেল জ্যাকব বললেন, 'আপনার বাথরুমে যাওয়ার দরকার পড়বে কি? তাহলে এই বেডরুম দিয়ে যাবেন।' সেটা বুঝতে আমার কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল। কিন্তু আমি তাঁর শয়নকক্ষে গেলাম এবং তাঁর দেয়ালে একটি বড় মানচিত্র দেখি।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : আপনি একটা বিশাল মানচিত্র দেখেছেন মনে হয়।

গ্রিফিন : সেই মানচিত্রে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সর্বশেষ অবস্থানসমূহ সতর্কতার সঙ্গে চিহ্নিত করা ছিল। আমার হাতে ক্যামেরা ছিল না। কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি ভালোই ছিল। আমি যতক্ষণ সম্ভব দাঁড়িয়ে থেকে সেই অবস্থানগুলো মুখস্থ করি এবং কনস্যুলেটে দ্রুত ফিরে আসি। এবং পররাষ্ট্র দপ্তরে রিপোর্ট পাঠাই। এমন সব জায়গায় ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থান দেখা গিয়েছিল আমরা যা জানতামই না। এমনকি, যা আমরা ভাবতাম, তার চেয়েও বেশি কিছু আমি জেনে গিয়েছিলাম। জ্যাকব ছিলেন কিংবদন্তির জার্মান জেনারেল হেঞ্চ গোডেরিয়ানের (heinz guderian) শিষ্য। তিনি [হেঞ্চ] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ট্যাংক-যুদ্ধের কৌশলে বিপ্লব এনেছিলেন এবং ভারতীয়রা যেটা করেছিল সেটাও অবিস্মরণীয়। তারা বন্দুকের প্রায় একটিও গুলি না ছুড়ে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিয়েছিল। তারা ব্রহ্মপুত্র নদী পার করে পুরো একটি ট্যাংক ডিভিশন নিয়ে এসেছিল। এই ট্যাংকগুলো পানিতে ভেসে থাকতে

পারে। সোভিয়েত ট্যাংক। এটা তারা গোপনে করেছিল। কেউ বুঝতে পারেনি। আমার ধারণা, ওই সময়ে আমাদের পক্ষে ভূ-উপগ্রহের সাহায্যে ইমেজ নেওয়া সম্ভব ছিল না। জ্যাকবের শয়নকক্ষে মানচিত্র না দেখা পর্যন্ত আমি তো এটা কল্পনাও করতে পারি না। ওই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বে পুরো একটি ট্যাংক ডিভিশন মোতায়েন রয়েছে, যার সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম না। ঢাকায় তারা এক দিনের মধ্যে ওই ট্যাংক নিয়ে পৌঁছে যায়। পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করে এবং বিভিন্ন পথে পালিয়ে যায়। ভারতীয়রা তাদের অনেককেই নাগালের মধ্যে পেয়েও গুলি চালায়নি।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা যে নিষ্ঠুরতা চালিয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের দিক থেকে কি উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল?

গ্রিফিন : অল্প কিছুটা। ইসলামাবাদ দূতাবাস থেকে সব সময় বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমাদের একটি প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলাম ওই সব 'অভ্যন্তরীণ' সমস্যাসমূহ কীভাবে ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সব জনপদ থেকে সব উপায়ে মানুষ কলকাতায় এসে ঠাঁই নিয়েছে। তাদের গণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যখনই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে গিয়েছি, চারদিকে যত দূর চোখ যায়, দেখেছি শুধু মানুষ আর মানুষ। বহু মার্কিন ও অন্য বিদেশিরা দেখতে এসেছেন, তাঁরা কলকাতায় আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বহু আলোকচিত্র ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতার প্রামাণ্য দলিলপত্রের কোনো অভাব ছিল না। এরপর আমাকে যখন ইসলামবাদে বদলি করা হয়, তখন সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় বাঙালির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান সরকারে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধকালে তাঁদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদেরও বলার মতো রোমহর্ষক গল্প ছিল।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : আপনার কি মনে হয়, ভারত পুরো বিষয়টাই গিলে খেতে চেয়েছিল।

গ্রিফিন : হ্যাঁ, কিছু লোক আশা করেছিল তেমন কিছু ঘটবে। কিন্তু আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছিল যে ভারতীয় সামরিক বাহিনী সেটা চায়নি। তারা বরং তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়েছিল যে এটা কাজ করবে না। পূর্ব বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশি কঠিন হবে। একজন ভারতীয় জেনারেল সম্ভবত পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরা, যিনি একজন শিখ ছিলেন, আমাকে বলেছিলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানিরা যারা ছিল মুসলমান, তারা যদি বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, আমরা অবশ্যই তা

পারব না এবং আমাদের সে চেষ্টা করাও উচিত হবে না। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পদে কোনো বাঙালি নেই। জেনারেলরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা কতকটা আক্ষেপ করে বলতেন, 'মনে রাখবেন আমাদের মতো বাঙালিরা এখানে বসবাস করে। সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।'

স্টুয়ার্ট কেনেডি : তাহলে ভারতের মধ্যে বাঙালিদের হজম করা কষ্টসাধ্য?

গ্রিফিন : তারা সে জন্য গর্বিত। ১৯১১ সালের আগ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। কতিপয় বাঙালির চেতনায় আজও তা টিকে আছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪৬ মিলিয়ন। এখন সেটা ৯০ মিলিয়নের কাছাকাছি। আর পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা তখনই ছিল ৮০ মিলিয়নের কাছাকাছি। তাই মুসলমানরা সংখ্যায় হিন্দুদের পিছিয়ে দিত। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই তারা সেটা চায়নি।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : এটা কখন শুরু হলো? ভারতীয়রা কি এই মনোভাব প্রকাশ করেছিল যে, তারা একটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সহায়তা দিতে যাচ্ছে? কিংবা এ রকম কথা বাতাসে ভাসছিল?

গ্রিফিন : এটা অবশ্যই আমার কাছে প্রথমে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু ওয়াশিংটনে অনেকেই এটা ভেবেছিলেন যে, ভারতের হাতে এই কার্ড রয়েছে। যুদ্ধের মাঝামাঝি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের একজন জেনারেলের কাছ থেকে আমি একটি ফোন পেয়েছিলাম। প্রশ্ন ছিল, কেন আমরা বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠাতে যাচ্ছি? আমি নয়াদিল্লির দূতাবাসে জানতে চাইলাম, কী ঘটতে যাচ্ছে? রাষ্ট্রদূত কিটিং যোগাযোগ করলেন ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে। জানতে চাইলেন, এ খবর সত্য কি না। রাষ্ট্রদূতকে না জানিয়ে সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে। কিটিং ছিলেন 'ভয়ংকর ক্রুদ্ধ'।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : অবশ্যই কিসিঞ্জার একটি সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে সেটা ছিল এমন একটা নির্বোধ কূটনৈতিক উদ্যোগ, যা কোনো ফল বয়ে আনেনি। অথচ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, ওই উদ্যোগ দিয়ে ফন্দিফিকির করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

গ্রিফিন : সেটা একটা শক্তি প্রদর্শনের মহড়া ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ভারতীয়দের সতর্ক করে দিতে, যাতে তারা মনে করে, আমরা কিছু একটা করব। যাহোক, আমরা কিছুই করিনি। সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। এটুকুই মাত্র। আমি যত দূর জানি,

একটি প্লেনও ওড়েনি। কিন্তু সপ্তম নৌবহর নিয়ে আগেভাগে আমাদের কিছুই জানানো হয়নি।

স্টুয়ার্ট কেনেডি: আপনার কি মনে হয় দিল্লিতে আমাদের পলিটিক্যাল অফিসারের চেয়ে কলকাতায় আপনি একটু ভিন্ন ধরনের কিছু একটা হয়ে উঠেছিলেন?

গ্রিফিন: আমার ধারণা, আমার সহকর্মীদের চেয়ে সব সময়ই আমার আচরণটা ভিন্ন ছিল। হতে পারে, সেটাই আমার জন্য ঝামেলার কারণ হয়েছিল এবং সেভাবেই আমার গায়ে সিআইএর লেবেলটা লেগেছে।

স্টুয়ার্ট কেনেডি: ইসলামাবাদে আপনার কী কাজ ছিল?

গ্রিফিন: ১৯৭২ সালে আমি কলকাতা ছাড়ি। ৭৩-এ ইসলামাবাদে যাই। এক বছর থাকি। আমি ছিলাম পলিটিক্যাল অফিসার। দিল্লিতে রাষ্ট্রদূত কিটিং অবশ্য আমাকে চেয়েছিলেন। তাঁর সহকারী ছিলেন ডিক ভেটস। তাঁর পরিবর্তে তিনি আমাকে চান। আমি পাকিস্তানকে বেছে নিই। কারণ, আমি দক্ষিণ এশিয়ার সংঘাতের উভয় দিকটা দেখতে চেয়েছিলাম। একজন পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে নিশ্চিতভাবেই আমার দেখার দায়িত্ব ছিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। তবে শিগগিরই আমি ডিন হাওয়েলের কাছ থেকে ফোন পাই। তিনি তখন ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চের (আইএনআর) দক্ষিণ এশীয় বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৭৫ সালে লাহোরে থেকে যেতে আমি রাজি হলাম।

উল্লেখ্য, ১৯৬২-৬৫ সালে গ্রিফিন কলম্বোতে ছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে কেজিবির এক এজেন্টের পরিচয় ঘটে। গ্রিফিনের কথায়:

> তারা আমাকে এ মর্মে মুগ্ধ করতে চেয়েছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি কত মহৎ। এবং এর একজন সদস্যও কতটা উন্নত জীবন যাপন করতে পারে। তারা আমাকে বলে যে একজন বিদেশিও কেজিবির সদস্য হতে পারেন। তাহলে তিনি বিশেষ সুবিধাভোগী হবেন। আমি অবশ্য সে বিষয়ে দূতাবাসে গিয়ে রিপোর্ট করেছিলাম। আমাদের স্টেশন চিফ খুবই উত্তেজিত ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওই তরুণ কর্মকর্তা নিজেই সম্পর্ক ত্যাগ করতে চান। শুধু কভার দেওয়ার জন্য আমাকে বলা হচ্ছে। তিনি আমাকে তাঁর পেছনে লেগে থাকতে বললেন। আমি তাঁকে তাঁর স্ত্রী-পুত্রসহ আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালাম। আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি উত্তেজিত। এ জন্য তিনি তাঁর বসের অনুমতি চাইলেন। পরদিন তিনি ফোন করে বললেন, তিনি আমার আমন্ত্রণ এখন রক্ষা করতে পারছেন না। হয়তো কিছুদিন পর পারলেও পারতে পারেন। তাঁকে বললাম, এটা তাঁর ওপর নির্ভর করে।

এর পরদিন ওই কেজিবি এজেন্ট সুইমিং পুলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বস কেজিবিপ্রধান। প্রথমে দেখি, ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী-সন্তানসহ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমাদের দেখেও দেখছেন না। আমার স্ত্রী তাঁর কাছে গেলেন। তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রী আকস্মিক বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁকে বিষণ্ন মনে হলো। এক সপ্তাহ পর তিনিও অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে আর দেখিনি।

এ ঘটনার কদিন পরই বোম্বে থেকে প্রকাশিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র *ব্লিৎজ*-এ আমার নিন্দা করা হলো। বলা হলো, আমি সিআইএর গুপ্তচর। এরপর সাময়িকীতে আমার নামে আরেকটি নিবন্ধ ছাপা হলো। উভয় ক্ষেত্রে যে সূত্রের বরাত দেওয়া হয়েছে, সেটি হলো শ্রীলঙ্কার সংসদে কমিউনিস্ট পার্টির এক সদস্যের দেওয়া বক্তৃতা। তিনি তাঁর ভাষণে অভিযোগ করেছিলেন যে, ইউসিসের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার শ্রীলঙ্কার এসএলএফপি সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। এই ঘটনার পর ১৯৬৪ সালে পূর্ব জার্মান থেকে একটি বই বেরোল। *হুজ হু ইন দ্য সিআইএ*। নিশ্চিতভাবেই সেখানে আমার নাম মুদ্রিত হয়।

স্টুয়ার্ট কেনেডি: আপনার কি মনে হয় যে, ক্ষমতার রাজনীতি এবং যেহেতু কিসিঞ্জার সর্বেসর্বা ছিলেন, সে কারণে ভারতের চেয়ে আমরা পাকিস্তানকে বেশি সমর্থন দিয়েছিলাম?

গ্রিফিন: ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের ইতিহাস আমি কিছুটা জানতাম। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করিনি। ভারতীয়রা আশা করেছিল, ৭১-এও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সে কারণেই তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি করল। চীনারা হুমকি-ধমকি দিচ্ছিল যে, নয়াদিল্লিতে তারা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করবে। হিমালয় পেরিয়ে তাদের সৈন্যরা ভারতে ঢুকবে। সুতরাং ভারতীয়রা এক শক্তিশালী মিত্রের সন্ধান করল। কিন্তু ১৯৭১ সালে তারা সম্ভবত ধরে নিয়েছিল তাদের সাহায্য দরকার। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র এখানে ঢুকতে পারে। এমনকি পাকিস্তানের পক্ষে চীনও দাঁড়াতে পারে। সত্যি বলতে কি, উভয় ক্ষেত্রে ঘেউ ঘেউ শব্দটা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু কামড়টা ছিল কম। হ্যাঁ, আমরা ভারতকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার মতো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমরা বঙ্গোপসাগরে নৌবহর পাঠানো ছাড়া কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিইনি। সপ্তম নৌবহর একটি গুলিও ছোড়েনি। ঘটনার সময় আমি ভারতে ছিলাম। ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসের মনোভঙ্গি কেমন ছিল সেটা বিল সিমন্স স্পষ্ট

করেছেন, পরে যাঁর সঙ্গে আমি কাজ করেছি। বিলের কথায়, 'আসলে পাকিস্তান যে আমাদের এক মিত্র, তা আমরা বুঝতে চাইনি। তারা আমাদের সিয়েটো-সেন্টোর মিত্র ছিল। এই দুটো সংগঠনের সে সময় তেমন কোনো প্রভাব ছিল না। কিন্তু দূতাবাস চাপ দিচ্ছিল যে, আমাদের ঐতিহাসিক এই চুক্তির বন্ধন এখনো বৈধ এবং যদি আমরা বুঝতে না চাই, তাহলে তার "শেপআপ" দরকার। জেরুজালেম ও তেল আবিবের মার্কিন দূতাবাসের মধ্যে যেমন, তেমনি নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসের মধ্যেও টানাপোড়েন চলতে থাকে। এটা এমন একটা সমস্যা, যা কার্যত প্রত্যেক রাষ্ট্রদূতই উতরাতে চেষ্টা করেছেন। অনেকেই বই লিখেছেন যে, ভারতের ভাঙন আসন্ন। এত বৈচিত্র্য নিয়ে ভারত তার বর্তমান কাঠামো নিয়ে টিকতে পারবে না।'

উল্লেখিত বিমান-নাটক সম্পর্কে গ্রিফিন বলেন, 'মিসেস গান্ধী শেষ পর্যন্ত এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। তাঁর এই পদক্ষেপের নেপথ্যের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিলাম আমি। তিনি বিদেশে যাচ্ছিলেন। বিমানে উঠতে যাবেন, তখন মেকানিকেরা দেখতে পেলেন যে, তাঁকে বহনকারী বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। পরিদর্শকেরা দেখলেন, কিছু তার মাঝখান থেকে কাটা। কমিউনিস্টরা আমাকে আগে থেকেই "কিলার সিআইএ স্পাই" আখ্যা দিয়েছিল। অভিযোগ উঠল, আমি কোনোভাবে গভীর রাতে এই কাণ্ড করেছি। আসলে তাঁদের কাউকে দোষারোপ করা দরকার ছিল এবং সে জন্য আমাকেই বাছাই করা হলো। যদিও তখন আমি ভারতের ধারেকাছেও ছিলাম না। আমাকেই বলির পাঁঠা করা হলো। প্রমাণ করার চেষ্টা হলো, আমিই তাঁকে মারতে চেয়েছি।'

এখানে লক্ষণীয় যে, আমরা বহুকাল বুঝতে চেয়েছি, ব্যাংকক থেকে ফারুক-রশিদরা কী করে তাঁদের গন্তব্য লিবিয়া বাছাই করলেন? গাদ্দাফি কি ওই সময়ে উপমহাদেশ সম্পর্কে আদৌ মাথা ঘামাতেন? এর ওপরও একটু আলো ফেলেছেন গ্রিফিন।

স্টুয়ার্ট কেনেডি: আপনি যে সময়টায় দক্ষিণ এশিয়ায় ছিলেন, তখন সেখানে বেশ অস্থিরতা গিয়েছে। এর সঙ্গে গাদ্দাফির কি কোনো সম্পৃক্ততা ছিল?

গ্রিফিন: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নথিপত্রে আমি তো তা-ই দেখেছিলাম। তিনি লিবিয়ায় সব ধরনের বিপ্লবী ও সন্ত্রাসীদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে কোনো না কোনো ধরনের সোভিয়েত যোগসূত্র আছে বলে

প্রতীয়মান হয়েছিল। তবে এটা ঠিক যে, কতিপয় বিশ্লেষকের মতে, সে সময় একটা বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র চলছিল। সেটা খুব ভালোভাবে সংঘটিত না হলেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। গোপনীয় তথ্যের আদান-প্রদান চলছিল। বিশ্বব্যাপী কালোটাকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ চলাচল করত।

'মিসেস গান্ধী আমাকে ভারতের জন্য এক বড় শত্রু ভাবতেন। কিছুদিনের জন্য আমি প্রথম পৃষ্ঠার খবরে পরিণত হয়েছিলাম। এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেগকে বলতে হয়েছিল, গ্রিফিন সিআইএর গুপ্তচর নন। যদিও এ ধরনের খবর স্বীকার বা নাকচ করার রীতি নেই। আমাকে বলা হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটাই প্রথম যে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এমন বিবৃতি দিতে হয়েছিল। পরে হেগ নিজেই ভারতীয়দের আশ্বস্ত করতে উদ্যোগী হন। কোনো দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশনের মতো পদে আমাকে বদলি করতে চান। আমাকে আবার কলম্বো পাঠানোর কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ঘটেনি। আমি বেকার ঘুরলাম। ডেপুটি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতাম। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে চাকরি দিতে বলেছেন। সবাই আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন। সবাই আমার সম্পর্কে জানতেন এবং আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ব্যতিক্রম বাদে তাঁরা আমাকে অন্য কোথাও চাকরি খুঁজতে বলতেন। কিন্তু আমার কোথাও ঠাঁই হয়নি। তিন-চার মাস এভাবে কাটল। একদিন আমাকে একজন বললেন, টম পিকারিং নাইজেরিয়া যাচ্ছেন। তিনি একজন ভালো কমার্শিয়াল অফিসার খুঁজছেন। সুতরাং আমি সবকিছু তাঁকে খুলে বললাম। একজন পলিটিক্যাল অফিসার হওয়া সত্ত্বেও কমার্শিয়াল অফিসার হতে রাজি হলাম। তিনি তাঁর সঙ্গে আমাকে লাগোসে যেতে বললেন।

নাইজেরিয়াতেও অপবাদ আমাকে তাড়া করল। এর শুরু হয়েছিল সম্ভবত ১৯৬৩-৬৪ সালে একজন স্বপক্ষত্যাগী সোভিয়েতকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে গিয়ে। সেই থেকে সোভিয়েতরা আমার পিছু নিয়েছিল। তারা চেয়েছিল, আমিও যেন স্বপক্ষত্যাগী হই। কিন্তু আমি অবশ্যই তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। এবং দৃশ্যত সেটা তাদের ক্ষুব্ধ করেছিল। কয়েক দশক ধরে আমার পেছনে তারা লেগে থাকে। ব্যাপারটা আসলে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাকে তাড়া করে ফিরছিল। এবং কলকাতায় আমার চাকরির দিনগুলোতে তার আরও অবনতি ঘটেছিল। বলা চলে, নাটকীয়ভাবে উত্তপ্ত করা হয়েছিল, বিশেষ করে যখন আমি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের

সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। সেই উত্তেজনার তাপ আমি আরও বেশি অনুভব করি যখন আমি কলকাতা থেকে পাকিস্তানে যাই। এই দেশকে, ভারত কিংবা সোভিয়েত, কেউ বন্ধু ভাবে না। আমাকে ঘিরে সন্দেহ-উত্তেজনা টগবগিয়ে ফুটতে থাকে যখন আমি কাবুলে যাই। নাটকীয়তা চরমে উঠেছিল যখন ভারতীয়রা আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। ভারত স্পস্টতই সোভিয়েতের চাপে এটা করেছিল। যদিও মিসেস গান্ধীসহ সব পক্ষ থেকে সব সময় এটা অস্বীকার করা হয়েছে।

'ভারতীয় ও সোভিয়েতরা দ্রুতই জানতে পারে যে আমি লাগোস যাচ্ছি। গোপনীয়তা রক্ষার সব চেষ্টাই করা হয়েছিল কিন্তু তা ভেস্তে যায়। টম পিকারিং দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ওয়েজ ক্রিবেলকে একটি গোপনীয় তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন আমার পূর্ববৃত্তান্ত। আমি নীরবেই কাজ করছিলাম লাগোসে। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শিগগিরই এক বামপন্থী নাইজেরীয় সংবাদপত্রে আমাকে নিয়ে একটি বানোয়াট কাহিনি ছাপা হয়। তাতে দাবি করা হয়, আমি এমন একটি স্মারকপত্র তৈরি করেছি যা থেকে দেখা গেছে, নাইজেরিয়ার দুই শক্তিশালী গোত্রপ্রধানকে হত্যা করা প্রয়োজন বলে আমি উল্লেখ করেছি। 'শেহু শাগারি সরকারকে উৎখাত করতে হবে'। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে সেই খবর ছাপা হয়েছিল। শাগারি সরকার প্রায় উন্মাদ হয়ে তদন্ত করল। তাদের সংসদে ঝড় উঠল। কিন্তু তদন্ত শেষে সরকার দ্রুত ঘোষণা করল, অভিযোগটি ভিত্তিহীন। ওই চিঠির ইংরেজি এতটাই দুর্বোধ্য যে, কোনো মার্কিনের তা লেখার কথা নয়। আমরা এখানেও সোভিয়েতের হাত খুঁজে পেলাম, যারা আমার জীবন অতিষ্ঠ করতে চেয়েছিল। এর কিছুকাল পর ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলেন। আর তখন সোভিয়েতরা নতুন গল্প ফাঁদল। বলল, স্বাধীন খালিস্তান আন্দোলনের পেছনে আমিই উসকানি দিয়েছিলাম। *প্রাভদা* প্রথম সেই গল্প ছাপল। এরপর ভারতীয় সংবাদপত্র তা লুফে নিল এবং আমার ছবিসহ তা ছাপা হয়েছিল। সেই সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শুলজ। তিনি সোভিয়েত কাউন্সিল অব মিনিস্টার্সের চেয়ারম্যান তিকানভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি শুলজকে বললেন, *প্রাভদার* প্রতিবেদন সত্য নয় এবং সোভিয়েত সরকারের সবারই তা জানা ছিল।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : এটা এমনই একটা বিষয় যা আমি আগে কখনো শুনিনি যে, গোয়েন্দা সংস্থা এমন একজনের পিছু নিয়েছে, অথচ ঘটনার সঙ্গে যার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবে তারা কেন এটা শুরু করেছিল বলে আপনি মনে করেন?

গ্রিফিন : আমাদের কারও এটা জানা ছিল না। চূড়ান্তভাবে আমরা জানলাম, যখন পূর্ব জার্মান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের ফাইল আমাদের হস্তগত হলো। আমাদের ফাইলও তথ্য স্বাধীনতা আইনের আওতায় যখন প্রকাশ করার সুযোগ এল, তখন আমি নিজের দিকে নজর দিতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু বার্লিনের কর্মকর্তাটি, যাঁর আমাকে সাহায্য করার কথা ছিল, তিনি সেসব ফাইল খুঁজে পাননি। আমি অবশ্য মস্কোর কাছে অনুরোধ করিনি। কিন্তু আমি তা করতে পারি। যাঁরা সোভিয়েত ডিজইনফরমেশন অ্যাক্টিভিটিজ (এটি রুশ পরিভাষা) নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা আমাকে বলেছেন, 'আপনার বিষয়টা নজিরবিহীন'। তাঁরা এমনটা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই দেখেননি। আপনি যদি ইন্টারনেটে যান তাহলে আপনি প্রচুর বই পাবেন, যাতে লেখা আছে, আমি একজন কিলার সিআইএ স্পাই।

স্টুয়ার্ট কেনেডি : আমি সত্যি বিস্মিত। একই খেলা দুজনে খেলতে পারে। সিআইএ এবং কেজিবি পরস্পরকে হত্যা করে না। কারণ তারা বলে, 'তুমি যদি আমাদের লোক হত্যা করো তাহলে আমরা তোমাদের লোক হত্যা করব।' এটা কি সত্যি যে আপনি সিআইএর লোক ছিলেন না? ব্যাপারটি নিয়ে আপনি কেজিবির সঙ্গে কথা বলতে পারেন, এরকম একটি প্রস্তাব আমরা কি আমাদের সিআইএর লোকদের দেওয়ার কথা ভাবতে পারি? কারণ, তারাও তাদের বৈরী পক্ষের সঙ্গে কথা বলে থাকে। 'এবং তাদের বলুন, এই অশোভন বিষয় আপনারা পরিত্যাগ করুন, অন্যথায় আমরা আপনাদের কারও সঙ্গে এমন আচরণ করব।'

গ্রিফিন : আমি নিশ্চিত, তারা এটা করেছিল, যদিও তারা এটা করবে বলে আমাকে কখনো জানায়নি। সিআইএর অনেককেই আমি জানি। অনেকেই আমার বন্ধু আছেন। তাঁরা আমাকে দেখলে কৌতুক করতেন। বলতেন, 'এই যে আমাদের কোম্পানির খাস লোক এসে গেছেন।' তাঁরা ভাবতেন, এটা নিতান্ত কৌতুকের বিষয়। লাগোসে স্টেশন চিফ ছিলেন মিল্ট বার্ডন। আমাকে তিনি সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে আমি আমার ফাইল দেখিয়েছিলাম। তিনি বেশ অবাক হয়েছিলেন। সামাজিকভাবে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হতো। সুতরাং কেউ কেউ হয়তো ভেবে থাকবেন, আমরা একই সংস্থার লোক। এরপর তাঁর ডাক পড়ল পাকিস্তানে। সেখানে তিনি আফগানিস্তান নিয়ে খেলতে যাবেন, আর আমার অভিজ্ঞতা তার জন্য খুবই মহার্ঘ হলো। সুতরাং এ নিয়ে আমরা প্রচুর কথাবার্তা বলেছি। তিনি আসলে আমাকে বলেননি যে, তিনি পাকিস্তান যাচ্ছেন। আমি পরে শুনেছিলাম। তিনি হঠাৎ

পাকিস্তানে বদলি হয়ে গেলেন। টিভি টক শোতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে এখন তিনি প্রায় আসেন।

কলকাতায় আমার জীবন দুর্বিষহ করার ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা ছিল, তাঁদের অন্যতম কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ছিলেন। মিসেস গান্ধীর ঘনিষ্ঠ। আমি যখন পররাষ্ট্র দপ্তরে ভারত বিষয়ে কান্ট্রি ডিরেক্টর, তখন ভারত সরকার ওয়াশিংটনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন নতুন রাষ্ট্রদূত পাঠালেন। জানলাম তিনি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। আমাদের যখন দেখা হলো, তখন তিনি রীতিমতো ভড়কে গেলেন। কিন্তু শিগগিরই আমরা তা কাটিয়ে উঠলাম। অস্বস্তি মুছে গিয়ে সেখানে ভর করল বন্ধুত্ব। এমনকি উভয়ের সহধর্মিণীরাও কাছাকাছি এলেন।

কাইউম-গ্রিফিন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলকাতায় মার্কিন মিশনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের অন্যতম মুখ্য চরিত্র ছিলেন কাজী জহিরুল কাইউম। খন্দকার মোশতাক (এন.ই১৩৮-কুমিল্লা-৮) ও কাজী জহিরুল কাইউম (এন.ই১৩৬-কুমিল্লা-৬) সত্তরের গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর আহমদ আলী (পি.ই২৪৫-কুমিল্লা-৫)। তাঁরা তিনজনেই বাহাত্তরের মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। ৮২ বছর বয়স্ক অ্যাডভোকেট আহমদ আলী ১৪ অক্টোবর ২০১০ এক সাক্ষাৎকারে লেখককে বলেন, 'আমি আজ একটি তথ্য প্রকাশ করতে চাই যে, খন্দকার মোশতাক নন, কলকাতার মার্কিন মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনকারী ছিলেন কাজী জহিরুল কাইউম। কর্নেল ওসমানীকে মেজর জেনারেল পদমর্যাদায় উন্নীত করার বিষয়ে কথা বলতে আমি একাত্তরের আগস্টে কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে জহিরুল কাইউমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে।'

কুমিল্লা আওয়ামী লীগের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ('৬২-৭২) ছিলেন অ্যাডভোকেট আহমদ আলী। লেখকের সঙ্গে আলোচনায় তিনি স্মরণ করেন যে, জনাব কাইউম শেখ মুজিবের চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মুজিব তাঁকে 'কাইউম ভাই' সম্বোধন করতেন। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি শিল্পপতি হিসেবে এ কে খানের পর কাজী জহিরুল কাইউমের পরিচিতি ছিল। জহিরুল আগাগোড়া শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখেন।

ড. আকবর আলি খান মুজিবনগর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন। তিনি ১৬ অক্টোবর ২০১০ লেখককে বলেন, ওই সময়ে তিনি শুধু মোশতাকের সঙ্গে মার্কিন মিশনের গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। নিউ ইয়র্ক যেতে মোশতাক কাপড়চোপড়ও কিনেছিলেন। শেষ মুহূর্তে তাঁর যাত্রা বাতিল হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি আগরতলা থেকে মুজিবনগরে যাই জুলাইয়ের পর। ওই সময় কাজী জহিরুল ও মোশতাকের মধ্যে আলাপ-অলোচনার কথা স্মরণ করতে পারি। তখন আমরা ভাবতাম, এটা স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা একই এলাকার (কুমিল্লা) লোক ছিলেন।' ড. কামাল হোসেনও লেখককে নিশ্চিত করেন যে, কাজী জহিরুল কাইউম আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তহবিলের অন্যতম অর্থ জোগানদাতা ছিলেন।

আহমদ আলী ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন। মোশতাক-জহিরুল সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ষাটের দশকের কুমিল্লার রাজনীতিতে উপদলীয় কোন্দল ছিল। জহিরুল ও মোশতাক দুই উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল। সুতরাং জহিরুল মোশতাকের বিশ্বস্ত ছিলেন এ কথা আমার পক্ষে মানা কঠিন। এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।' আহমদ আলী বরং স্মৃতিচারণা করেন যে, 'কুমিল্লার স্থানীয় রাজনীতিতে আমি যদিও মোশতাকের দলে ছিলাম, কিন্তু কাজী জহিরুলের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। জহিরুল অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী (১৯২৭) নবাব মোশাররফ হোসেনের (কাজী জাফর আহমদের চাচাতো পিতামহ) ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। সেই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে যেমন তেমনি কলকাতার বিশিষ্টজনদের সঙ্গেও জহিরুলের যোগসূত্র ছিল। জহিরুল পড়াশোনা করেছেন কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনে ডিগ্রি নেন। যদিও তিনি আইন পেশায় আসেননি। আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আসাদুজ্জামান খান (জিয়ার আমলে সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ও ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদেও প্রথমে স্বতন্ত্র ও পরে বিরোধী দলের নেতা) ছিলেন জহিরুলের খালাতো ভাই।

আহমদ আলী বলেন, 'একাত্তরের আগস্টে আমি মোশতাকের বাসায় চার-পাঁচ দিন ছিলাম। থিয়েটার রোডে আশু বাবুর বিল্ডিংয়ে মোশতাক থাকতেন। একদিন আমাকে জহিরুল মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে

আপসরফার বিষয়টি অবহিত করেন। আমাকে তিনি সামান্যই বলেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যেন এ ব্যাপারে খন্দকার মোশতাককে রাজি করাই। আমার কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যে, জহিরুলের উদ্যোগের প্রতি মোশতাকের সায় ছিল না। আমি গিয়ে মোশতাককে কথাটা বললাম। তিনি শুনে মুচকি হাসলেন। শুধু বললেন, 'এসব তুই বুঝবি না।' ব্যস এটুকুই। এ নিয়ে পরে আমি আর কারও সঙ্গে আলোচনা করিনি। এরপর আওয়ামী লীগ যখন মোশতাককে দায়ী করে তখন আমি অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু এ কথা আমি কখনো প্রকাশ করিনি।'

কাজী জহিরুল কাইউম সাংবাদিক শামসুল হুদা চৌধুরীকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। তিনি ছিলেন মুজিবনগরে অবস্থিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান অনুষ্ঠান সংগঠক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মস্কো সফরে (১-৬ মার্চ ১৯৭২) তিনি তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। জহিরুল কাইউমের সাক্ষাৎকার তাঁর *একাত্তরের বিজয়* বইয়ে ছাপা হয়েছে। ৩০ জুন ১৯৮৫ বইটি বিজয় প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। কাজী জহিরুল কাইউমের ছেলে কাজী রফিকুল কাইউম লেখককে বলেন যে, এই বই প্রকাশের সঙ্গে তাঁর বাবা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং এতে প্রকাশিত বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য, একাত্তরে কলকাতার মার্কিন মিশনের সঙ্গে কাজী জহিরুল কাইউমের যোগাযোগ সম্পর্কে হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *হোয়াইট হাউস ইয়ার্স*-এ তথ্য প্রকাশ করেন। কিসিঞ্জার লিখেছেন, '৩০ জুলাই ১৯৭১ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য কাইউম কলকাতায় আমাদের কনস্যুলেটে এসে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে।' কিসিঞ্জারের বর্ণিত বিবরণকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে দাবি করেছেন কাজী জহিরুল কাইউম। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব জে এন দীক্ষিত লিখেছেন, 'কাইউম জর্জ গ্রিফেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।'[৩]

একাত্তরের বিজয় বইয়ে এই ঘটনার বিবরণ এসেছে এভাবে :

> কাজী জহিরুল কাইউম : এমনি পরিস্থিতিতে একদিন খন্দকার মোশতাকের কাছে জানতে চাইলাম, শেখ মুজিব কোথায় আছেন এ সম্পর্কে তাঁর কোনো

---

৩. *লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড*, ইউপিএল, ১৯৯৯ পৃ. ৬৮-৭০।

ধারণা ছিল কি না? তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। তাজউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি জানেন কি না?

বললাম, 'আপনারা যদি না জানেন, তবে এখানে কেন মন্ত্রিত্ব করছেন?'

এরপর তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, 'আমাকে দুহাজার টাকা দিতে পারেন?'

তাজউদ্দীনের প্রশ্ন : কেন?

'আমার কাপড়চোপড় নেই। এক সেট পোশাক তৈরি করব। আমেরিকার কনসাল জেনারেলের কাছে গেলে খবর ঠিকই পাব।' তাজউদ্দীন বলেন, 'পোশাক তৈরি করুন। কিন্তু আমরা আমেরিকার কনসাল জেনারেলের অফিসে যেতে পারি না।'

শামসুল হুদা চৌধুরী : তখন আপনি তাজউদ্দীন সাহেবকে কী বললেন?

কাজী জহিরুল কাইউম : বললাম, 'আপনাদের যেতে পারা এক কথা, আর আমার চেষ্টা করা আরেক কথা। বিভিন্ন মহলে আমার যে পরিচিতি আছে আমি সেই পরিচিতিতে আমেরিকার কনসাল জেনারেলের অফিসে ঠিকই যেতে পারব।'

আরেক দিনের কথা। শেখ সাহেব প্রসঙ্গে আলাপ হচ্ছিল খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে। তিনি আমাকে বললেন, 'কাকে ধরলে কাজ হবে, এই তথ্য বের করতে পারেন কি?' তারপর বললেন,

'কাইউম ভাই, আপনাকে পছন্দ করি না ঠিকই। কিন্তু খোদাভক্তি, বন্ধুবাৎসল্য, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এমনি সব গুণই আপনার আছে, শুধু একটা দোষ আছে।'

বললাম, 'দোষটা কী?'

তখন তিনি বললেন : 'আপনি একজন অশিক্ষিত লোককে সমর্থন করেন।'

'আমি অশিক্ষিত লোককে সমর্থন করি। কিন্তু আমাকে আওয়ামী লীগে এনেছেন তো আপনি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে আপনিই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কি না? এরপর আপনি আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিলেন কেন? আপনি কি সামান্য হুইপ হওয়ার জন্যই চলে যাননি?

'সোহরাওয়ার্দী সাহেব তো আমাকে মন্ত্রিত্ব সেধেছিলেন। এতদসত্ত্বেও আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিনি। আর আপনি হুইপ হওয়ার জন্য চলে গেলেন। কাজেই অশিক্ষিত লোক বলে আপনি কাকে কটাক্ষ করছেন? পার্টির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তখন তো অন্য কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। তাহলে এবার বলুন, দোষটা কি আমার, না আপনার?'

'মোশতাক সাহেবের তখন উত্তর দেওয়ার মতো আর কিছুই ছিল না।'

বললেন : 'দুঃখিত। কাইউম ভাই, দোষ আমার।'

'কাজেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের কোনো প্রশ্ন নেই। আজ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধকে একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে। শেখ সাহেব জীবিত আছেন না তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে, এ কথা জানতে হবে।'

কলকাতার আমেরিকান কনস্যুলেট জেনারেলের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করলাম। দেখলাম যে তাঁরা আমাকে চেনেন। এমনকি আমার বায়োডাটাও তাঁদের কাছে রয়েছে। তাঁরা তাঁদের ফাইলপত্রে রক্ষিত আমার বায়োডাটার সঙ্গে আর একবার আমার মৌখিক বিবরণী মিলিয়ে নিয়ে ওই দিন আমাকে বিদায় দিয়ে বললেন, 'পরের শনিবারে আবার আসুন।' কথানুযায়ী পরের শনিবার আমি আবার গেলাম এবং সরাসরি জানতে চাইলাম শেখ সাহেবের কোনো খবর আছে কি না। বললেন, 'হ্যাঁ, শেখ মুজিবের বিচার হচ্ছে। তিনি পাকিস্তানে আছেন।'

তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে শেখ সাহেব জীবিত আছেন। এটা জুন '৭১-এর ঘটনা। আমরা বাগডোরা সম্মেলন করে আসার পর মার্কিন কনসাল জেনারেলকে বললাম, 'শেখ মুজিবকে আপনারাই তো নিয়ে গিয়েছেন। তিনি তো আমাদের সঙ্গেই আসতেন। পাকিস্তানে নিযুক্ত আপনাদের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডকে নিয়ে তো আপনারা এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। শেখ সাহেব স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে পাকিস্তানের কারাগারে আত্মসমর্পণ করার লোক নন। তাঁর দীর্ঘ চব্বিশ-পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক জীবন থেকে অন্তত এ-জাতীয় দুর্বলতা ধারণা করা যায় না। আজ পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে হত্যা করার হীন প্রয়াস চলছে কেন? শেখ মুজিবুর রহমানকে ধরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যেমন আপনাদের, তেমনি ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আপনাদের। তাঁর বিচার হচ্ছে, এই কথা আজই মাত্র শুনলাম।'

আমি আমেরিকান কনসাল জেনারেলের দপ্তর থেকে সরাসরি চলে গেলাম তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে। সেখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাকসহ অনেকে এলেন। তাঁদের এই চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী খবরটি দিলাম। বললাম, এই অবস্থা হয়েছে। শেখ সাহেব এখনো পাকিস্তানের কারাগারে জীবিত আছেন। তবে তাঁর বিচার হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। বিচার শেষেই ইয়াহিয়া সরকার তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

পরবর্তীকালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন বৈদেশিক সচিব হেনরি কিসিঞ্জার এ সম্পর্কে যে বইটি লিখেছেন ওই বইতেও এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বইয়ে সব কথাই সঠিকভাবে বিধৃত হয়েছে। তিনি কোনো কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে লেখেননি। আমি কনসাল জেনারেলের দপ্তর থেকে যা যা জেনে এসেছিলাম, একই ধরনের তথ্য ওই বইয়েও আছে।

আপনি বোধ হয় জানেন যে ইতিপূর্বে কমরেড মণি সিং এবং অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদকে মস্কোতে পাঠানোর প্রস্তাবও আমিই দিয়েছিলাম। আমার লক্ষ্য ছিল একটি, শেখ মুজিব জীবিত ছিলেন কি না এবং জীবিত থাকলে তাঁকে উদ্ধারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

পরবর্তীকালে এটা আরও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে যারা ভুট্টোর মতো লোককে ফাঁসি দিতে পেরেছে, তারা শেখ মুজিবকেও ফাঁসি দিতে পারত। ভুট্টোর ফাঁসিও আমেরিকার ইঙ্গিতেই হয়েছে। কাজেই তারা যে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দিতে পারত না, এটা ছিল অবিশ্বাস্য।

এ বিশ্বাস আমার সব সময়ই ছিল। আমি শেখ সাহেবকে ২৫ মার্চ '৭১ সন্ধ্যার সময়ও বলেছিলাম, 'শেখ সাহেব, আপনি সরে পড়ুন।'

তারপর বেঁচে আসার পরও তাঁকে একইভাবে প্রশ্ন করেছিলাম, 'শেখ সাহেব, আপনি কেন ওই বাড়িতে থাকলেন?'

যাহোক, কলকাতায় আমেরিকান কনসাল জেনারেলের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। একপর্যায়ে আমি বলেছিলাম, 'শেখ মুজিবকে ফাঁসি দিলে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট ব্লকে চলে যাবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আপনারা আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। মূলত আমি একজন শিল্পপতি হলেও আমি একজন রাজনীতিকও বটে। কাজেই আমার কথাগুলো আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন।' আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরও বললাম, 'শেখ মুজিব যদি জীবিত থাকেন, তবে বাংলাদেশের ভূমিকা থাকবে নিরপেক্ষ। তিনি সব সময় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এসেছেন, এবং গণতন্ত্রই তাঁর শক্তি। কাজেই আপনারা যদি গণতন্ত্র চান, তবে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং ফিরিয়ে দিতে হবে। আপনারা বললেই তিনি থাকবেন এবং ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হবে। আর এটাও সত্য যে আপনাদের সমর্থন এবং সম্মতি ছাড়া শেখকে ইয়াহিয়া সরকার ফাঁসি দিতে পারবে না।'

'What? Bangladesh will be red? কী বললেন? বাংলাদেশ কমিউনিস্ট ব্লকে চলে যাবে।' আমেরিকান কনসাল জেনারেল একরকম চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ, শেখ মুজিবকে ফিরিয়ে না দিলে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট ব্লকে চলে যাবে।'

'আপনি পরের দিন আসুন, মি. কাইউম, আপনাকে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি যে শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়া হবে না।'

আমেরিকান কনসাল জেনারেলের ওই আশ্বাসবাণী নিয়ে আমি সরাসরি ছুটে গেলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ খন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন

মনসুর আলী এবং কামারুজ্জামান সাহেব ছুটে এলেন শেখ সাহেব প্রসঙ্গে ওই চাঞ্চল্যকর খবরটি শোনার জন্য।

আমেরিকান কনসাল জেনারেলের সঙ্গে আমার কথাবার্তার পূর্ণ বিবরণী নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার পর বললাম, 'আমরা এখন নিশ্চিত যে শেখ সাহেব জীবিত আছেন। পাকিস্তানের কারাগারে তাঁর বিচার হচ্ছে। আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে শেখ সাহেবকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হবে। কাজেই শুধু বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার চেষ্টা করলেই হবে না, শেখ মুজিবকে উদ্ধার করে আনার প্রয়াসও চালিয়ে যেতে হবে একই সঙ্গে।'

একাত্তরের আগস্টে কলকাতায় মার্কিন মিশনের সঙ্গে কাজী জহিরুল কাইউমের প্রথম যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টি অবমুক্ত করা মার্কিন দলিল থেকেও দেখা যাচ্ছে। কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল হার্ব গর্ডন ৭ আগস্ট ১৯৭১ স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত তাঁর তারবার্তার সারসংক্ষেপে উল্লেখ করেন, 'আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য নেই। তাঁরা সর্বসম্মতভাবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে একটা আপসমূলক নিষ্পত্তি চায়। কাইউম বলেন, বাংলাদেশ্রের মন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। মন্ত্রী আশা করেন, বর্তমানে যে অচলাবস্থা বিরাজমান তা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নিষ্পত্তি সম্ভব। তবে তাঁর পূর্বশর্ত হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে। কাইউম বলেছেন, 'বাংলাদেশে সামরিক শক্তি বর্তমানে দুটি "কনভেনশনাল" ডিভিশন গঠনের চেষ্টা করছে। এ ছাড়া গেরিলারা তো রয়েছেই। ওই ডিভিশন যখন গঠন করা সম্ভব হবে, তখনই পূর্ব বাংলার ভূখণ্ড দখল করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে।' এই তারবার্তার ফুটনোটে লেখা হয়েছে, ১ জুলাই কনসাল জেনারেলের অফিসের একজন রাজনৈতিক কর্মকর্তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি কাজী জহিরুল কাইউমের বৈঠক হয়। কাইউম কর্মকর্তাকে বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে উদ্ভূত সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, পূর্ব পাকিস্তানের গেরিলাযুদ্ধ যদি প্রলম্বিত হয়, তাহলে বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব চরমপন্থীরা কবজা করতে পারে। আর সেই ভীতি থেকেই আওয়ামী লীগ এখনই একটি রাজনৈতিক আপস চাইছে। এ জন্য তারা পূর্ণ স্বাধীনতা থেকেও পিছিয়ে আসতে প্রস্তুত রয়েছে। কাইউম এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে একটা সমঝোতায় আসতে চান। কিন্তু কাইউম স্পষ্ট করেন যে, আলোচনার প্রক্রিয়া যা-ই হোক না কেন, তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

গর্ডন ওই তারবার্তায় উল্লেখ করেন :

১. পলিটিক্যাল অফিসার ৭ আগস্ট আবার কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এমএনএ কাজী জহিরুল কাইউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি নিশ্চিত করেন, বাংলাদেশের 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী' খন্দকার মোশতাক আহমদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশে তিনি কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কাইউম দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যে সাফল্যের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই শেখ মুজিবুর রহমানকে রাখতে হবে। কাইউম বলেন, যদি মুজিবের বিচার করা হয়, ফাঁসি কার্যকর করা হয়, তাহলে আপসের সম্ভাবনা নেমে যাবে শূন্যের কোটায়। বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় অন্য যেসব আওয়ামী লীগের নেতা রয়েছেন, তাঁদের কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই বাংলাদেশের জনগণের ওপর। আর সে কারণে কোনো আপসরফায় পৌঁছাতে তাঁরা অপারগ। অন্য দিকে মুজিবকে নিয়ে যদি কোনো আপসরফা করা সম্ভব হয়, তাহলে তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এমনকি একটা স্থিতাবস্থার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হতে পারে। কাইউম বলেন, শেখ মুজিবের অনুমোদিত সমঝোতার আওতায় উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যাবে। কাইউম মনে করেন, পাকিস্তানকে সীমিত অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সঠিক নীতি অনুসরণ করেছে। সে কারণেই রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সরকারকে সহজেই রাজি করাতে পারবে।

২. কাইউমের মতে, আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন, ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার এক বিরাট আশঙ্কা রয়েছে। হয়তো আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যেও এটা ঘটতে পারে। আর তা নিশ্চিতভাবেই উপমহাদেশের প্রত্যেকের জন্য বড় বিপজ্জনক। কাইউম বলেন, 'গুজব রয়েছে, ভারত শিগগিরই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারে। আর এটা বাস্তবে রূপ পেলে পাকিস্তান-ভারতের সংঘাত তীব্রতর হবে, রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। যুদ্ধের আশঙ্কাও অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। যদি যুদ্ধ আসে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেই শান্তিপূর্ণ আপসরফার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর সে ধরনের পরিস্থিতি হবে আওয়ামী লীগের জন্য প্রতিকূল।'

৩. কাইউম বলেন, হাতে সময় অল্পই আছে। তাই তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তৎপর হতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রই ভালো জানে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কী করে সমঝোতা শুরু করতে হয়। তিনি সুপারিশ রাখেন, এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে

পাকিস্তান সরকারকে এটা জানানো যে, আওয়ামী লীগ সমঝোতার জন্য প্রস্তুত। এটা ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত অথবা ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে পাকিস্তানকে জানানো যেতে পারে। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন, 'আমার সঙ্গে আপনার যেসব কথাবার্তা হলো প্রয়োজনে তার খুঁটিনাটি পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রকাশ করতে পারেন।' কাইউম বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে আগ্রহী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহমদও এই সফরে সঙ্গী হবেন। কিন্তু কথা হলো, এ জন্য সর্বাগ্রে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। নিশ্চয়তা পেতে হবে যে তাঁদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা হবে। মোশতাক আহমদ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চান। কিন্তু তিনি এটা জানেন না যে, কীভাবে অগ্রসর হলে ভালো হয়।

৪. কাইউম বলেন, মুক্তিবাহিনী ক্রমেই শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। তারা ইতিমধ্যেই দুই ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। তারা মুক্তিবাহিনীকে দিয়ে ডিভিশন করবে—তাদের বর্তমান এক ডিভিশনে ১০ ব্যাটালিয়ন সৈন্য রয়েছে। প্রতিটি ব্যাটালিয়ন ১২০০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। তাদের দ্বিতীয় ডিভিশন যখন প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত হবে তখন তারা পূর্ব বাংলার অংশবিশেষ দখল করে নিতে উদ্যোগী হবে। অবশ্য মুক্তিবাহিনীর গেরিলাযোদ্ধারা প্রদেশজুড়ে গেরিলাযুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। কাইউম বলেন, ভারত সরকারের হাতে দেরাদুন ও রাজস্থানে ৫০০ পূর্ব পাকিস্তানি অফিসার স্কুল রয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বে দেওয়া হবে। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই কনভেনশনাল ডিভিশনকে বিমানবিধ্বংসী কামানসহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করছে। গেরিলাযোদ্ধাদের সীমান্ত সন্নিহিত শিবিরে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

৫. দীর্ঘ মেয়াদে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, সামরিক বিজয় তারা অর্জন করতে পারে। কিন্তু তত দিনে পূর্ব বাংলা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। আর যদি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হয় তাহলে পরিস্থিতি হবে আরও নিকৃষ্টতর। আর এসব কারণেই রাজনৈতিক আপসরফায় পৌঁছানোকে আওয়ামী লীগ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে যা-ই ঘটুক না কেন, পূর্ব বাংলায় এক ব্যাপকভিত্তিক পুনর্গঠনের কাজ কিন্তু প্রয়োজন হবে। কাইউম মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ, যে কিনা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে সক্ষম।

গর্ডন এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন, 'কাইউমের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। কাইউমের জানামতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে

আওয়ামী লীগের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম তিনিই। সামরিক দিক থেকে তাঁকে এ ব্যাপারে খুবই আস্থাবান মনে হয়েছে যে, মুক্তিবাহিনীর বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একইভাবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে।' এই তারবার্তার ফুটনোটে লেখা হয়েছে, ঢাকার কনস্যুলেট জেনারেল আওয়ামী লীগে কাইউমের ভূমিকা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁদের মূল্যায়ন হচ্ছে, তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য কেউ নন। কিন্তু সম্ভবত তিনি খন্দকার মোশতাক আহমদের বিশ্বস্ত এবং একজন সাচ্চা প্রতিনিধি। মোশতাক বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী'।[৪]

৯ আগস্ট পাকিস্তানের মার্কিন দূতাবাস কাইউমের প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন দেয়। এতে তারা বলেছে, যদি ধরে নেওয়া হয় তার উদ্যোগ বৈধ এবং এতে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খানের সরকারের কাছে এটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে মনে হয় না। দূতাবাস মনে করে, এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় জড়িয়ে পড়লে হিতে বিপরীত হতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি ভবিষ্যতে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বিবেচনায় রাখে, তাহলে ঝুঁকি নেওয়াটার একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে।

মোশতাকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান

১৩ আগস্ট, ১৯৭১ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টাফ হ্যারল্ড স্যান্ডার্স কিসিঞ্জারকে দেওয়া এক স্মারকে বলেন, 'আপনি জানেন যে, ভারতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে নয়াদিল্লি ও কলকাতায় মধ্যম পর্যায়ের মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট নয়, তারা সত্যিই কি মাছ শিকার করতে চাইছে। কলকাতায় বাংলাদেশ 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী'র তরফে কথিত আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কিছু কম পেয়ে সমঝোতা চান। অন্য দিকে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের 'পররাষ্ট্রসচিব' পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ঠিক বিপরীত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রশ্নে আগামীকাল কলকাতায় আরেক দফা আলোচনার দিনক্ষণ স্থির হয়েছে।

---

৪. ঢাকা থেকে পাঠানো তারবার্তা ৩০৫৭, ৮ আগস্ট, আরজি ৫৯, সেন্ট্রাল ফাইলস ১৯৭০-৭৩, পল ২৩-৯ পাক।

[এই নথির ফুটনোটে লেখা হয়েছে, ৮ আগস্ট নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলর বাংলাদেশ আন্দোলনের 'পররাষ্ট্রসচিব' এম আলমের [মাহবুব আলম চাষী] সঙ্গে বৈঠক করেন। আলম রাষ্ট্রদূত কিটিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁকে জানানো হয় যে, কিটিংয়ের পদমর্যাদার কারণে তাঁর পক্ষে কোনো বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করা সম্ভব নয়। পরে তিনি পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে রাজি হন। আলম যা বলেছেন তার সারকথা হচ্ছে—বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন কামনা করেন।[৫]

কিসিঞ্জারের কাছে প্রদত্ত স্মারকে স্যান্ডার্স একটি তারবার্তার খসড়া উপস্থাপন করেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সমঝোতা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি ও কলকাতার মার্কিন মিশনের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে এতে কিসিঞ্জারের অনুমোদন প্রার্থনা করা হয়। এই কেব্‌লটি ১৪ আগস্ট স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠানো হয়। যেসব সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে কিসিঞ্জারের অনুমোদন চাওয়া হয় তা ছিল নিম্নরূপ :

'স্টেট ডিপার্টমেন্টকে না জানিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভবিষ্যতের কোনো বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রশ্নে কোনোভাবেই কথা দেওয়া যাবে না।

'ইতিমধ্যেই আগামীকাল যে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে আমাদের তরফ থেকে কোনো উৎসাহ দেখানো যাবে না। শুধু শুনে যেতে হবে। স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছুতে আওয়ামী লীগ সমঝোতায় আসতে ইচ্ছুক কি না তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। এটা অবশ্য অনুমোদিত।

কলকাতায় কনস্যুলেট জেনারেলের একজন কর্মকর্তা ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি কাইউমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কাইউম পুনরায় নিশ্চিত করেন যে, তিনি যা কিছুই বলছেন তা তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশক্রমেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু পেলেও সমঝোতার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। কাইউম গুরুত্ব আরোপ করেন যে, তিনি যা কিছুই বলছেন তা তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশক্রমেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু পেলেও সমঝোতার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। কাইউম গুরুত্ব আরোপ করেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের পক্ষে শুধু মুজিবুর রহমানই সমঝোতায় পৌঁছাতে

---

৫. তারবার্তা নং ১২৬৯৮, নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট, ন্যাশনাল আর্কাইভস, আর জি ৫৯, সেন্ট্রাল ফাইলস, ১৯৭০-৭৩, পল ২৩-৯ পাক।

পারেন এবং তিনিই শুধু জনসাধারণকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম।[৬]

'আমরা অবশ্যই এমন কোনো অবস্থান নেব না, যেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নিয়ে ইসলামাবাদ বা তাদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।[৭]

'সমস্যার প্রতি আমাদের করণীয় সম্পর্কে এ পর্যন্ত এরকমের একটা অবস্থান নেওয়াই উত্তম। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা আনুষ্ঠানিক যোগসূত্র বজায় রাখা আমাদের স্বার্থের অনুকূল। তবে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে হলে একই সঙ্গে আমরা অবশ্যই ইয়াহিয়ার সঙ্গেও আলোচনা অব্যাহত রাখব।'

কেব্‌লের বক্তব্য হচ্ছে, পররাষ্ট্র দপ্তরের উচিত হবে এসব ঘটনা সম্পর্কে ইয়াহিয়াকে অবহিত করা। কিছু জানামাত্রই কালবিলম্ব না করে তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে। এই স্মারকে এ পর্যায়ে সুপারিশ করা হয় যে, 'যাতে কোনো ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট কেব্‌ল আপনি অনুমোদন করতে পারেন। আপনি চাইলে সিসকোকে (সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) মৌখিকভাবে বলতে পারেন। এ ব্যাপারে পরে কোনো বার্তা প্রেরণ করতে হলে তা যেন আপনাকে দেখিয়ে নেওয়া হয়।'

১৪ আগস্ট নিক্সন ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'আপনি ২৮ জুন যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় রিকনসিউলিশনের যে উদ্যোগ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তা সংকট নিরসনে সহায়ক হবে।' এরপর ১৯ আগস্ট ৭১ পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন। ২০ আগস্ট প্রেরিত এক তারবার্তায় তিনি এ বিবরণ জানিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করে বলেছেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনে বাঙালিদের সম্পৃক্ত করতে চান। এ জন্য ৮৮ জন সাবেক এমএনএকে তিনি দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন। প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া এ কথাও বলেন, অবশিষ্ট নির্বাচিত এমএনএদের বিরুদ্ধে অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য তাঁরা চাইলে নিজেদের মুক্ত করে নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁরা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে যোগদানের সুযোগ পাবেন। ইয়াহিয়া

---

৬. তারবার্তা নং ২৩২১, কলকাতা থেকে ১৪ আগস্ট।

৭. ইসলামাবাদের দূতাবাস ১২ আগস্ট সতর্ক করে দিয়েছে, পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সম্পর্কে খুবই সংবেদনশীল। দূতাবাস পরামর্শ দিয়েছে যে, এ ধরনের যোগাযোগকে যতটা সম্ভব লো-প্রোফাইল এবং বেসরকারি চরিত্র দিতে হবে।

তথ্য দেন যে, এই ৮৮ এমএনএর মধ্যে বর্তমানে ঢাকায় ১৫ বা ১৬ জন উপস্থিত রয়েছেন। তাঁদের জীবনের নিরাপত্তায় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। অবশিষ্ট ৭২ জন এমএনএ হয় গ্রামাঞ্চলে অথবা ভারতে অবস্থান করছেন। ইয়াহিয়া অবশ্য জানেন না, এঁদের মধ্যে কতজন অ্যাসেম্বলিতে যোগদানে এগিয়ে আসবেন। তিনি অবশ্য বলেছেন, 'অ্যাসেম্বলিতে যোগদানের ক্ষেত্রে আমি একটা সময়সীমা বেঁধে দেব।'

ইয়াহিয়ার সঙ্গে ফারল্যান্ডের এই বৈঠককালে মরিস উইলিয়ামস উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৭-২৩ আগস্ট পাকিস্তান সফর করেন। মরিস আলোচনার এ পর্যায়ে মত প্রকাশ করেন, আওয়ামী লীগকে তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ৮৮ জন ছাড়া অন্যদের যদি ক্লিন করা হয়, তাহলে তিনি দলটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন এবং পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের ৮৮ সদস্যের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে পারেন। ফারল্যান্ড লিখেছেন, এ প্রসঙ্গটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। এতে ইয়াহিয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয় যে, শুদ্ধিকরণ যেমনই হোক না কেন, তিনি আওয়ামী লীগের নাম শুনতেও রাজি নন।[৮]

ইয়াহিয়া মনে করেন, ৮৮ ব্যক্তি 'আওয়ামী লীগার' হিসেবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা তাঁর সঙ্গে সমঝোতা করবেন। এই ৮৮ জনকে অ্যাসেম্বলিতে বসতে দিতে রাজি হওয়ার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

২৪ আগস্ট ১৯৭১। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে ইয়াহিয়ার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ফারল্যান্ড তারবার্তা পাঠান জোসেফ সিসকোর কাছে। ২২ আগস্ট ইসলামাবাদে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত ১৫৪০৭৮ নম্বর তারবার্তায় এই ইস্যুতে ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসকে পাকিস্তানি পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানের সঙ্গে আলোচনার অনুমতি দেওয়া হয়। এতে সম্মতি দেন সিসকো, আরউইন ও কিসিঞ্জার। এতে উল্লেখ করা হয়, 'কাইউমের প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।'

---

৮. ইসলামাবাদ থেকে ২০ আগস্ট এক তারবার্তায় ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারকে জানান, উইলিয়ামস নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগকে পুনরায় বৈধতাদানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবতা এমনই যে, ইয়াহিয়া এমন কথা কানে তুলতেও রাজি নন। তাঁর এই সংবেদনশীলতা সম্পর্কে কিসিঞ্জার ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলেন।

দূতাবাসকে এই মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, মার্কিন কর্মকর্তারা নিজেরা যেন জড়িয়ে না পড়েন। কাইউমের কথা তাঁরা শুনবেন, কিন্তু সে ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকবেন। মনে রাখতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতাকালীন ভূমিকা পালন করতে চায় না। শুধু বন্ধু হিসেবে সাহায্য করতে আগ্রহী।

এতে লেখা হয়েছে, 'কলকাতায় মার্কিন কনসালের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকের, বিশেষ করে কাজী জহিরুল কাইউমের (কলকাতার কনসাল জেনারেল স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রেরিত বার্তায় প্রথমে ভুলক্রমে তাঁকে 'কুমিল্লার সাবেক আইনজীবী খান আবদুল কাইউম খান' বলে উল্লেখ করেছিলেন।) কাছ থেকে সংকেত পাওয়া গেছে। এই সংকেত থেকে দৃশ্যত ইঙ্গিত মিলছে যে, কলকাতায় এবং অন্যত্র অবস্থানরত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এমসিএ এবং এমপিএ পাকিস্তানের সঙ্গে আপস চাইছে। তারা এমন এক সমঝোতা চায়, যাতে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ঐক্য বজায় থাকে। তবে তা তথাকথিত ৬ দফার সাধারণ মতবাদের আলোকে এবং মুজিব বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও সমঝোতা হতে হবে মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যেই। আমি ইয়াহিয়াকে বললাম, 'আমরা এ কথা উল্লেখ করছি বটে। তবে আপনাকে স্পষ্ট বুঝতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র এই ইস্যুতে উদ্যোগ নিতে উৎসাহী নয়। পাকিস্তান সরকার কিংবা বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনোভাবেই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় যেতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র সরকার অব্যাহতভাবে এই কূটনৈতিক অবস্থান রক্ষা করে চলেছে যে, আমরা এ ব্যাপারে জড়িত নই। "বাংলাদেশ সরকারের" প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগে যেতে রাজি নই। আমি অবশ্য ইয়াহিয়ার সঙ্গে এ-সংক্রান্ত নানা আলোচনার ফাঁকে বলেছি, এ ধরনের একটা সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হলে তিনি জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ-সংক্রান্ত তথ্য আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়াটা কর্তব্য মনে করেছে শুধুই শান্তি স্থাপনের আশায়।'

ইয়াহিয়া-মোশতাক দ্বিধাদ্বন্দ্ব

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড লিখেছেন, কলকাতায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করায় 'ইয়াহিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল অনুকূল ও ইতিবাচক'। ২৪ আগস্ট '৭১ স্টেট ডিপার্টমেন্টে

প্রেরিত তারবার্তায় ফারল্যান্ড আরও উল্লেখ করেন, 'আমি যে তাঁকে এই ধরনের গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছি ইয়াহিয়া তাতে খুবই খুশি হয়েছেন। তিনি অনুভব করছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থাই অনুসরণ করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মার্কিন কর্মকর্তারা তাঁদের প্রথাগত সাবধানতা ও ডিসক্রিশন বলে উপযুক্ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। ইয়াহিয়া উল্লেখ করেন, তাঁর আশা যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে তিনি সক্ষম হবেন। এর মধ্যে পূর্বাংশে ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমন্বয় ঘটাতে তিনি উদ্‌গ্রীব। এ লক্ষ্যে তিনি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছেন। ইয়াহিয়া অভিমত দেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, যেসব এমপিএ এবং এমএনএর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা কেন এগিয়ে আসছেন না।' তাঁরা এগিয়ে এলেই তো তিনি অতি দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন। এসব বিষয়ে সাধারণ আলোচনার পর আমি ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বলুন তো, আপনি কি মনে করেন, আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তৃতীয় কোনো দেশে সংলাপ অনুষ্ঠানে বড় কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে?'

ইয়াহিয়া বলেন, 'কাইউম যাঁদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি এ ধরনের সংলাপে যোগ দিতে পারেন। তবে এটা করতে হবে গোপনে। নিশ্চিত করতে হবে যাতে বিষয়টি কোনোভাবেই প্রচার না পায়।' আমি বললাম, 'এ ধরনের হাইপোথিটিক্যাল বৈঠকের মাধ্যমে যৌথভাবে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমঝোতার নানা দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ ধরনের আলোচনার ফলে উদ্বাস্তু, খাদ্য বণ্টন ও পুনর্বাসনের মতো সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে অর্থবহ উপায়ও বেরিয়ে আসতে পারে।' জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, তিনি এ ধরনের একটি অগ্রগতি সর্বান্তকরণে রূপ দিতে আগ্রহী। সুতরাং এ ব্যাপারে যখনই কোনো নতুন অগ্রগতি ঘটবে, তখনই তিনি এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করতে অনুরোধ জানান। ফারল্যান্ড এ পর্যায়ে মন্তব্য করেন, প্রতীয়মান হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে বহুমুখী শক্তি নানা খেলা খেলছে। প্রথমত, অন্তত কিছু বাংলাদেশি এমনটা উপলব্ধি করছেন, তাদের অর্জিত স্বাধীনতা ভারতের স্বার্থ দ্বারা বেদনাদায়কভাবে সীমিত থাকবে। আর সে কারণেই স্বাধীনতা হতে পারে তাদের কাছে এক অলীক কল্পনা। দ্বিতীয়ত, ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন, আক্রমণের যে কৌশল তিনি অবলম্বন করছেন তাতে তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি

ঘটছে না। আর সে কারণেই যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তা হয়তো নিকষ অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর স্ফুরণ।'

৩১ আগস্ট ১৯৭১

এই তারবার্তার খসড়া তৈরি হয় ২৫ আগস্ট। হোয়াইট হাউসে এটি পরিমার্জিত হয় ৩০ আগস্ট এবং অনুমোদনের পর তা ইসলামাবাদ, কলকাতা, নয়াদিল্লি, লন্ডন ও ঢাকার মার্কিন মিশনে প্রেরণ করা হয়। এতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স উল্লেখ করেন :

১. আমরা একমত, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাতে আশার "ক্ষীণ" আলো হয়তো রয়েছে। কিন্তু আমরা তাই বলে বিশ্বাস করি না যে এই ইস্যুতে মধ্যস্থতাকরীর ভূমিকা পালনের সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রের সামনে এসেছে। অন্য দিকে আমরা অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে সততার সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের পথে আরেকটি ধাপ এগিয়ে যাওয়ার যুক্তি খুঁজে পেতে পারি। তা হলো কোনো একটা নিরপেক্ষ ভূখণ্ডে উভয় পক্ষকে আলোচনায় বসতে সহায়তা করতে পারা। যাতে তারা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে।

২. প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকেই; অবশ্য তিনি যদি বড় কোনো সমস্যার মুখে না পড়েন। আমাদের ধারণাগুলো আমরা ইয়াহিয়াকে অবহিত করতে পারি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে বিপদের দিনে বন্ধু যেভাবে বন্ধুর পাশে দাঁড়ায় সে রকম। এটা মনে রাখতে হবে, ইয়াহিয়া না চাইলে আমরা কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আর কোনো আলোচনায় জড়াব না।

৩. আমাদের মনে হচ্ছে, কাইউম যে প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছেন, তা সত্যি কতটা যথার্থ তা আরেকবার যাচাই করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমাদের বিবেচনায় এটা করতে হলে কলকাতায় বাংলাদেশ 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী' মোশতাক আহমদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করাই উচিত হবে। দ্রুততম সময়ে এর চেয়ে অধিকতর ভালো ফল লাভের আর কোনো উপায় নেই। তাঁর সঙ্গে কথা বলে যদি মনে হয়, কাইউম যা বলেছেন তা ঠিক, তাহলে মোশতাককে আমরা জানিয়ে দিতে পারি আপনারা যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তার সারকথা আমরা ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবহিত করেছি।

৪. আমরা মোশতাক আহমদকে আরও জানিয়ে দেব, বাংলাদেশের

প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠানে ইয়াহিয়া আগ্রহ দেখিয়েছেন। এটা শুনে মোশতাক যদি নতুন করে কোনো তথ্য দেন, তাহলে আমরা ইয়াহিয়াকে পুনরায় তা জানিয়ে দিতে পারি। আমরা যদি লক্ষ করি, উভয় পক্ষ আলোচনায় বসতে আন্তরিক, তাহলে আমরা সে ক্ষেত্রে কত দূর কী ভূমিকা পালন করব অথবা করব না, তা নির্ধারণ করব।

৫. সতর্কতা—আমরা বিশ্বাস করি যে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পাকিস্তান সরকার এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের খবর ফাঁস হয়ে পড়লে বিপদ আছে। আমাদের ভূমিকা চিহ্নিত হবে অথবা মোশতাক আহমদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কথা জানাজানি হলে তা এই প্রক্রিয়ার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি পা ফেলতে গিয়ে সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, শেষ পর্যন্ত এসব সমঝোতার প্রভাব মার্কিন নীতির ওপর কত বড় প্রভাব ফেলবে। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, কারা এই সমঝোতার প্রক্রিয়া বানচাল করতে আগ্রহী? আমরা ধরে নিতে পারি, এ ধরনের লোক পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ আন্দোলনের মধ্যেই রয়েছে।

৬. কলকাতার জন্য : রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড যদি ইয়াহিয়ার অনুমোদন পান, তাহলে আপনি (কলকাতার কনসাল জেনারেল) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু তাঁকে এ কথা জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা শুধু এ-সংক্রান্ত বার্তাই পৌঁছে দেব; মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হব না। মোশতাক আহমদকে ভিসা প্রদানের প্রশ্ন যদি আসে তাহলে আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের ১৫৪০৭৮ নম্বরে প্রেরিত বার্তায় উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ আপনি বলবেন 'ভিসা চেয়ে আপনি যে অনুরোধ করেছেন, তা আমরা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিয়েছি।' সাবধান। আপনি কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ জোগাবেন না। আপনি তাঁকে এ কথাও বলতে পারেন 'মোশতাক সাহেব, এখন যেহেতু পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে, তখন আপনার যুক্তরাষ্ট্র সফর একটু বিলম্বিত করলে ভালো হয় নাকি?' মোশতাক আহমদকে যদি কলকাতায় না পাওয়া যায়, তবে তাঁর গন্তব্য সম্পর্কে দ্রুততম সময়ে অবহিত করতে হবে।'

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স এ পর্যায়ে সব মিশনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ দিকনির্দেশনা দেন ৭. আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে অব্যাহতভাবে বিশ্লেষণ ও মন্তব্য আশা করি। ক. পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে

সম্ভাব্য সমঝোতা। খ. মুক্তিবাহিনীসহ বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের 'স্বাধীনতা বনাম সমঝোতা' প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন ও বিভক্তি। গ. ইয়াহিয়া ঠিক কী ধরনের আপসমূলক ফর্মুলা পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও রাজনীতিকদের গেলাতে পারবেন? ঘ. যেকোনো সমঝোতার জন্য মুজিবের মুখ্য ভূমিকা দাবি করছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা, অন্য দিকে দৃশ্যত ইয়াহিয়ার দরকার 'বিচ্ছিন্নতাবাদী বলির পাঁঠা'—এ দুয়ের মধ্যে কী করে সমন্বয় আনা যায়? এ ছাড়া এ-সংক্রান্ত অন্য যেকোনো পরামর্শ ও সুপারিশকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্বাগত জানাবে। বার্তাটি এখানেই শেষ। তবে ফুটনোটে লেখা আছে, 'রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রেরিত বার্তার সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ৪ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়ার সঙ্গে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে তিনি এই ইস্যুতে কথা বলবেন। তিনি মন্তব্য করেন, এই সমঝোতার প্রক্রিয়ায় ইয়াহিয়া যেমনটি চাইবেন, ঠিক তেমন পন্থাই তাঁরা অনুসরণ করবেন।' এর পরের বার্তায় উল্লেখ করা হয়, ইয়াহিয়া ৪ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের অনুমোদন দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার কনসাল জেনারেলকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন এ ব্যাপারে অগ্রসর হন।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের হেরাল্ড স্যান্ডার্স ও স্যামুয়েল হসকিনসন কিসিঞ্জারের কাছে এক সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন এভাবে: 'বাংলাদেশ-পশ্চিম পাকিস্তানি আলোচনা: ৪ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড যদি ইয়াহিয়ার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পান এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা একমত হন, তাহলে আমরা শিগগিরই তাঁদের মধ্যকার গোপন আলোচনার ঘনিষ্ঠ পক্ষ হতে পারি। তখন প্রধান ইস্যু হবে, অবশ্য যদি তেমন মুহূর্ত আদৌ আসে, আমরা একটি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব খাটাতে পারি। সিসকো (সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কিন্তু মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যের মতোই মধ্যস্থতা করার সুযোগ যদি এসেই যায় তাহলে আমাদের কালবিলম্ব করা উচিত হবে না। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

এই ইস্যুটি ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে আলোচিত হয় এভাবে:

> কিসিঞ্জার: আমরা কি এখন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করতে পারি?
>
> সিসকো: আমরা এখন অখণ্ড পাকিস্তানের মধ্যে কী করে একটা রাজনৈতিক আপসরফা করা যায়, তা নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের

চিন্তাভাবনা জানার চেষ্টা করছি। আমরা মনে করি, ছয় দফা এখন স্টেডিয়ামের মধ্যে। আমরা ইয়াহিয়ার অনুরোধে বাংলাদেশ-বিষয়ক বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি। ইয়াহিয়া আমাদের তৎপরতার প্রশংসা করেছেন এবং আমরা তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়েছি, আমরা কোনো উল্লেখযোগ্য অবস্থান গ্রহণ করিনি।

কিসিঞ্জার : এটা খুবই সহায়ক হতে পারে।

আরউইন : তবে অনেকটাই নির্ভর করছে মুজিবের প্রতি ট্রিটমেন্টের ওপর।

ভারতের সম্মতিতে সংলাপ

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ কলকাতায় কনসাল জেনারেলের কাছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের আরউইন-প্রেরিত তারবার্তায় বলা হয় :

কলকাতা যেভাবে উল্লেখ করেছে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহমদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠানে কাইউমের অপারগতা কিংবা শীতল মনোভাব কিন্তু ভালো ঠেকছে না। মনে হচ্ছে, মোশতাকের উদ্যোগে তেমন সাড়া মেলেনি। এর অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্য যা বিবেচ্য তা হলো :

১. অনিচ্ছুক বাংলাদেশি প্রতিনিধিদের সমঝোতায় আনার জন্য আমাদের কোনো তৎপরতা চালানো ঠিক হবে না।

২. এ সময় আমরা কাইউমের আরেকটি প্রস্তাবের কোনো মেরিট দেখছি না। তাঁর বিকল্প প্রস্তাবটি হচ্ছে, 'প্রধানমন্ত্রী' তাজউদ্দীন আহমদ অথবা 'ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট' নজরুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠকে বসার। কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি, এই দুজনের কেউই মোশতাকের উদ্যোগ উসকে দেননি। সুতরাং আপনার উচিত হবে কাইউমকে কোনোভাবেই উৎসাহ না দেওয়া। কাইউমকে কোনোভাবেই আপনি বলতে যাবেন না যেন আপনি এই বাংলাদেশি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী। আর যদি একান্তই দেখেন যে কাইউম নিজেই এই দুজনের যে কারও সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করে দিচ্ছে, তাহলে সে পথ খোলা রাখুন এবং এ ব্যাপারে কিছু জানামাত্র দ্রুততম সময়ে আমাদের অবহিত করবেন। ডিপার্টমেন্ট তখন ভাববে কী করা যায়।

৩. আমরা অবশ্য মোশতাকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ অব্যাহত রাখতে চাই। এর অন্য কোনো কারণ না থাকলেও এটা যাচাই করে দেখা দরকার যে, কাইউমের রিপোর্টিং মোশতাকের পূর্ববর্তী কি না কিংবা বর্তমান অবস্থা কতটা যথার্থ। ডিপার্টমেন্টের সুপারিশ হচ্ছে, আপনি অব্যাহতভাবে

মোশতাকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এটা করতে গিয়ে যে চ্যানেলকে উপযুক্ত ভাববেন সেটাই বেছে নেবেন। কাইউমকে এড়ানোর চেষ্টা করাই ভালো। কারণ, তার সাম্প্রতিক মতিগতি ভালো ঠেকছে না। ক্রমেই তিনি যেন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ছেন এবং অস্থিরতায় ভুগছেন। তবে মনে রাখবেন, আপনাকে কিন্তু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে চলতেই হবে। আমরা মোশতাকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে 'গুরুত্বপূর্ণ' বার্তা পেয়েছি তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া স্মরণে রাখতে হবে। কারণ, সেখানে বা অন্যত্র উচ্চপর্যায়ে বৈঠকের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এটা হতে পারে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বৈঠকের অংশ। মোশতাকের সঙ্গে যদি বৈঠক হয় তাহলে এটা কিন্তু জানাতে ভুলবেন না যে, সমঝোতার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগ্রহ রয়েছে।'[৯]

স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে কলকাতার কনসাল জেনারেলের কাছে পাঠানো তারবার্তায় (ভ্যান হোলেন, সিসকো ও আরউইন অনুমোদিত) বলা হয়, বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদস্যের সঙ্গে এ পর্যন্ত কোনো মার্কিন কর্মকর্তার যোগাযোগ স্থাপন হয়নি। পলিটিক্যাল অফিসারকে অবশ্য ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে এই বৈঠকের অর্থ হচ্ছে—ক. 'বাংলাদেশ সরকারের' তরফ থেকে এ পর্যায়ে কোনো রাজনৈতিক আপসের ব্যাপারে সত্যিই কোনো আগ্রহ রয়েছে কি না? খ. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের চাহিদা কী? গ. নজরুল ইসলাম এবং তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভাকে এটা জানানো যে, আমরা ইতিমধ্যেই সমঝোতার ব্যাপারে বাংলাদেশের সম্ভাব্য আগ্রহের কথা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দিয়েছি।

২১ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া তাঁর আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। তারবার্তায় উল্লেখ করা হয়, '১. আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা অন্তত এটা ভালোই বুঝতে পারেন যে, ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষ থেকে সমঝোতামূলক সমাধানের বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে।

---

৯. কলকাতার কনসাল জেনারেল স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানান যে, কলকাতায় বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ মার্কিন সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কাইউম একজন বার্তাবাহকের মাধ্যমে জানিয়েছেন, মোশতাক আহমদ এবং তাজউদ্দীন আহমদ এ ধরনের বৈঠকে যোগ দিতে রাজি নন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম অবশ্য কনসাল জেনারেলের অফিসের একজন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে 'আগ্রহী'। [কলকাতা থেকে পাঠানো তারবার্তা নং ২৫২৭, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১]।

আপনি কিন্তু এই অবস্থান অব্যাহত রাখবেন যে, আমরা কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সাতে-পাঁচে নেই। আমরা শুধুই বার্তাবাহক। না চাইছি সমঝোতা, না চাইছি আলোচনায় অংশ নিতে। আমাদের এই ভূমিকার কথা যদি তেমন পরিস্থিতি আসে তাহলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও জানিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। ২. আপনি কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে বৈঠকের সুযোগ পেলে তাদের জানিয়ে দেবেন। ৩. ডিপার্টমেন্ট বিশ্বাস করে, কাইউমকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাদ দেওয়াই সমীচীন। নজরুল ইসলামের সঙ্গে যদি বৈঠকের সুযোগ আসে, তাহলে বিকল্প কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে বিকল্প মাধ্যমে আমরা নজরুল ও বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করব।[১০]

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

এক সম্পাদকীয় নোটে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জার হোয়াইট হাউসে এদিন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এলেক্স ডগলাস হোম এবং রাষ্ট্রদূত ক্রমারের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দক্ষিণ এশিয়ার সংকট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডগলাস হোম উল্লেখ করেন, একটি রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার গুরুত্ব কতটা? কিসিঞ্জার জবাবে বলেন, 'কলকাতায় বাংলাদেশের লোকজনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। ভারতের বাইরে পশ্চিম পাকিস্তানি ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং সে লক্ষ্যে ইয়াহিয়ার কাছ থেকে সম্মতিও আমরা পেয়েছি। কিন্তু ভারতীয়রা এখন এটা পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিতে চাইছে। যেসব লোক এ সমঝোতা চাইছেন, তাঁদের জীবন কঠিন করে তুলছে তারা। তাঁদের সবকিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে ভারত তাঁদের বাধ্য করছে। যেসব

---

১০. একটি স্বাক্ষরবিহীন নথি থেকে মুদ্রিত: 'এই নির্দেশনাপ্রাপ্তির এক সপ্তাহ পর কনসাল জেনারেল ইঙ্গিত দেন, নজরুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠানে তাঁর প্রচেষ্টাকে কেউ থামিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কাইউমই থাকল। কাইউম বার্তা পাঠিয়েছেন, নজরুল ইসলাম এখনো পর্যন্ত একজন মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী। কিন্তু সে জন্য তাঁকে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করতে হবে। [কলকাতা থেকে প্রেরিত তারবার্তা নং ২৫৭০, ২৮ সেপ্টেম্বর]।

বিষয় বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তারা অনবরত সেসব দাবি তুলছে।' নিক্সন মনে করেন যে, ভারতীয়রা সংকটের একটি নিষ্পত্তি প্রতিরোধ করতে মরিয়া। তাঁর কথায়, 'তারা একটি খেলা খেলছে। আমি মনে করি, এই খেলাটা তাদের ভুল। আমার ধারণা, কোনো সমাধান যাতে না হয়, সে লক্ষ্যে তারা সুপরিকল্পিতভাবে বাধা দিচ্ছে। এদিনের আলোচনার শেষ দিকে কিসিঞ্জার বলেন, 'সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশের মানুষ আলোচনার জন্য সম্পূর্ণভাবে উদ্‌গ্রীব। প্রথমত, তারা স্বায়ত্তশাসনের ইস্যুর নিষ্পত্তি চায়। আর আমরা তো সবাই জানিই যে, এই স্বায়ত্তশাসনই তাদের জন্য স্বাধীনতা এনে দেবে। এটা ছাড়া অন্য কোনো দিকে পানি গড়াতেই পারে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ভারতীয়দের নিয়ে। তারা অনতিবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দিচ্ছে। কিসিঞ্জার বলেন, ইয়াহিয়া কখনোই এই দাবি মেনে নেবেন না। একটা তো আসলে মুখ রক্ষার ফর্মুলা বের করতে হবে। একটা ক্রান্তিকাল তো অতিক্রম করতে দিতে হবে। এ সময় নিক্সন আগামী নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে কথা বলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে যথাসময়ে মতবিনিময় করবে। নিক্সন বলেন, 'এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।'

মুজিবকে বাদ দিয়ে সংলাপে

১৯৭১ সালের ২ অক্টোবর 'বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরকারের সমঝোতা' নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণ এক তারবার্তায় ইসলামাবাদ, নয়াদিল্লি ও কলকাতার মার্কিন মিশনে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয়, ১. সংক্ষিপ্তসার: দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠককালে সহকারী পরাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো এই ইস্যুতে এর আগে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝায়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা অবহিত করেন। (২৭ সেপ্টেম্বর ঝায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে সিসকো বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন।) পরাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং মন্তব্য করেন, 'দেখুন, সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের কোনো প্রভাব নেই। তাদের রয়েছে তহবিল সংগ্রহের স্বাধীন উৎস। তারা বরং আমরা কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হচ্ছি, সে কারণে আমাদের ওপর নাখোশ। সিং অবশ্য একই সঙ্গে বলেন, এর অর্থ এই নয় যে, ভারত সংলাপ চায় না।

২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ভারতকে সংলাপের উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তবে শর্ত দেন যে, ভারত যেন মুজিবের অংশগ্রহণ প্রশ্নে চাপ সৃষ্টি না করে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যায়, সে নিয়ে আলোচনায় মুজিবকে জড়াতে চায় না। শরণ সিং বলেন, বাংলাদেশি লোকজনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তো যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং তাদের প্রভাবই বেশি। তাই সংলাপের ব্যাপারে তাদেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপসংহার টানেন এই বলে যে, বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সমঝোতার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব সবকিছুই করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। ৩. ১ অক্টোবরে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শরণ সিং রাজনৈতিক সমাধানের গুরুত্বারোপ করেন।

এর আগের আলোচনায় শরণ সিং বলেন, প্রতিদিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে গড়ে প্রায় ৩৩ হাজার উদ্বাস্তু প্রবেশ করছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই নাজুক হওয়া পরিস্থিতি আরও গুরুতর রূপ নিয়েছে। তিনি বলেন যে, সমস্যার সমাধানে মানবিক কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিকল্প নেই। ভারতের কাছে কোনো নির্দিষ্ট সমাধানের ফর্মুলা নেই। কিন্তু ভারত এটা মনে করে যে, একটি সমাধানে পৌঁছাতে পাকিস্তানের ওপর প্রয়োজনীয় প্রভাব খাটাতে যুক্তরাষ্ট্রের সামর্থ্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা সমাধানে যে উপায় উত্তম মনে করে, তা-ই অনুসরণ করতে পারে। ভারত আশা করে, যুক্তরাষ্ট্র মানবিক ত্রাণ নিশ্চিত করবে। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স বলেন, এটা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা নয়, সুতরাং সমাধানের আশায় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকা ভারতের এক ভ্রান্তি।) সিসকো ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংলাপ শুরুর তাগিদ দেন। তিনি বলেন, গেরিলাদের মধ্যে উগ্রপন্থীদের প্রভাবশালী হয়ে ওঠার ব্যাপারে ভারতের উদ্বেগ যথার্থ। আর সে কারণেই মুজিবকে বাদ দিয়ে হলেও সংলাপ শুরু করাটা গুরুত্বপূর্ণ। সিসকো প্রশ্ন রাখেন, মুজিবকে বাদ দিয়ে এ ধরনের একটি আলোচনা শুরু করা সম্ভব হলে তা কি যৌথভাবে ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করবে না? ৪. শরণ সিং উত্তর দেন, বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের যথেষ্ট প্রভাব নেই। বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্থের জোগান পাচ্ছে। বিদেশ থেকেও তাদের সংগ্রহ ভালো। উপরন্তু, আমরা তাদের স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা সন্তুষ্ট নয়। তা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা ভারতকে সন্দেহের চোখেও দেখছে। তাদের সন্দেহ, আওয়ামী

লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বাদ দিয়ে আলোচনা শুরুর পরিবেশ সৃষ্টি করতে ভারত তাদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে কি না। আসলে ভারত সরকার সংলাপের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু কথা হলো, সে জন্য মুজিব গুরুত্বপূর্ণ। ৫. রজার্স বলেন, মুজিবের নিচের পর্যায়ে আলোচনা শুরুর অর্থ এই নয় যে, তাঁকে পরিত্যক্ত করা হচ্ছে। আলোচনা শুরু করার অর্থ হচ্ছে কোন পথে সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব তা খতিয়ে দেখা। শরণ সিং উত্তর দেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ রয়েছে। যেহেতু তাদের বৃহত্তর প্রভাব রয়েছে, তাই তাদেরই উচিত সংলাপ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া। এ কথার পিঠে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য পুনরুল্লেখ করেন যে, ভারতই ব্যাপকভাবে প্রভাব খাটাতে সক্ষম। ৬. ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি সেন এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে নিম্নপর্যায়ে আলোচনা শুরুর প্রস্তাব করছি। সিসকো উত্তরে বলেন, আলোচনা শুরুর জন্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের কিন্তু কোনো অভাব নেই। এমনকি 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীও' রয়েছেন। সিসকো অবশ্য উভয় পক্ষের নিম্নপর্যায়ে আলোচনা শুরুর ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব দেননি। সিসকো বলেন, শরণ সিং যেভাবে বললেন যে, বাংলাদেশের ওপর ভারতের তেমন কোনো প্রভাব নেই, তা তিনি মানতে অপারগ।

উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবরের পর সম্পাদিত আর কোনো অবমুক্ত করা এবং লেখকের হস্তগত হওয়া নথিপত্রে মোশতাকের গোপন মিশন নিয়ে আলোচনা দেখা যায় না। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে ধারণা করা যায়, মোশতাক সশরীরে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেননি। একমাত্র ভগ্নদূত কাজী কাইউম। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এর পর কাইউমের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তাদের আর কোনো বৈঠকের তথ্য এখনো জানা যায় না।

১৪ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে কাইউম বলেছেন, মোশতাক এবং পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠক নিয়ে খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তখন মন্ত্রিসভা জানতে চেয়েছে, এ ধরনের বৈঠকের উদ্দেশ্য কী? মোশতাক কাইউমকে জিজ্ঞেস করেছেন, এটা খতিয়ে দেখতে যে, কেন মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসার মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক করতে চান। জবাবে পলিটিক্যাল অফিসার বলেছেন, তাঁর ওপর নির্দেশ এসেছে, জবাবে পলিটিক্যাল অফিসার বলেছেন, তাঁর ওপর নির্দেশ এসেছে, তিনি যেন বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান জানতে মোশতাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এর একটা অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, এ ধরনের আলোচনাকালে

পলিটিক্যাল অফিসার হয়তো কিছু বিষয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করবেন। ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে প্রেরিত ২৫১০ নম্বর তারবার্তায় এই বিবরণ দিয়ে বলা হয়, কাইউম বলেছেন, তিনি নিজেও এ ধরনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানে আগ্রহী। কিন্তু মোশতাক যদি একান্তই রাজি না হন, তাহলে তাঁকে বাদ দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার সুপারিশ করবেন। ১৬ সেপ্টেম্বর পলিটিক্যাল অফিসার কাইউমের সঙ্গে আবার দেখা করেন। কাইউম এদিন বলেন, একটি ব্যক্তিগত বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মোশতাকের মন থেকে সন্দেহ ঘোচেনি। তিনি শুধুই জানতে চাইছেন, এই ধরনের বৈঠক করে ফায়দা কী হবে? ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে প্রেরিত ২৫১৩ নম্বর তারবার্তায় এ বিষয়ে আরও তথ্য দেওয়া হয় যে, পলিটিক্যাল অফিসার এ পর্যায়ে কাইউমকে বলেন, আসলে মোশতাক যা কিছুই বলুন না কেন, তা-ই তিনি শুনতে প্রস্তুত।

৭ অক্টোবর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ একটি পর্যালোচনামূলক সারসংক্ষেপ তৈরি করে। কিসিঞ্জারের কাছে এটি পাঠানো হয় ৭ অক্টোবর। এই নথির প্রচ্ছদ থেকে ধারণা মেলে, এটি তৈরি করেছেন স্যামুয়েল হসকিনসন ও রিচার্ড কেনেডি। এই নথির শুরুতেই যেসব জিনিস যুক্তরাষ্ট্রের জন্য করণীয় তার তিনটি দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। ক. উভয় পক্ষে নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন ও গেরিলা তৎপরতা হ্রাস। খ. বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সংলাপের সূচনা। গ. উদ্বাস্তুপ্রবাহ হ্রাস এবং তাদের দেশে ফিরতে উৎসাহিত করা। এসব ইস্যু সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী ও ইয়াহিয়া খানকে উদ্দেশ্যে করে চিঠির খসড়াও প্রস্তুত করা হয়। এই নথিতে 'সমঝোতায় অগ্রগতি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট মনে করে যে, আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে সংকটের সুরাহা করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা ফলপ্রসূ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কলকাতায় বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে এই নথিতে সে কারণে সুপারিশ করা হয় যে, 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে কী করে একটি সংলাপ শুরু করা যায় সে লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। আমাদের সামনে সম্ভাব্য দুটো চ্যানেল রয়েছে। একটি হলো ভারত সরকার এবং অন্যটি হলো কলকাতা ও অন্যত্র অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট বিশ্বাস করে,

সংলাপ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইতিবাচক মনোভাব দেখাতেই রাজি হবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা যা জানি তা হলো, বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ কেবল স্বাধীনতা এবং মুজিবের মুক্তির ভিত্তিতে সমঝোতায় আগ্রহী। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট মনে করে, ভারত বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে একটি সংলাপের ব্যাপারে তাদের প্রভাব খাটাতে তখনই রাজি থাকবে, যখন তারা বুঝতে পারবে, ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব খাটাতে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা এ ধরনের একটি সংলাপে মধ্যস্থতাকারীর অবস্থান নেব কি নেব না। আরব-ইসরায়েল সংঘাতের মতো অবস্থার সৃষ্টি হলে আমরা কিন্তু একটা সমাধানে পৌঁছতে আশাবাদী হতে পারি।

সর্বশেষ ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেও দেখা যায় মার্কিন মধ্যস্থতায় সংলাপ অনুষ্ঠানে অন্তত লোক দেখানো হলেও ভারতের একটা সক্রিয়তা ছিল।

২৯ নভেম্বর ১৯৭১, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স হোয়াইটহাউসের কাছে পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। সূত্র : ভারত-পাকিস্তান ওয়ার্কিং গ্রুপ পরিস্থিতি প্রতিবেদন নম্বর ১০। পূর্ব গ্রিনিচ মান সময় ০৮ :০০ ঘণ্টা। এর ক্রমিক সিক্রেট স্টেট ২১৫০৬০। এই প্রতিবেদন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ইয়াহিয়া সরকারের আলোচনায় ভারতের সরকারি সায় ছিল। রজার্সের স্বাক্ষরিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

> সারসংক্ষেপ : ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের প্রস্তাবে ইয়াহিয়া এই মর্মে তাঁর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে যাঁরা অভিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন না। ইয়াহিয়া আরও বলেছেন, কৌসুলিগণ শেখ মুজিবের বিচারের জন্য দায়ের করা মামলার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছেন এবং ডিফেন্সের তরফ থেকে স্বল্পকালের বিরতি চেয়েছেন। রেডিও পাকিস্তান ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা নতুন আক্রমণের অভিযোগ করেছে। পাকিস্তান সরকার তার সপ্তম ডিভিশনকে পেশোয়ার থেকে সীমান্তে পুনরায় মোতায়েন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। ভারত স্বীকার করেছে যে পূর্ব পাকিস্তানে তারা তৃতীয়বারের মতো বরাবর অভিযান চালিয়েছে।
>
> ১. অটলের প্রস্তাবে ইয়াহিয়ার মন্তব্য : শনিবার রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী

লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ভারতীয় হাইকমিশনার অটলের প্রস্তাবের কথা প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন। ইয়াহিয়া মন্তব্য করেন, অটল হয়তো বিস্ময়করভাবে অনিষ্টকর ভূমিকা পালন করছেন কিংবা তিনি তাঁর সরকার কর্তৃক অবহিত হননি। ইয়াহিয়া বলেছেন, তাঁর অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি রয়েছে এবং তাঁর প্রতিনিধিগণ ফেরারি হিসেবে চিহ্নিত না হওয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আরও উল্লেখ করেন, এ ধরনের বৈঠকের আয়োজন করা হলে 'তাঁরা আমাকে অনিষ্ক্রিয় হিসেবে দেখতে পাবেন না'।

২. রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া: মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শনিবার রাতে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে বলেছেন, তিনি বুঝতে পারছেন, প্রসিকিউটরগণ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা প্রস্তুত করেছেন এবং ডিফেন্স অ্যাটর্নি এ কে ব্রোহিকে তাঁর মক্কেলের পক্ষে যুক্তিতর্ক পেশ করার জন্য চার কিংবা পাঁচ দিনের সময় মঞ্জুর করা হয়েছে। ইয়াহিয়া সম্মত হন যে বিচার-প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ব্রোহির সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার ব্রোহি যাতে ইসলামাবাদে থাকেন, সে বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৩. সামরিক পরিস্থিতি: রেডিও পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, ভারতীয় সৈন্যরা সিলেট, দিনাজপুর ও যশোর জেলা এলাকায় ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু করেছে। পাকিস্তান বলেছে, ভারতীয়দের ট্যাংক ও বিমানসুবিধা রয়েছে এবং লড়াই চলছে। পাকিস্তান দৃশ্যত তার সপ্তম ডিভিশনকে পেশোয়ার থেকে ভারতীয় সীমান্ত বরাবর মোতায়েন করতে শুরু করেছে। এদিকে ভারত স্বীকার করেছে, তারা পূর্ব পাকিস্তানে তৃতীয়বারের মতো অনুপ্রবেশ করেছে। এলাকাটি দিনাজপুরের কাছে। দ্বিতীয় অনুপ্রবেশটি যে এলাকায় ঘটেছিল, তার উত্তরে। ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বলেছেন, ভারতীয় সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যত দূর সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে পড়তে। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানি আর্টিলারি আক্রমণ বন্ধ করতে যতটা পর্যন্ত প্রয়োজন তা করা। সামরিক সূত্রগুলো প্রেসকে বলেছে, ভারতীয় সৈন্যরা এখন পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে ১৫ মাইল পর্যন্ত ঢুকে পড়তে পারে। আর এটাই হলো পাকিস্তানি আর্টিলারির সবচেয়ে শক্তিশালী রেঞ্জ।

আরও জানা বাকি

শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত অনুসন্ধানমূলক একমাত্র নির্দিষ্ট বই হিসেবে এখনো *বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভল্যুশন* রয়ে গেছে। ১৯৭৯ সালে এটি প্রকাশের পর এর অবশ্য আর কোনো সংস্করণ বের হয়নি। বইটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগ লরেন্স লিফশুলজের নিজস্ব। এর শিরোনাম 'তাহের : দ্য লাস্ট টেস্টামেন্ট'। দ্বিতীয় ভাগ 'দ্য মার্ডার অব মুজিব'। এর লেখক লরেন্স লিফশুলজ। সহ-লেখক হলেন কাই বার্ড। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে ভারতের *ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*তে আগস্ট অভ্যুত্থান নিয়ে প্রকাশিত নিবন্ধের মূল লেখক ছিলেন কাই বার্ড। সহ-লেখক ছিলেন লিফশুলজ। কিন্তু পরবর্তীকালে এর ধারাবাহিকতায় মুজিব হত্যাকাণ্ড নিয়ে আর কোনো প্রতিবেদন কাই বার্ড লিখেছেন বলে জানা যায় না।

আগস্টের অভ্যুত্থান বিষয়টি আন্তর্জাতিক প্রকাশনাগুলোতে কীভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ও হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে ইন্টারনেটের পরিচিত সার্চ ইঞ্জিনগুলোর যথাসাধ্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ থেকে একটা সাধারণ ধারণা মেলে যে, বিশ্বের নামীদামি ও প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা বাংলাদেশ অভ্যুত্থানের বিষয়ে লরেন্স লিফশুলজের অনুসন্ধানকে গুরুত্বের সঙ্গে উদ্ধৃত করে চলেছেন। বাংলাদেশি লেখক ও গবেষকেরাও লিফশুলজের ওপরই বেশি নির্ভর করেছেন। আর নির্দিষ্টভাবে এ পর্যন্ত সিআইএ-সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে লিফশুলজই লেখালেখি করে আসছেন।

কাই বার্ড একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কারণ, লিফশুলজের দাবি অনুযায়ী, সিআইএর কথিত সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে বোস্টার কর্তৃক তথ্য প্রকাশের সময় কেবল কাই বার্ড তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাই পুলিৎজার বিজয়ী কাই বার্ড

যদি এ বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণা করেন, তাহলে তিনি লিফশুলজের ঐতিহাসিক দাবির বিষয়ে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে গণ্য হতে পারেন। লিফশুলজের লেখায় কাই বার্ড বারবার এসেছেন।

লিফশুলজ লিখেছেন :

> ১৯৭১ সালে কলকাতায় মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে কাই বার্ড ও আমি ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে হেনরি কিসিঞ্জারকে বিস্তারিত একটি চিঠি লিখি। রাষ্ট্রদূত বোস্টারের সম্পর্ক ছিন্নের নির্দেশ অমান্য করে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সিআইএ স্টেশন নিজ উদ্যোগে মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিল, নাকি এ-জাতীয় কিছু করার জন্য ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—কিসিঞ্জারকে আমরা প্রশ্নগুলো করি এ ব্যাপারে দূতাবাস সূত্রটি আমাদের সন্দেহ আরও জোরালো করে তোলায়। আমরা আরও জানতে চাই, মুজিবের বিষয়ে তাঁর আগাম কোনো ধারণা ছিল কি না। আমরা তাঁকে সুনির্দিষ্ট সাতটি প্রশ্ন করি। এর মধ্যে চারটি ১৯৭১-এ মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে, বাকি তিনটি ১৯৭৫-এর অভ্যুত্থান বিষয়ে।

এক অনুচ্ছেদের জবাবি চিঠিতে ড. হেনরি কিসিঞ্জার লিখলেন :

> আপনাদের বিস্ময় জাগানো ২৩ এপ্রিলের চিঠিটি পড়ছি। চিঠিটি আমার হাতে পৌঁছায় এশিয়া সফরের সময়, সে কারণে জবাব দেওয়ার দুই সপ্তাহের সময়সীমা ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে। আর যা-ই হোক, আপনাদের চিঠির বক্রোক্তি ও অভিযোগের অস্বাভাবিক উপস্থাপনের সঙ্গে আমি একমত নই। শুধু এটুকুই বলব যে, সত্য থেকে এসব অভিযোগের অবস্থান শত হাত দূরে। সে জন্য আমি আপনাদের তথ্য সরবরাহকারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হচ্ছি।

ওই বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে *দি আনফিনিশড রেভল্যুশন*কে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের 'প্রথম সম্পূর্ণ অনুসন্ধান' হিসেবে দাবি করা হয়েছিল। এতে উল্লেখ আছে :

> নিউ ইয়র্কের *দ্য নেশন* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক কাই বার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে লিফশুলজ এমন একটি গল্প উদ্‌ঘাটন করেছেন, যাতে এক দশকের বেশি সময়ের আগেকার দক্ষিণ এশীয় রাজনীতির গোপন ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাঁদের সতর্ক অনুসন্ধানে দেখা যায় কীভাবে রক্ষণশীল বাঙালিদের একটি সংযোগ (Cohesive) গ্রুপ, যারা পাকিস্তান আমলে বিশিষ্ট অবস্থানে উঠে এসেছিল এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর মুজিব কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিল, তারা চূড়ান্তভাবে মুজিবের নিজের দলের

> একটি চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর যোগসাজশে অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিল এবং ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অনুসন্ধানে ওই চক্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের পরিসর সন্ধান করা হয়েছে। এটা একটা জটিল গল্প।

লরেন্স লিফশুলজের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফল কী, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ততম উত্তর হতে পারে—একাত্তরে কলকাতায় খন্দকার মোশতাক আহমদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যে গোপন সমঝোতার চেষ্টা করছিলেন, তার ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও অব্যাহত থাকে। একাত্তরের ওই গোপন আলোচনায় সিআইএ ছিল এবং ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দের সাথে সিআইএর যোগাযোগ ছিল তারই ধারাবাহিকতা। অভ্যুত্থানটি ছিল ওই যোগাযোগেরই যোগফল। সুতরাং লরেন্স লিফশুলজ কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জের কাছ থেকে যখন জানতে পারেন যে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের পূর্বযোগাযোগ ছিল, আর সেটা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর স্বীকার করেছে, তখন তিনি তাঁর অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতার আরও ভিত্তি খুঁজে পান। তবে এর সপক্ষে অবমুক্ত করা কোনো মার্কিন দলিল এখনো পাওয়া যায়নি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে সোলার্জকে লিখিত কিছু জানানো হয়েছিল কি না, তা-ও আমরা জানি না।

আমাদের অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ ছিল মুজিব হত্যাকাণ্ডে বৈদেশিক সম্পৃক্ততা অনুসন্ধান। সেটা করতে গিয়ে লরেন্স লিফশুলজের অনুসন্ধানের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়েছে। কারণ, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ ও বেদনাবিধুর এই ঘটনার ধারাবাহিক তথ্য অনুসন্ধানে দেশি-বিদেশি অন্য কোনো সাংবাদিক ঠিক সেভাবে উদ্যোগী হতে পারেননি।

স্টিফেন সোলার্জকে দিয়ে লিফশুলজ এ বিষয়ে একটি সংসদীয় তদন্তের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা কার্যত শুরুই হতে পারেনি। লিফশুলজ ইঙ্গিত দেন যে সোলার্জের সামনে পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্বের টোপ ছিল। তাই তিনি সিআইএকে ঘাঁটাতে চাননি। আর তা ছাড়া সোলার্জের দপ্তরের যাঁরা এ বিষয়ে গোড়াতে তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন, তাঁরাও পরে রহস্যজনকভাবে নিজেদের গুটিয়ে নেন। ১৯৮০ সালের ৩ জুন সোলার্জ লিফশুলজকে লেখেন :

> ১৯৭৪-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর জানুয়ারির মধ্যে (মুজিবুর) রহমান সরকারের বিরোধীদের সঙ্গে দূতাবাসের বৈঠকের ব্যাপারে পররাষ্ট্র দপ্তর আবারও অস্বীকার করছে না যে বৈঠক হয়েছিল।

কিন্তু কেবল বৈঠক অনুষ্ঠানের তথ্য একটা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে। আমরা এমন কোনো দলিল পাইনি যাতে এ ধরনের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠানের বিবরণ বা উল্লেখ আছে। কিন্তু লিফশুলজের দাবি :

> সোলার্জের চিঠি এসব বৈঠকের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সরকারিভাবে স্বীকারোক্তির প্রথম প্রমাণ। যদিও এই বৈঠকের কথা বর্তমান লেখক [লিফশুলজ] মার্কিন দূতাবাস সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আগেই লিখেছেন। আমরা আমাদের প্রধান সূত্রগুলোকে [বোস্টার যার মধ্যে অন্যতম] বিশ্বাস করেছিলাম। আর সরকারিভাবে স্বীকার করার পর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বৈঠক অনুষ্ঠানের মতো গুরুতর বিষয়ে আমরা যা লিখেছিলাম, তা পুরোপুরি সঠিক।

এই বইয়ের লেখক (মিজানুর রহমান খান) এরকম কিছু দলিলপত্র পেতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, যেখানে ওই ধরনের 'পূর্বযোগাযোগের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলোকে চেনা যাবে। লিফশুলজ তাঁর 'সূত্রগুলোর' মধ্যে এ পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে বোস্টারের নাম প্রকাশ করেছেন। শুধু 'পূর্বযোগাযোগ'ও নিশ্চয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। কিন্তু তা হয়তো আমাদের 'যুক্তিসংগত সন্দেহের ঊর্ধ্বে' তোলে না।

বিষয়টি নিয়ে আমরা যখন লিফশুলজকে প্রশ্ন করি যে মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএর সম্পৃক্ততার বিষয়ে তিনি কি এ পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছেন, তখন তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'সুনির্দিষ্ট তথ্য বলতে আপনি কী বোঝেন?' এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে তাঁর অব্যাহত অবস্থানের প্রতিফলন ঘটিয়ে কলকাতায় পাক-মার্কিন চক্রের সঙ্গে ১৫ আগস্টের চক্রান্তকারীদের যোগসাজশ এবং তা সোলার্জ দ্বারা সমর্থিত হওয়ার বিষয়টিরই পুনরুল্লেখ করেন। তিনি তাঁর মূল বইয়েও এই একটি বিষয় প্রমাণ এবং তা নিয়ে গভীর বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য ১৯৭১ সালের আগে পূর্ব পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং এ সময় ওই সব লোকের সঙ্গে সিআইএর যোগসাজশ ঘটার যে যুক্তিসংগত সম্ভাবনা, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সেই যোগাযোগের কোনো চরিত্রকে আমরা ১৯৭১ সালের কলকাতায় কিংবা পঁচাত্তরের আগের কোনো দৃশ্যপটে উপস্থিত এখনো দেখি না।

বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভল্যুশন বইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লিফশুলজ বলেন, 'অত্যন্ত অল্পসংখ্যক কর্মকর্তা, সম্ভবত ছয়জনের চেয়েও কমসংখ্যক লোক, ওই পূর্বযোগাযোগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।' তবে তিনি এটাও

লেখেন, '৭১-এর ওই রাজনৈতিক সমঝোতা-পর্বটির বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ জানা এখনো আমাদের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেছে।'

১৯৭৯ সালে লিফশুলজ যখন এ কথা লেখেন, তখন তা আক্ষরিক অর্থেই সত্য ছিল। কিন্তু মার্কিন তথ্য অধিকার আইনের আওতায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কিছু গোপন দলিল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবমুক্ত করা হয়েছে। সে জন্য কিছু বিষয় এখন আমাদের সামনে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। অবশ্য তারও সীমাবদ্ধতা হলো, কেবল মার্কিন সূত্র থেকেই আমরা এসব ঘটনা পাঠকের কাছে আনতে পারছি।

লিফশুলজ লিখেছেন, 'ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং এবং কলকাতার মার্কিন কনসাল হার্বার্ট গর্ডনকে কলকাতা কন্টাক্টসের বিষয়ে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল।'

এখন তাই আমাদের জানতে হবে, কিটিং এবং গর্ডন ওই গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে সত্যিই কতটা অন্ধকারে ছিলেন এবং তাঁরা ওই আলোচনায় কতটা ও কীভাবে অংশ নিয়েছিলেন। যদি দেখা যায়, ওই আলোচনায় ভারতসহ কমবেশি সব পক্ষই অংশ নিয়েছিল এবং এমনকি মোশতাক-চাষীকেও যদি মুজিবের মধ্যস্থতায় সংলাপ বা সমঝোতা সম্পর্কে অন্তত দালিলিকভাবে 'আপসহীন' থাকতে দেখা যায়, তাহলে তা লিফশুলজের অনুসন্ধানের ওপর কতটা কী প্রভাব ফেলবে, সেই প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দিতে পারে এবং তা কিছুটা খতিয়ে দেখার মতো দলিলপত্র আমাদের হাতে আছে।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের বিষয়ে সিআইএ বা কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা-সংক্রান্ত লিফশুলজের বক্তব্যের সমর্থক আরও বেশি দলিল পাওয়ার চেয়ে আপাতত কলকাতার ওই গোপন সমঝোতার বিষয়ে বিস্তারিত দলিল পাওয়ার সম্ভাবনাই এখন বেশি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। লিফশুলজ লিখেছেন :

> এই প্রবাসী বাংলাদেশি নেতৃত্বের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন খন্দকার মোশতাক। অবশ্য মোশতাকের গোপন যোগাযোগের বিষয়টি ১৯৭১-এর অক্টোবরেই ফাঁস হয়ে যায় এবং তাঁকে কলকাতায় কার্যত গৃহবন্দী করে রাখা হয়। কলকাতায় মোশতাক ছিলেন যোগাযোগের মধ্যমণি। কিসিঞ্জার আওয়ামী লীগ সরকারের একটি নির্বাচিত অংশের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাঁদের দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যায়।

প্রাপ্ত মার্কিন দলিলপত্রে এটা স্পষ্ট যে, শেখ মুজিবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর কাজী জহিরুল কাইউম ছিলেন 'কলকাতা কন্টাক্টসে'র মধ্যমণি। কিন্তু লিফশুলজের আলোচনায় তাঁর নাম বা প্রবাসী সরকারের সমঝোতা-প্রয়াসের বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই।

একাত্তরের ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বরে বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলোতে কাজী জহিরুল কাইউমকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোগ রাখাসংক্রান্ত আলোচনায় কথিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রস্তুতির কথা অবহিত করতে দেখা গেছে। আবার জহিরুল কাইউমকে স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে দেখা গেছে। শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও বজায় ছিল।

ভবিষ্যতে আমরা খতিয়ে দেখব যে, ভারত ও পাকিস্তান সরকার, তাজউদ্দীন আহমদ, কাজী জহিরুল কাইউম, খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং জর্জ গ্রিফিন যুদ্ধকালে কতটা কী পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন।

লিফশুলজের অনুসন্ধানের নির্ভরযোগ্য একটি চরিত্র হচ্ছেন ডেভিস ইউজিন বোস্টার। আমরা দেখেছি, মার্কিন কথ্য ইতিহাস প্রকল্পকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোস্টার নির্দিষ্টভাবে দাবি করেছেন যে, 'আগস্ট অভ্যুত্থানকে যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদন দেয়নি।' কিন্তু মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে এই বোস্টারই লিফশুলজের প্রধান সূত্র বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর মৃত্যুর পর লিফশুলজ তাই আফসোস করেন যে, তিনি বোস্টারের একটি সাক্ষাৎকার নেবেন বলে সংকল্প করেছিলেন কিন্তু সেই সুযোগ তিনি পাননি। লিফশুলজ বারবার বলেছেন, মুজিব হত্যাকাণ্ডে বোস্টার 'অত্যন্ত ব্যথিত' হন। 'নৈতিক দায়' থেকে এ বিষয়ে তিনি লিফশুলজের কাছে তথ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী তাঁর পাঠানো তারবার্তাগুলোতে সেই ব্যথিতচিত্ততার কোনো ছাপ নেই বললেই চলে। বরং জাসদের সভা সফল হয়নি বলে আক্ষেপ করে তাঁকে ওয়াশিংটনে বার্তা পাঠাতেও দেখা গেছে।

এখন তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, কথ্য ইতিহাসবিদ চার্লস স্টুয়ার্ট কেনেডিকে দেওয়া বোস্টারের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে লিফশুলজকে দেওয়া তাঁর গোপন সাক্ষাৎকার কোনো বিরোধ সৃষ্টি করেছে কি না? লিফশুলজকে তিনি যদি সাক্ষাৎকার দিতেনও তাহলে কি বোস্টার এমন কিছু বলতেন যা স্টুয়ার্ট কেনেডিকে দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে ভিন্নতর হতো? বোস্টার তাঁর সাক্ষাৎকারে দৃশ্যত এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি, যাতে লিফশুলজের দাবি

জোরালো করার পক্ষে তাঁকে কাজে লাগানো যেতে পারে। উপরন্তু, বোস্টার মুজিবকে ১৯৭৫ সালে অভ্যুত্থানের অল্প আগে সতর্ক করেছিলেন মর্মে স্টিফেন আইজেনব্রাউন যে দাবি করেছেন, সে বিষয়েও বোস্টার তাঁর সাক্ষাৎকারে কিছুই উল্লেখ করেননি।

মার্কিন-পক্ষে কলকাতায় মোশতাক ও ইয়াহিয়ার মধ্যেকার গোপন সমঝোতার অনুঘটক ছিলেন জর্জ গ্রিফিন। মি. গ্রিফিন সত্যিই একটি কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র। লিফশুলজ তাঁর অনুসন্ধানে তিন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়াটা জরুরি মনে করেছেন। এঁরা হলেন ড. হেনরি কিসিঞ্জার, হ্যারল্ড স্যান্ডার্স ও জর্জ গ্রিফিন। কিন্তু গ্রিফিন বাদে অন্যরা লিফশুলজের মুখোমুখি হননি।

উল্লেখ্য, ড. হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত *হোয়াইট হাউস ইয়ার্স*-এ লিফশুলজ বর্ণিত পূর্বযোগাযোগ সম্পর্কে লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত লক্ষ্মীকান্ত ঝায়ের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার, আওয়ামী লীগ ও ইয়াহিয়া সরকারের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল। ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখের অবমুক্ত করা একটি মার্কিন নথি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, ইয়াহিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মোশতাক গ্রুপ বা প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিনিধিদের বাস্তবে আদৌ কোনো বৈঠক হয়নি।

গ্রিফিন সম্পর্কে লিফশুলজ তাঁর বইয়ের ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> ১৯৭৮ সালে আমি যখন তাঁর (গ্রিফিন) প্রথম সাক্ষাৎকার নিই, তিনি তখন আমাকে ধারণা দিয়েছিলেন যে, ওই গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। কলকাতায় একটি কূটনৈতিক ককটেল পার্টিতে এরকমের একটি আলোচনার কথা শুনেছিলেন মাত্র।

১৯৭৯ সালে লিফশুলজ আবার গ্রিফিনের সাথে যোগাযোগ করেন। তখন গ্রিফিন বিষয়টিকে একবারে নাকচ না করে বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা উচিত। কিন্তু আমি মনে করি না যে এ বিষয়ে কথা বলার স্বাধীনতা আমার রয়েছে। সর্বশেষ আমি যখন এই বিষয়ে খোঁজ নিই, তখনো বিষয়টি গোপনীয় হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ছিল।'

লিফশুলজ তাঁকে বলেন যে এমন একটি পুরনো ইতিহাস সম্পর্কে গোপনীয়তা থাকার কথা নয়। তখন গ্রিফিন বলেন, 'বিপুলসংখ্যক খেলোয়াড় এখনো বেঁচে আছেন।' লিফশুলজ লিখেছেন : 'ওই গোপন যোগাযোগের খেলোয়াড়দের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী

তাজউদ্দীন আহমদের মতো শীর্ষ নেতৃত্বকে এড়িয়ে ওই সমঝোতার ওপর জোর দিয়েছেন।'

লিফশুলজের যুক্তি, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষস্থানীয় সকলে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন এবং এই ইস্যুতে তাঁরা কোনোভাবে আপস করতেন না। এ কারণে বাঙালি নেতৃবৃন্দকে বিভক্ত করা এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী অংশটিকে সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা অপরিহার্য ছিল। লিফশুলজের বর্ণনায় :

> স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু নিয়ে ওই গোপন সমঝোতার জন্য ১৯৭১ সালের অক্টোবরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। মোশতাক তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি যদি তখন সে কর্তৃত্ব নিয়ে নিউ ইয়র্কে যেতে পারতেন, তাহলে স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছুর ফর্মুলা নিয়ে একটা আপসমূলক ঘোষণা দিয়ে বসতে পারতেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা যেমনই হোক, সেটা বাস্তবে পরিণত হয়নি। মোশতাকের গোপন যোগাযোগ অক্টোবরে উদ্ঘাটিত হয়েছিল এবং সে জন্য তাঁকে গৃহবন্দী [আসলে নিষ্ক্রিয়] করে রাখা হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক সফরে তিনি যেতে পারেননি।

লিফশুলজের এই বক্তব্যের সপক্ষে ভারত সরকারের কাছে নথিপত্র থাকার কথা। কিন্তু তা এখনো অপ্রকাশিত। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ভারত সরকার এখনো প্রকাশ না করায় জেনারেল জ্যাক জ্যাকব উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে জানতে তাই আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে। লিফশুলজ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মোশতাকের ওই সম্ভাব্য গোপন ভূমিকার সঙ্গে সিআইএর সম্পর্ক ছিল আর সেই যোগাযোগটাই অভ্যুত্থান পর্যন্ত গড়িয়েছিল। লিফশুলজের একটি দাবির সপক্ষে কিছু দালিলিক প্রমাণ মিলছে। লিফশুলজ তাঁর বইয়ের ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, '১৯৭৪ সালের হেমন্তে একটি উচ্চপর্যায়ের মার্কিন দূতাবাস সূত্র বলেছে, ঢাকার মার্কিন কূটনৈতিক মিশনের সঙ্গে মুজিব-বিরোধী মহল যোগাযোগ করেছে। তারা বুঝতে চেয়েছে, বাংলাদেশে সরকারের পরিবর্তন ঘটলে [তার প্রতি] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবমুক্ত করা দলিল থেকে আমরা দেখতে পাই, ১৯৭৪ সালের মে মাসে ফারুক রহমান ঢাকায় মার্কিন জনসংযোগ কর্মকর্তা গ্রেশামের বাসায় গিয়ে সরাসরি মুজিব সরকার উৎখাতে মার্কিন সহায়তা

কামনা করেন। আর এ ধরনের তথ্য কিসিঞ্জার, স্যান্ডার্স এবং গ্রিফিনের কাছে পৌঁছেছিল বলে লিফশুলজ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই তিনজনকে বাছাই করার ব্যাপারে তিনি নির্দিষ্ট তথ্য দেননি। প্রাপ্ত দলিলেও আমরা এর সপক্ষে কোনো উল্লেখ পাইনি।

লিফশুলজের অনুসন্ধানের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাঁরা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রজার মরিস অন্যতম। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে হেনরি কিসিঞ্জারের স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। তবে রজার মরিস-বর্ণিত কিসিঞ্জারের 'বৈদেশিক শত্রু'র তালিকার উল্লেখ অন্য কোথাও দেখা যায় না। এবং 'সবচেয়ে ঘৃণিত লোক' হিসেবে চিলির সালভাদর আয়েন্দে, ভিয়েতনামের নগুয়েন ভ্যান থিউ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখও মরিসের একক দাবি। রজার মরিস বলেন, 'কিসিঞ্জার মনে করতেন যে, "বাংলাদেশের ঘটনাবলি তাঁর জন্য একটি ব্যক্তিগত পরাজয়। একজন নির্বাসিত নির্যাতিত নেতা হিসেবে মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আমার বিবেচনায় একটি ট্যাংকে চেপে কাস্ত্রোর হাভানায় পৌঁছানোর পর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে সবচেয়ে বিব্রতকর একক ঘটনা।"'

দি আনফিনিশড রেভল্যুশন বইয়ে রজার মরিসের সঙ্গে লিফশুলজের আলাপচারিতার একটি অংশ রয়েছে। রজার মরিস হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকার বিষয়ে ডক্টরেট করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন অ্যাকিসনের সহকারী হিসেবে যোগ দেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হওয়ার পর হেনরি কিসিঞ্জারের আগ্রহেই মরিস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এনএসসি)-র জ্যেষ্ঠ সহকারী পদে বহাল হন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পটভূমিতে ১৯৭০ সালের এপ্রিলে তিনি পদত্যাগ করেন। *আনসারটেইন গ্রেটনেস : হেনরি কিসিঞ্জার অ্যান্ড আমেরিকান ফরেন পলিসি* বইয়ের রচয়িতা মরিস একজন লেখক ও ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত। ওই আলাপচারিতায় লিফশুলজ মরিসকে বলেন :

> ১৯৭৪-১৯৭৫ সালের ঘটনাবলি সম্পর্কে আমি আপনার উপলব্ধি জানতে চাই। মুজিব-শাসন আমলের জন্য ৭৪ সালটি ছিল অত্যন্ত অবনতিশীল। ১৯৭১ সালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নায়ক ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে প্রায় একটি জাতীয় বলির পাঁঠায় পরিণত হয়েছিলেন, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বটি তত দিনে ঘৃণিত, যার মূলে রয়েছে তিক্ততা ও মোহমুক্তি। ১৯৭১ সালে যে গ্রুপটি কলকাতায় গোপন যোগাযোগে লিপ্ত হয়েছিল, বলা হয় তারাই ১৯৭৪ সালে মার্কিনদের কাছে জানতে চায়, বাংলাদেশে একটি সম্ভাব্য

অভ্যুত্থানের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার কী মনোভাব নেবে। আপনি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের পটভূমি সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন, মুজিবের প্রতি কিসিঞ্জারের মনোভাব সম্পর্কে জানেন। এখন আপনিই বলুন, কিসিঞ্জার ওই গ্রুপের প্রতি কোনো ধরনের সংকেত দিয়েছিলেন কিনা কিংবা সে ধরনের একটি পরিবর্তনকে যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদন দেবে—এরকম কোনো ইঙ্গিত দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল কি না। (*বাংলাদেশ: দি আনফিনিশড রেভল্যুশন*: পৃষ্ঠা ১৭১)

রজার মরিস উত্তর দিয়েছেন

হ্যাঁ। দুই কারণে এটা আপাতদৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে হয়। প্রথমত, ইতিমধ্যেই অস্থিতিশীল হয়ে পড়া একটি সরকারের অপসারণের প্রশ্নে কিসিঞ্জারের কোনো কুণ্ঠা থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, যেকোনো সিআইএ স্টেশনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, এ ধরনের অভ্যুত্থানের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেওয়া এবং তার নিজের দরজা খুলে রাখা। এ ব্যাপারে ওয়াশিংটনের ক্ষমতায় কে আছেন, রাজনীতি কী অবস্থায় রয়েছে, তা কিংবা পরিস্থিতির মতাদর্শগত কোনো দিক কিন্তু তাদের বিবেচ্য নয়। (প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ১৭১)

আমরা এখানে দেখি, মরিস অভ্যুত্থানে মার্কিন-সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি, দুয়ে দুয়ে চারের মতো একটা যৌক্তিক ধারণায় পৌঁছেছেন মাত্র। ১৬৯ থেকে ১৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণিত রজার মরিসের সাক্ষাৎকারের কোথাও তিনি নির্দিষ্টভাবে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের বিষয়ে কিসিঞ্জার বা তাঁর প্রশাসনের তরফে কোনো আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেননি। তবে লিফশুলজ এবং রজার মরিস উভয়েই পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে বিবরণ দিয়েছেন বা বিশ্লেষণ করেছেন, তার যৌক্তিক ভিত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী।

আমাদের অনুসন্ধানে এটা অনুমেয় যে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়লাভের ব্যাপারে ফারুক-রশিদ ও মোশতাকের আবেদনে সাড়া দিতে কিসিঞ্জার উৎসাহী ছিলেন। মোশতাককে দ্রুত স্বীকৃতি প্রদানে তাঁর সন্তুষ্টি তিনি চাপা রাখেননি। মুজিবের সংকটময় মুহূর্তে খাদ্যসাহায্য প্রদানে তিনি ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মুজিব সরকার যাতে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে না পারে তার জন্য তিনি সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছিলেন।

এটা লক্ষণীয় যে বাংলাদেশে যে সময়টায় অভ্যুত্থান ঘটে ওই সময় বিশ্বের দেশে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ও সরকারের উৎখাত বিরল ঘটনা ছিল

না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বৈদেশিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সামরিক অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের কথিত প্ররোচনা নিয়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের পাস করা এমন আইন ছিল, যার আওতায় সিআইএ কিংবা যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের হয়ে কোনো বিদেশি নেতাকে উৎখাত করাই শুধু নয়, প্রয়োজনে তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদানে তাঁদের এখতিয়ার স্বীকৃত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। সে কারণেই লিফশুলজ মরিসের কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'সময়টা ছিল ১৯৭৫। বৈদেশিক নেতৃবৃন্দকে হত্যার বিষয়ে চার্চ কমিটির শুনানির তুঙ্গ অবস্থা বিরাজ করছিল। সে রকম একটি প্রেক্ষাপটে মুজিব সরকার উৎখাতে কিসিঞ্জারের কি ইতস্তত বোধ করার কথা ছিল না?' এর উত্তরে মরিস বলেছেন, 'নির্বাহী বিভাগের অভ্যন্তরে যে খেলাটা খেলা হয়, সে সম্পর্কে অধিক আঁচ করা প্রায় অসম্ভব। এই অবস্থায় ইতিমধ্যেই একটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়া সরকারের অপসারণ ও সেখানে আরেকটি সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কিসিঞ্জারের একেবারেই কোনো ইতস্তত বোধ করার কথা নয়।'

এরপর লিফশুলজের প্রশ্ন :

> একাধিক সূত্র যে আমাদের কাছে এই ধারণা তুলে ধরেছেন, অভ্যুত্থানের পরপর মার্কিন সাহায্য ও সমর্থনপ্রত্যাশী ভিন্নমতাবলম্বী চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর প্রতি একটি 'সম্মতি'সূচক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, তা কতটা সত্যি?

লিফশুলজের এই প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন তোলা যায়, রুশ-ভারতের অক্ষশক্তি থেকে সদ্য ছিটকে পড়া বাংলাদেশের চক্রান্তকারী অথবা নতুন শাসকগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানো তৎকালীন আমেরিকার বিদেশনীতির জন্য স্বাভাবিক ঘটনা ছিল কি না? এই সম্মতিসূচক বার্তা সঠিক হলেও সিআইএ বা মার্কিন-সংশ্লিষ্টতায় মুজিব হত্যাকাণ্ডের সন্দেহকে তা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করায় কি না?

খন্দকার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে, এমনকি তাঁকে টিকিয়ে রাখতে হেনরি কিসিঞ্জারের উৎসাহ ও সম্মতিতে কোনো রাখঢাক ছিল না।

এমনকি প্রশ্ন ওঠে, সৈয়দ ফারুক রহমান আসলে কে? ঠিক কবে থেকে তাঁর সঙ্গে মার্কিন-সংশ্লিষ্টতার শুরু? শেখ মুজিবুর রহমানের জীবদ্দশায় তাঁকে অন্ধকারে রেখে দুই মেজরের অস্ত্র ক্রয়ের মিশনের একটা যুক্তি হতে পারে যে, এটা বাহ্যিক, লোক দেখানো। কূটকৌশল মাত্র। এরশাদ-খালেদার আমলে মেজরদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন-প্রক্রিয়ায় কি কোনো বিদেশি হাত ছিল না? চক্রান্তকারীদের চাকরিতে বহাল রাখার ধারাবাহিকতা কি কেবল

আমাদের রুগ্ণ রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ? মুজিব হত্যায় বিদেশি-সংশ্লিষ্টতা দেখতে হলে দৈনিক *মিল্লাত* প্রকাশনা, ফ্রিডম পার্টি গঠন ও তাতে অর্থায়ন এবং নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের পর্বটি কি খতিয়ে দেখার নয়? বজলুল হুদাকে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত করে আনা এবং প্রেসিডেন্ট পদে ফারুক রহমানকে এরশাদের বিপক্ষে প্রার্থী করানোর মতো প্রতীকী রাজনৈতিক পদক্ষেপের পেছনে কি বাইরের কারও ইঙ্গিত কিংবা কাউকে খুশি করার বিষয় ছিল না? ঘাতকদের প্রতি জিয়াউর রহমানের অবস্থানটিও পরিষ্কার নয়। মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি ও তাঁর সরকারের যোগসূত্রটিও রয়ে গেছে রহস্যাবৃত। বিশ্বের বহু দেশে রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ঘটেছে। কিন্তু অভ্যুত্থানকারীদের সমর্থন দিতে গিয়ে দেশের নাম পাল্টানোর মতো নজির হয়তো কেবল ১৯৭৫ সালেই ঘটেছে। এর পেছনে বাংলাদেশে কেবলই অভ্যুত্থানের ঘোষক মেজর ডালিম ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ব্যক্তিগত অপরিণামদর্শিতা কিংবা আবেগ কাজ করেছিল বলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমাদের ধারণা, ভবিষ্যতে মার্কিন দলিল থেকেই ১৫ আগস্টের পর পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন প্রশ্নে ফারুক রহমানের সম্ভাব্য মনোভাবের কথা প্রকাশ পেতে পারে।

মুজিবের প্রতি ফারুকের বিরাগের শুরু কবে থেকে? কেন? পারিবারিক বিরোধের গল্প তো অনেক পরের কথা। এটা কি কাকতালীয় যে সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র কিনতে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে মার্কিন দূতাবাসে গমন, ১৯৭৪ সালে মুজিব সরকারের উৎখাতে অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় মার্কিন সাহায্য চাওয়া, পঁচাত্তরের মার্চে অভ্যুত্থানের গুজব এবং তা নিয়ে ঢাকা ও দিল্লির মার্কিন দূতাবাস এবং ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্যকার 'সিক্রেট' তারবার্তার আদান-প্রদান, পঁচাত্তরের আগস্টে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদান, অক্টোবরে সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় মার্কিন সাহায্য চাওয়া এবং ব্যাংককে গিয়েও যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসেই ধরনা দেওয়া এবং সে দেশেই রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার সঙ্গে কেবল একজন ব্যক্তি জড়িত থাকবেন? এবং তাঁর নাম সৈয়দ ফারুক রহমান। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ফারুক-রশিদের সম্ভাব্য আলাপচারিতার বিষয়ে এ পর্যন্ত সামান্য কিছুই জানা সম্ভব হয়েছে।

মার্কিনপন্থী মোশতাকের নতুন সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ও সমর্থন প্রদানে কিসিঞ্জারের যে অত্যন্ত উৎসাহ ছিল তা-ও পরিষ্কার। তবে এ প্রসঙ্গেও লিফশুলজের ভাষ্য হচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও কোনো একটা গোপন চ্যানেল সক্রিয় ছিল। তাঁর বর্ণনায় :

স্থানীয় সিআইএ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা, যাঁরা কিনা চার্চ কমিটির শুনানির ফলে হেলমস ও অন্যদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ফৌজদারি অভিযোগ গঠনের বিষয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন, উভয়কে পাশ কাটিয়ে এ মার্কিন সম্মতির কথা কোনো একটি স্বাধীন চ্যানেলের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। স্থানীয় দূতাবাসের এরকম কোনো 'সম্মতির' বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তার লিয়াজোঁ ভেঙে দিতে উদ্যোগী হওয়ার প্রেক্ষাপটে হেনরি কিসিঞ্জার কি অন্য কোনো চ্যানেল ব্যবহার করেছিলেন? কোনো অপারেশন চালাতে পররাষ্ট্র দপ্তর এবং সিআইএ উভয়কে কাজে লাগানো কি কিসিঞ্জারের স্টাইল? বলা হয়, ১৯৭১ সালে তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা স্যান্ডার্সের ওপর নির্ভরশীল থেকে পররাষ্ট্র দপ্তর এবং সিআইএর মাধ্যমে কলকাতা ও দিল্লির দূতাবাসের কাজ সেরেছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের পরিস্থিতিতে একটি সরাসরি চ্যানেল ব্যবহার করা কিসিঞ্জারের পক্ষে সম্ভব ছিল কি না?

লিফশুলজের এই প্রশ্নের জবাবে মরিসের উত্তর :

প্রশ্নটা অবশ্যই আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত।...এ ক্ষেত্রে অন্য আরেকটি উপাদান বিবেচ্য। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৭৫ সালের গোড়ায় সিআইএ সম্পর্কে চার্চ কমিটিতে অনেক কিছুই প্রকাশ পাচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার [বিদেশি সরকার উৎখাত] বিরুদ্ধে সমালোচনা ছিল প্রবল। সিআইএ এরকম সময়ে ফোর্টি কমিটিতে কিসিঞ্জারের সায় নিয়ে এঙ্গোলায় ঝাঁপ দিয়েছিল। এমনকি এটা ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ সেইমুর হার্শের প্রতিবেদন প্রকাশ এবং অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে কংগ্রেসে আইন পাস করার পরও সম্ভব হয়েছিল। একই সময় চার্চ কমিটি হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য রেখে এবং অত্যন্ত বিব্রতকর ঘটনাবলির নথিপত্র সংগ্রহ করে একের পর এক তির ছুড়ে চলছিল। এসব বিষয়ে *নিউ ইয়র্ক টাইমস* এবং *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে খবর ছাপা হচ্ছিল। প্রশাসনের জন্য যা ছিল অত্যন্ত বিব্রতকর। কলবিকে [সিআইএ পরিচালক] সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে ক্যাপিটাল হিলে ছুটতে হতো। এরকম পটভূমিতে কিসিঞ্জার একটি 'ক্ল্যাসিক কোভার্ট অপারেশন' পরিচালনায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও অভ্যুত্থানে 'মার্কিন সরকারের কিংবা তার কোনো [গোয়েন্দা] সংস্থা'র কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, যুক্তরাষ্ট্র সরকার গোড়া থেকেই এটা দাবি করে আসছে। সুতরাং এখন অবমুক্ত করা মার্কিন দলিলপত্রে যে এর বিপরীত বা ভিন্ন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না, তাতে তেমন

বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, থলেতে বিড়াল থাকলেও তা তো এরকম পথে বেরোনোর কথা নয়। রজার মরিস ১৯৭৯ সালেই লিফশুলজকে এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, 'যদি কেউ মার্কিন প্রশাসনের লজ্জা বা বিব্রত হওয়ার মতো কোনো কিছু দেখতে আগ্রহী হন, তাহলে তিনি ওই সময়ের দলিলপত্রে তা খুঁজে পাবেন না।'

সুতরাং রজার মরিসের বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে মার্কিন-সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে এমন কোনো নথিপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা কম, যাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারিভাবে বিব্রত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে সিআইএ শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকার সম্পর্কে কী মনোভাব ব্যক্ত করেছিল, সেটা জানতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অবশ্য এই চেষ্টা যে অসম্পূর্ণ, আংশিক কিংবা খণ্ডিত, তা মেনে নিতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই।

বর্তমান প্রয়াসের মাধ্যমে মূলত দেখার চেষ্টা করা হয়েছে লিফশুলজ ও অন্যরা তাঁদের অনুসন্ধানকে যে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা কী এবং প্রাপ্ত পার্শ্বদলিলগুলো কী বলছে। এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও সিআইএর দলিল কী বলে? '৭৫-এর বিয়োগান্ত ঘটনায় বিদেশি সরকার বা কোনো বহিঃশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বা ইঙ্গিত সম্পর্কে দলিলগুলো কোথাও কিছু ধারণ করেছে কি না, সেই নিরিখে এই গ্রন্থ একটি ব্যাপকভিত্তিক অনুসন্ধান-প্রক্রিয়ার প্রাথমিক খসড়ামাত্র।

মোশতাক সরকারের প্রতি কিসিঞ্জারের বিশেষ সহানুভূতির বিষয়টি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমাদের পক্ষে কোনো মতামত দেওয়া সম্ভব হয়নি। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া বা সেদিকে ইঙ্গিত করার কোনো প্রশ্নও এখানে ওঠে না।

পঁচাত্তরের ইতিহাসের অনেক ধূসর পর্ব আমাদের অজানা। এ অস্পষ্টতা হয়তো কেবল মার্কিন দলিল দূর করতে পারবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও পাকিস্তান সরকারের দলিলপত্রও এ ক্ষেত্রে বড় উৎস। লরেন্স লিফশুলজ নির্দিষ্টভাবে কলকাতায় খন্দকার মোশতাক আহমদ, মাহবুব আলম চাষী ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে মার্কিন যোগাযোগের দিকে নির্দেশ করেছেন। তাঁর কথায় ইঙ্গিত মেলে যে, আটটি গোপন যোগাযোগবিষয়ক দালিলিক প্রমাণ তাঁর কাছে আছে। এমনকি কুমিল্লা উপাখ্যানও আমাদের অজানা। আহমদ ছফা তাঁর 'মুজিব হত্যার নীল নকশা : আমি যতটুকু জানি' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, শেখ মুজিবকে হত্যা

করার যে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল তাতে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। চাষী তাঁর টেবিল থেকে আনুমানিক ৬ ইঞ্চি বাই ৮ ইঞ্চি সাইজের বাঁধানো একটি ছবি দেখিয়ে ছফাকে বলেছিলেন, 'এই যে দেখুন, আমার, মোশতাক সাহেব এবং তাহেরউদ্দিনের ছবি। কলকাতাতে আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম এবং কাজ করতাম।' মুজিব হত্যাকাণ্ডের পরে বঙ্গভবনে ছফাকে চাষী সেই ছবিটি দেখিয়ে বললেন, 'বলেছিলাম না একাডেমি আমার টেম্পরারি হাইডআউট। দেখতেই তো পাচ্ছেন আমরা তিন জন আবার বঙ্গভবনে একসঙ্গে কাজ করছি।' (*আহমদ ছফা রচনাবলি*, ৭ম খণ্ড, ২০০৮, পৃ. ১৪৪)

লিফশুলজ তাঁর বইয়ের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> তাজউদ্দীন কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাককে অপসারণ করা হয়েছিল। আটটি গোপন যোগাযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে তাঁকে অপসারিত করা হয়। আমরা নির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে সক্ষম হয়েছি।

বর্তমান লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাবেক স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীও পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনে খন্দকার মোশতাকের পরিকল্পনার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। আর লিফশুলজের দাবি, তাঁর কাছে ওই আট গোপন যোগাযোগের দালিলিক প্রমাণ রয়েছে।

লিফশুলজ রজার মরিসের সঙ্গে আলাপচারিতায় পঁচাত্তরে কিসিঞ্জারের মনোভঙ্গি, পারিপার্শ্বিকতা এবং তাঁর সামর্থ্য নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। মরিস কিন্তু নির্দিষ্টভাবে সিআইএর সম্পৃক্ততার বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি। লিফশুলজ একইভাবে সিআইএর স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরির কাছেও কিছু প্রশ্ন রাখেন। লিফশুলজ তাঁর বইয়ে লিখেছেন :

> যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিত কোনোভাবে মোশতাক গ্রুপ-সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করতে সহায়ক ছিল কি না যে, তাঁরা যদি তাঁদের পরিকল্পনামতো অগ্রসর হন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আপত্তি থাকবে না? এবং এভাবে তারা একে একটা মার্কিন 'সম্মতি' হিসেবে ধরে নিয়ে থাকতে পারে কি না? এ বিষয়ে চেরির উত্তর ছিল 'অবশ্যই নয়, ১৯৭৪ কিংবা ১৯৭৫-এর বাংলাদেশে আমার জানামতে এটা হতে পারে না, এটা হওয়ার কথা নয়। আপনি যেমনটা জানেন, সে সময় অনেকগুলো অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এর কোনোটি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আগাম কোনো তথ্য ছিল না।

সুতরাং এটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে কলকাতাকেন্দ্রিক সমঝোতা-

প্রক্রিয়ায় কিসিঞ্জার, স্যান্ডার্স ও গ্রিফিন আসলে কী ভূমিকা রেখেছিলেন? সৈয়দ ফারুক রহমান বা আবদুর রশিদের সঙ্গে মোশতাক, চাষী ও ঠাকুরের যোগাযোগ কোথায় কীভাবে ঘটেছিল? কলকাতায় কি তাঁদের যোগাযোগ ঘটেছিল? কথিত মতে সিআইএর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের সূচনাই বা কখন কোথায় কীভাবে ঘটেছিল? জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ফারুক, রশিদ ও মোশতাকের যোগাযোগের পর্বটি, বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে কে কখন কীভাবে মার্কিন দূতাবাস বা তাদের কোনো এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছিলেন, সেটা বিস্তারিত জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাছে অবশ্য এটাই একমাত্র মার্কিন দলিল, যেখানে ১৯৭৩ সালেই আমরা দেখি, ফারুক-রশিদ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন কথিত অস্ত্র ক্রয় কমিটির কথা বলে জিয়ার নামটি ব্যবহার করেছেন।

২০১১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর *ডেইলি স্টার*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লিফশুলজ দাবি করেন যে, 'রশিদ, মোশতাক ও জিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখাটা একটা ভ্রান্তি।' সে কারণেই প্রশ্ন জাগে, একাত্তরের কলকাতায় কনফেডারেশন প্রশ্নে হোক বা না হোক, মোশতাক ও রশিদের মধ্যে কোনো ধরনের যোগাযোগ ঘটেছিল কি না। আত্মীয়তার সূত্রে হলেও এই যোগাযোগের সম্ভাবনা নাকচ করা কঠিন।

ফারুক-রশিদ ব্রিটেনের *সানডে টাইমস*-এর পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সাংবাদিক নেভিল অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তাঁদের আলাপ-আলোচনার তথ্য প্রকাশ করেন, যা ১৯৭৬ সালে লন্ডনের বাণিজ্যিক টিভি আইটিভিতে সম্প্রচার করা হয়েছিল। এরপর ১৯৮৬ সালের মার্চে প্রকাশিত *অ্যা লিগ্যাসি অব ব্লাড* বইয়েও ম্যাসকারেনহাস তা উল্লেখ করেন।

১৯৯৭ সালে ইউরোপের একটি শহরে আবদুর রশিদ লরেন্স লিফশুলজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন। লিফশুলজ *ডেইলি স্টার*কে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে বলেন, 'এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত প্রকাশ করবেন।' তবে এখনো তিনি তা করেননি। মোশতাক ও জিয়াও কি আমেরিকান ও পাকিস্তানি যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন, এই প্রশ্নের জবাবে লিফশুলজ বলেন, 'আমি রশিদের কাছে জানতে চাইলাম, অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য অবস্থান নিয়ে চিন্তিত ছিলেন কি না? এর উত্তরে রশিদ তাঁকে বলেন, বিষয়টি নিয়ে জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। জিয়া তাঁকে বলেছিলেন, মার্কিনরা দৃশ্যপটে

ভালোভাবেই যুক্ত রয়েছে এবং সেদিক থেকে তিনি যেন কোনো চিন্তা না করেন। লিফশুলজের বর্ণনায় :

> আমি জানতে চাইলাম যে অভ্যুত্থানের আগে মার্কিন কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে জিয়ার কথা হয়েছিল বলে তিনি কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিলেন কি না? জিয়া কিসের ভিত্তিতে মার্কিন তরফের নিশ্চয়তা তাঁকে দিয়েছিলেন? উত্তরে রশিদ বলেন, তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, মার্কিনদের সঙ্গে জিয়ার সরাসরি যোগাযোগ ঘটেছিল। কিন্তু রশিদ সেই মার্কিনের নাম জানতে পারেননি। আমি জানি না, হয়তো রশিদ নামটি জেনে থাকলেও জিয়ার সেই ব্যক্তির নাম আমার কাছে প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন না। আবার হতে পারে জিয়াও এতটা সচেতন ছিলেন যে তিনি তাঁর মার্কিন যোগসূত্রের নাম রশিদের কাছে প্রকাশ করেননি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফারুক ১৯৭৪ সালের মে মাসে গ্রেশামের বাসায় মুজিবের সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা প্রকাশ এবং সে বিষয়ে 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে' সম্ভাব্য মার্কিন মনোভাব বুঝতে গিয়েছিলেন।

কোটি টাকা দামের প্রশ্ন হলো, সেই 'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা'টি কে?

১৯৭৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরে লিফশুলজ পঁচাত্তরের ঢাকার সিআইএ স্টেশন চিফ হিসেবে ফিলিপ চেরির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। লিফশুলজ চেরিকে প্রশ্ন করেছিলেন, '১৯৭৪ সালের হেমন্তে মুজিবকে উৎখাত করতে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেসব বৈঠক সম্পর্কে আপনি অবহিত ছিলেন কি না? কিংবা আপনি এতে আদৌ অংশ নিয়েছেন কি না?' চেরির উত্তর : 'না। আমি জানি না। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরের আগে আমি সেখানে যাইনি। আমি তখন একজন পলিটিক্যাল অফিসার। আমাদের অফিসে কোনো বাংলাদেশি অভ্যুত্থান-পরিকল্পনা বা এরকম কোনো বিষয়ে কথা বলতে আসেননি।'

এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে যে চেরি পঁচাত্তরের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে আসেননি, তাহলে দেখা যাচ্ছে, চেরির পূর্বসূরি সিআইএ স্টেশন চিফের আমলেই ফারুক তাঁর অভ্যুত্থান-পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। এ তথ্য পরে গিয়েও চেরির জানার কথা।

চেরির কাছে এরপর লিফশুলজের প্রশ্ন ছিল :

> মাহবুব আলম চাষী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, এ বি এস সফদার, এঁদের কাউকে কি আপনি চেনেন? এঁদের সঙ্গে কি কখনো আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছে?' চেরির উত্তর, 'আমি এদের কয়েক জনের নাম জানি কিন্তু এঁদের কারও সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি।'

আমাদের সংগৃহীত মার্কিন দলিল থেকেই দেখা যাচ্ছে, মার্কিন দূতাবাস কিছুই জানত না মর্মে ফিলিপ চেরির বক্তব্য অসত্য। এমনকি স্টিফেন আইজেনব্রাউনের বক্তব্যের সঙ্গেও তা বিরোধ সৃষ্টি করেছে। আর সেটা মুজিবকে সতর্ক করা নিয়ে। চেরি বলেছেন, 'অভ্যুত্থান যে ঘটতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো ইঙ্গিত ছিল না।'

আমরা যদি ধরে নিই যে, চেরি *ঠিক* ১৫ আগস্টের রাতের অভ্যুত্থানের কথাই বুঝিয়েছেন, এর আগাম কোনো পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কথাটা বলেননি, তাহলে এর গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে। কিন্তু চেরি এর পরের বাক্যেই বলেছেন :

> আমাদের কাছে এ বিষয়ে আদৌ কোনো তথ্য ছিল না। অন্তত আমি যতটা জানি, একটা অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে তা আমার জানা ছিল না। এ বিষয়ে আগাম কোনো সতর্কতাই আমাদের কাছে ছিল না।

চেরির কথা সত্য হলে আইজেনব্রাউনের দাবি দুর্বল হয়। অন্তত দুজনই অভ্রান্ত হতে পারেন না। লিফশুলজের প্রশ্নের ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট যে, তাঁর বিশ্বাস, ১৯৭১ সালের কলকাতায় মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের সরাসরি একটি যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এবং ১৯৭৪ সালের হেমন্তে এসে তা-ই আবার নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হয়। এবং তাঁরাই একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে তার ব্যাপারে সম্ভাব্য মার্কিন মনোভাব কী হবে তা জানতে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

লিফশুলজের এই বক্তব্যকে চেরি পুরোপুরি বানোয়াট বলে নাকচ করেছেন। অথচ সাধারণ বুদ্ধি নির্দেশ করে যে, এ বিষয়ে স্বচ্ছতা থাকলে লিফশুলজকে ১৯৭৪ সালের মে মাসের প্রসঙ্গটি চেরি বলতে পারতেন। বিষয়টিকে আগে গুরুত্ব না দিলেও ফারুকই যখন অভ্যুত্থানের নায়ক হলেন, তখন চেরির ওই তথ্য না জানার কথা নয়। তাঁর দাবি অনুযায়ী তিনি সিআইএ স্টেশন চিফ না হয়ে যদি পলিটিক্যাল অফিসারও হন, তাহলেও তাঁর ওই তথ্য জানা থাকার কথা। উপরন্তু স্টিফেন আইজেনব্রাউন রাষ্ট্রদূত বোস্টারের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে সতর্ক করে দেওয়াসংক্রান্ত যে তথ্য দিয়েছেন, তা-ও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। লক্ষণীয় যে বোস্টার ও চেরি উভয়েই মুজিবকে সতর্ককরণ-বিষয়ক তথ্য প্রদানে লিফশুলজকে এড়িয়ে গেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

লিফশুলজের বইয়ের ১৮১ পৃষ্ঠায় চেরির বক্তব্য :

> ভারতের কমিউনিস্ট পত্রিকা *ব্লিৎজ* এবং কলকাতার কতিপয় পত্রিকায়

> বাংলাদেশ অভ্যুত্থানে জড়িত করে আমার নাম ছাপা হয়েছিল এবং সেটা অবশ্যই একটা রসিকতা। আমরা কেন অভ্যুত্থানে জড়িত হব? আমরা তো মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে সাহায্য দিয়েই চলছিলাম।

তবে লক্ষণীয় যে লিফশুলজ সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় যখন চেরিকে বলছিলেন যে মুজিব গভীর রাজনৈতিক সংকটে ছিলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিল, এবং এটা স্পষ্ট ছিল যে, একটা কিছু ঘটতে চলেছে, তখন লিফশুলজের সঙ্গে চেরি ত্বরিত একমত হন। চেরি বলেন:

> আমরা জানতাম, মুজিব সমস্যার মধ্যে আছেন। আমরা এটাও জানতাম যে বাংলাদেশে যা-ই ঘটুক না কেন, যে-ই মুজিবকে উৎখাত করুক বা যেভাবেই তাঁকে উৎখাত করা হোক, আমাদেরই দোষারোপ করা হবে। মার্কিন দূতাবাসকে অভিযুক্ত করা হবে। কারণ, মুজিব মিসেস গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিলেন এবং বাংলাদেশে বিপুল সোভিয়েত প্রভাব ছিল। তাই সুপারক্লিন থাকতে আমরা অতিরিক্ত সতর্ক ছিলাম। আমরা সবাই রাষ্ট্রদূত বোস্টারের নির্দেশনা মেনে চলছিলাম। কিছু ঘটলে তার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র বের করে, যাতে কেউ তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে না পারে। সে জন্য আমরা সব ধরনের সম্ভাব্য যোগাযোগ থেকে দূরে ছিলাম। আমরা আসলে রাষ্ট্রদূত বোস্টারের নির্দেশনা মেনে চলছিলাম।

এরপর চেরির কাছে লিফশুলজ যে প্রশ্ন রাখেন, তা থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে লিফশুলজের অনুসন্ধান ও তাঁর লেখালেখিসংক্রান্ত সবকিছুর মূলে রয়েছে রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার, যাঁর নামটি তিনি ২০০৫ সালে বোস্টারের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। চেরির কাছে লিফশুলজের প্রশ্ন ছিল:

> তাহলে একজন উচ্চপর্যায়ের দূতাবাস-কর্মকর্তা কেন আমাকে বলেছেন যে, চার বা পাঁচ মাস ধরে বৈঠক হয়েছিল? তারা মার্কিন মনোভাব জানতে সচেষ্ট ছিল। এবং মার্কিন দূতাবাস ডিসেম্বর/জানুয়ারিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ওয়াশিংটনে চার্চ কমিটির শুনানি চূড়ান্ত পর্যায়ে চলাকালে ওই সব লোকের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন থাকবে। কেন একজন উচ্চপর্যায়ের দূতাবাস-কর্মকর্তা আমাকে এসব বিষয় বলেছিলেন?

চেরির উত্তর ছিল, 'আমি জানি না, কেন।' লিফশুলজ তখন অভিযোগ করেন, 'আপনি এবং স্টেশন [দপ্তর অর্থে] অভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত ওই সব লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন...' চেরির উত্তর: 'এ সবই সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি জানি না, কেন এই অভিযোগ। সেখানে হয়তো এমন কেউ ছিল, কারও বিরুদ্ধে তাঁর রাগ ছিল এবং তাই এরকম বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু

আমি আশা করি, আমি একদিন তাঁর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাব এবং আপনার উপস্থিতিতেই তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব।' লিফশুলজ যদি কেবল বোস্টারের দিকেই ইঙ্গিত করেন, তাহলে বলতে হবে, বোস্টারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এর যবনিকাপাত ঘটেছে।

চিলির নেতা সালভাদর আয়েন্দে সম্পর্কে সিআইএ পরিষ্কার বলেছে যে, হোয়াইট হাউস এবং আন্তসংস্থা নীতি সমন্বয়ক কমিটিগুলোর নির্দেশনার ভিত্তিতে তারা সেখানে নানামুখী গোপন মিশন বাস্তবায়ন করেছে। এখন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাদের এরকম কোনো প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা চালানোর সম্ভাবনা কতটা ছিল, সেই প্রশ্ন বিবেচ্য। চিলির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নিক্সনসহ গোটা প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবেই জড়িত ছিল বলা যায়। অন্য দিকে লিফশুলজ ও রজার মরিস উভয়ে একমত যে পঁচাত্তরের বাংলাদেশে মার্কিন স্বার্থ প্রান্তিক পর্যায়ে ছিল। লিফশুলজের এক প্রশ্নের উত্তরে রজার মরিস বলেছিলেন :

> যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের বিষয় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বেশি নীরবে, অনেক বেশি সহজে [কিসিঞ্জারের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে অভ্যুত্থানে মদদ দান] করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি মন্তব্য যুক্ত করতে চাই। আপনি যদি ১৯৭৩ সালের বসন্ত থেকে সংঘটিত ঘটনাবলি লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন, কিসিঞ্জার ক্রমাগতভাবে, নিক্সনের সঙ্গে বরাবর তিনি যে ধরনের 'এড রেফারেন্ডাম'-এর ভিত্তিতে কাজ করতেন, তা পরিহার করে চলছিলেন এবং খোদাই জানেন, কিসিঞ্জার হয়তো বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী একক কর্মকর্তা ছিলেন।

মরিসের ইঙ্গিত থেকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে কিছু ঘটিয়ে থাকলে নিক্সনকে না জানিয়েও কিসিঞ্জার তা করে থাকতে পারেন, ব্যক্তিগত চ্যানেলে যেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব। সিআইএ বা যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন অভ্যুত্থানকারীদের প্রতি লিফশুলজের বর্ণিত সবুজ সংকেত বহু উপায়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। বাংলাদেশে সেটা তারা দিয়ে থাকলে কী উপায়ে দিয়েছিল কিংবা অভ্যুত্থানকারীদের কাছে কীভাবে তা পৌঁছেছিল, সেটা অধিকতর অনুসন্ধানের বিষয়। রজার মরিসের দাবি অনুযায়ী মুজিব ঠিক কখন কিসিঞ্জারের সবচেয়ে ঘৃণিত লোকে পরিণত হলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফল সম্পর্কে কিসিঞ্জারের মনোভাব কী ছিল, এসব প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। প্যারিসে হেনরি কিসিঞ্জার শেখ হাসিনাকে বলেছেন, ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হেরে যাবে। কিন্তু শুধু এটুকু জানা যথেষ্ট নয়।

মুজিব হত্যারহস্য উন্মোচনে চিলির ঘটনা বরাবর আলোচিত। আয়েন্দেকে ঠেকাতে সিআইএ কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে থেকেই ভূমিকা রেখেছে। তারা স্বীকার করেছে যে, আয়েন্দে-বিরোধী তিনটি আলাদা গ্রুপকে তারা একই সঙ্গে মদদ দিয়েছে। তিনটি গ্রুপ একমত হয়েছিল, যেকোনো অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য সাবেক সেনাপ্রধান রেনে শ্নাইডারকে অপহরণ করতে হবে। কারণ, তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, সংবিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর কাজই হচ্ছে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা গ্রহণে সহায়তা করা।

চিলির ক্ষেত্রে সিআইএ এখন নিজেরাই যা বলছে সেখান থেকে আমরা তাদের সেকালের গোপন কাজ সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি। জেনারেল রেনে শ্নাইডারকে অপহরণের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত গ্রুপগুলোর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সিআইএ একমত হয়েছিল। সিআইএ তার ওয়েবসাইটে বলেছে, যদিও গ্রুপগুলোর একটিকে তারা অস্ত্র দিয়েছিল কিন্তু আমরা এমন কোনো তথ্য পাইনি যাতে প্রমাণিত হয়, অভ্যুত্থানকারীদের কিংবা সিআইএর উদ্দেশ্যের মধ্যে জেনারেলকে হত্যা করার বিষয়টি ছিল। অভ্যুত্থানকারীদের একটি গ্রুপের সঙ্গে সিআইএ সম্পর্ক ছিন্ন করে এই যুক্তিতে যে তাদের মধ্যে তারা চরমপন্থী প্রবণতা দেখতে পেয়েছিল। দ্বিতীয় গ্রুপটিকে সিআইএ কাঁদানে গ্যাস, সাব মেশিনগান এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করে। তৃতীয় গ্রুপটি শ্নাইডারকে অপহরণের চেষ্টা চালায় এবং তাতে তিনি আহত হন। একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে সিআইএ ইতিপূর্বে তাদের উৎসাহিত করলেও ওই হামলার চার দিন আগে তারা তাদের সমর্থন তুলে নেয়। কারণ, সিআইএ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে এই গ্রুপ সফলভাবে অভিযান চালাতে পারবে না।

উল্লেখ্য, সিআইএ আয়েন্দে হত্যাকাণ্ডের ৩৪ বছর পর ২০০৭ সালের ২৪ এপ্রিল তাদের সরকারি ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রকাশ করেছে। আমরা লক্ষ করি, মুজিবের মার্কিন বিরোধিতা কিংবা মার্কিনিদের ব্যক্তি-মুজিব-বিরোধিতার তেমন কোনো ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পরম্পরা খুঁজে পাওয়া যায় না। আয়েন্দের মতো মতাদর্শগত বিরোধের ক্ষেত্রও এখানে অনুপস্থিত।

'আমি মার্ক্সবাদী নই,' পঁচাত্তরের ২৪ মার্চ শেখ মুজিব নির্দিষ্টভাবে জানিয়েছিলেন ঢাকার মার্কিন চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স আরভিং চেসলকে। চেসল লিখেছেন (কনফিডেনশিয়াল ঢাকা১৪৮৫) :

> আজ প্রেসিডেন্ট মুজিবের সঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা হয়। আমি তাঁকে আসন্ন স্বাধীনতা দিবসের ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে

প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, বিদেশনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক পর্যালোচনা ভাষণে উল্লেখিত হবে। বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের আগে ঘোষণা করা যাচ্ছে না। কারণ, তাঁকে জটিলতার কবলে পড়তে হচ্ছে। 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ' সম্পর্কে অধিকতর সমালোচনামুখর হওয়ার জন্য তাঁর কাছে কিছু মহল দেনদরবার করে চলেছে। এটা অনুমেয় যে তিনি সিপিবি এবং ন্যাপ মোজাফ্‌ফরের দিকে ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, তিনি সকল প্রকারের সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। তাই বলে কোনো দেশ, বিশেষ করে কোনো বন্ধুদেশ, সেটা আবার যুক্তরাষ্ট্রের মতো মহানুভব দেশ হলে, তার দিকে তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করবেন না। মুজিব বলেছেন, তিনি মার্ক্সবাদী নন। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র, যে দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ নেই তার পক্ষে, একটি দীর্ঘ মেয়াদে অর্জনের বিষয়। এবং বাংলাদেশের মতো একটি গরিব রাষ্ট্রের জন্য যতটা সম্ভব সবার সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। সরকারি দলের অভ্যন্তরের সাম্প্রতিক আলাপ-আলোচনায় বিষয়টি যথেষ্ট বিতর্কের সূচনা ঘটালেও তিনি তাঁর ওই মনোভাব বদলাবেন না। মুজিব আরও বলেন যে তিনি একের পর এক মার্ক্সবাদী নকশালিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং গ্রাম এলাকাকে শিগগিরই তিনি এদের কবলমুক্ত করবেন। তিনি বলেন, তাঁর মুখ্য সমস্যা অর্থনৈতিক, বিশেষ করে পাট, রাজনৈতিক নয়। তিনি অধীর আগ্রহে মার্কিন পাটের বাজার উন্মুক্ত করার দিকে তাকিয়ে আছেন। কারণ, বিভিন্ন সমস্যার কারণে ইতিমধ্যেই তাঁকে ৩০টি পাটকল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তিনি আবারও খাদ্যসহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সম্ভাব্য অতিরিক্ত খাদ্যশস্য পেতে তাঁর আগ্রহেরও ইঙ্গিত দেন।

চেসল তাঁর ওই বার্তায় মন্তব্য করেন যে মুজিব যেসব সমস্যার কথা বলেছেন, তা আমাদের শোনা গুজবেরই প্রতিধ্বনি করছে।

আমাদের অনুসন্ধানে সিআইএর ১৯৭৬-পূর্ব বাংলাদেশ-বিষয়ক কিছু দলিল হস্তগত হয়েছে। এগুলো অবশ্য বিশ্লেষণধর্মী সাধারণ আঞ্চলিক প্রতিবেদন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এত দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি ওই সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের একেবারেই জানার বাইরে ছিল, সেখানে এবারে তার কিছুটা পাঠকদের সামনে আনা সম্ভব হলো। যদিও এটা ঠিক যে আমাদের হস্তগত হওয়া প্রায় প্রতিটি দলিল পড়ে দেখা গেছে যে, প্রায় কোনো প্রতিবেদনেরই সব বক্তব্য প্রকাশ পায়নি। স্পর্শকাতর অনেক কিছুই তারা গোপন রেখে দিয়েছে। এসব প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং আরও দলিলপত্র

ও তথ্য জানা সম্ভব হলে হয়তো ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে সিআইএর দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পরিষ্কার হবে। অবশ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ ও ১৬ আগস্টের দুটি প্রতিবেদনে সিআইএ ঘটনার যে রকম বিবরণ দিয়েছে, তাতে কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, চিলি ও আয়েন্দের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটেছে এবং যত নথিপত্র এখন প্রকাশ পাচ্ছে, তেমন ধরনের কিছু ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ১৫ আগস্টের ঘটনার বিষয়ে প্রকাশ পাবে কি না। ১৯৭৫ সালের মার্চে ওয়াশিংটনে প্রস্তুত হওয়া একটি নথির শিরোনাম 'সিআইএ এবং বাংলাদেশে একটি সম্ভাব্য অভ্যুত্থান'। কিন্তু এর বিষয়বস্তু আমরা জানতে পারিনি।

আমরা মনে রাখব যে লিফশুলজ এ পর্যন্ত মুজিবের সরকার পরিবর্তনে হেনরি কিসিঞ্জারের একটি অদৃশ্য 'নড' বা সম্মতি ছিল বলে দাবি করেছেন। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে এর সমর্থনে কোনো নথিপত্র মেলেনি।

আগেই বলা হয়েছে, সিআইএর ওই সময়ের নথিপত্র সংগ্রহে আমাদের পক্ষ থেকে যেসব মার্কিন অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও পেশাদার আর্কাইভিস্টের সহায়তা নেওয়া হয়, জেরিমি বিগউড তাঁদের অন্যতম। ২০১২ সালের ৭ মে এক পত্রে তিনি আমাদের বলেন, 'আমি কেবল ওই সময়ের সিআইএর বিশ্লেষণধর্মী নথি ও তাদের টীকাভাষ্য-সংবলিত সংবাদপত্রের ক্লিপিংই দেখতে পারি। কখনো কখনো এসব আর্টিকেলের মার্জিনে লেখা মন্তব্য খুবই 'রিভিলিং'। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নথির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। তাঁর কথায়, 'সিআইএর অপারেশনস পরিদপ্তরের (ডিও) অপারেশনগত নথিপত্র দেখার অধিকার আমার নেই। এ ধরনের ঘটনা যাঁরা ঘটিয়ে থাকেন, তাঁদের দায়দায়িত্ব ওই পরিদপ্তরের কাছেই ন্যস্ত।'

মি. বিগউডের সঙ্গে ২০১২ সালের নভেম্বরে ম্যারিল্যান্ডে বর্তমান লেখকের সাক্ষাৎ ঘটে। সিআইএর আর্কাইভে তিনিই আমাকে নিয়ে যান। তখনো তিনি একই কথা বলেন। পেশাদার ঐতিহাসিক গবেষক সিম স্মাইলি সিআইএর সাবেক পরিচালক উইলিয়াম জে কেসির 'দ্য সিক্রেট ওয়ার অ্যাগেইনস্ট হিটলার' (১৯৮৮) শীর্ষক স্মৃতিকথা এবং সত্তরের দশকে ইতালিতে সিআইএর ভূমিকা এবং নিক্সন-কিসিঞ্জারের নীতিবিষয়ক প্রকল্পে কাজ করেছেন। ন্যাশনাল আর্কাইভে মিজ স্মাইলিকে আমি বলি যে, এখানে রক্ষিত সিআইএর মহাফেজখানায় বাংলাদেশ-সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র মিলেছে। মিজ স্মাইলি তখন স্মিত হেসে বলেন, 'এখান থেকে কেউ কোনো দিন কৌতূহলোদ্দীপক কিছু পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই।' তা সত্ত্বেও সিআইএর বাংলাদেশ-ভাবনা সম্পর্কে আমাদের যখন নির্দিষ্টভাবে কিছুই জানা

নেই, তখন প্রাপ্ত বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনগুলো আমরা কোনো মন্তব্য ছাড়াই এই বইয়ে সন্নিবেশিত করেছি।

কিসিঞ্জারের সাবেক সহকারী রজার মরিস এবং লরেন্স লিফশুলজ এ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে মুজিব সরকার উৎখাতে সিআইএ এবং কিসিঞ্জারের সম্পৃক্ততার বিষয়ে একটা যৌক্তিক ও সাধারণভাবে বিশ্বাসযোগ্য ধারণা বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থিত করেছেন। তবে তাঁদের দাবি এখনো নির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক বলা যায় না।

ইতিমধ্যে চিলির অভ্যুত্থান বিষয়ে সিআইএর অবমুক্ত করা সরকারি নথিপত্র এবং বিশ্বের দেশে দেশে সিআইএর ব্যাপকভিত্তিক তৎপরতা সন্দেহটাকে আরও জোরালো ভিত্তি দিয়েছে। যা অবশ্যই আমাদের জানার প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চিলির ক্ষেত্রে নিক্সন-কিসিঞ্জার সিআইএর কর্মকর্তাদের সঙ্গে যেভাবে বৈঠক করেছেন, ৪০ কমিটিতে নানাভাবে অনুমোদন দিয়েছেন, যার নথিপত্রও এখন পাওয়া যাচ্ছে, তেমন কোনো প্রমাণ বা নথিপত্র বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের ব্যাপারে ভবিষ্যতে কখনো মিলবে কি না। আমাদের অনুমাননির্ভর প্রাথমিক উত্তর নেতিবাচক। বোস্টারের বরাত দিয়ে লিফশুলজ যা দাবি করেছেন, তাকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বা স্বতঃসিদ্ধ যেমন বলা যায় না, তেমনি তাকে অগ্রাহ্যও করা চলে না।

বাংলাদেশের ১৯৭৫ সালের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে হেনরি কিসিঞ্জারের একক সংশ্লিষ্টতার সম্ভাবনার দিকটি মরিস ও লিফশুলজ উভয়ে মনে রেখেছেন। সে কারণেই তাঁদের বক্তব্য থেকে আমাদের মনে হয় যে, কিসিঞ্জার নিক্সনকে না জানিয়ে বাংলাদেশে ব্যক্তিগতভাবে এই পদক্ষেপে উদ্যোগী হতে পারেন। এবং এ বিষয়ে সরকারি বা আনুষ্ঠানিক কোনো প্রক্রিয়াই হয়তো অনুসরণ করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে মুজিবের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্কের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটিকেও বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরি। এখন পর্যন্ত যতটা জানা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, মুজিব আগাগোড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তত একটা সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চেয়েছেন। ১৯৭১ সালের আগে বা পরে এমন কোনো পর্ব এখনো দেখা যায়নি, যা থেকে মার্কিন কনসাল জেনারেল বা রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একেবারেই তলানিতে ঠেকেছিল বলা যায়।

এটাও সত্য, সিআইএর অনেক অপকীর্তি বহু পরে উদ্‌ঘাটিত বা বিশ্ববাসীর পক্ষে তাদের প্রকৃত কীর্তিকলাপ জানা সম্ভব হয়েছে। অনেক কিছুই আবার থেকে গেছে অন্ধকারে। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় তারা কিন্তু মোটেও নবাগত নয়। সত্তরের দশকে এই অঞ্চল সিআইএ-কেজিবির

লীলাক্ষেত্র ছিল। ১৯৪৭ সালের পর থেকে সিআইএ উপমহাদেশে আঠার মতো লেগে আছে বলেই ইঙ্গিত মেলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার আগ পর্যন্ত কমিউনিজম ও লাল চীন আতঙ্ক মার্কিনদের নিরন্তর তাড়া করেছে। পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ—আমাদের সব পর্বের রাজনীতিতেও তাদের ভূমিকা নানাভাবে আলোচিত। মার্কিন সাংবাদিক সেইমুর হার্শের দাবিমতে, একাত্তরে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভা পর্যন্ত সিআইএর হাত প্রসারিত হয়েছিল।

একটি উদাহরণ দিই। ১৯৬৯ সালের শেষে মওলানা ভাসানী একটি তথ্য প্রকাশ করে আলোড়ন তুললেন। তিনি বললেন, তাঁর কাছে সিআইএর একটি দলিল আছে। এতে দেখা যাচ্ছে, সিআইএ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে মদদ দিচ্ছে। ২০ নভেম্বর ১৯৬৯ *পাকিস্তান অবজারভার* লিখেছে, মওলানা কেন সিআইএর কথিত নথি কেবল প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়েছেন। জনগণের সামনে তা প্রকাশ করা হোক। এর সত্যতা সম্পর্কে *পাকিস্তান অবজারভার* সংশয় প্রকাশ করে। ২০ ও ২৩ নভেম্বরের *ইত্তেফাক* একইভাবে দলিলের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং বলে :

> পূর্ব পাকিস্তানের দাবি না মানলে তিনি নিজেই তো আলাদা হওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। অনেকের সন্দেহ, ওই দলিলের খসড়া ভাসানীর শয়নকক্ষে প্রস্তুত হয়েছিল। আইয়ুবের আগরতলা ষড়যন্ত্রের মতো ভাসানীও বিচ্ছিন্নতাবাদের ধুয়া তুলছেন। ভাসানীর সঙ্গে নিশ্চয় সিআইএর সম্পর্ক আছে।

১৯৬৯ সালের ১০ ডিসেম্বর মার্কিন কনসাল স্কোয়ারস এই ঘটনার বিবরণ পাঠান ওয়াশিংটনে। কিন্তু তাতে দেখা যায়, হাতে লেখা আট পৃষ্ঠার একটি কথিত সিআইএর দলিল মার্কিন মিশন জোগাড় করেছে। কনসাল লিখেছেন, ভাসানীর অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষক শিল্পপতি সদরি ইস্পাহানির কাছ থেকে একটি কপি মিলেছে। এতে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের কেন স্বাধীনতা দরকার তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরকম আরও অনেক তথ্য আছে।

আমাদের অনুসন্ধানের নতুন একটি দিক হচ্ছে, ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের জবানিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবি গ্রুপের দ্বারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রকে অবহিত করার বিষয়টি। তোফায়েল আহমেদ আমাদের বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে নিয়োজিত দুই আততায়ীর মধ্যে একজনের পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশসংক্রান্ত কোনো তথ্যই অন্তত তাঁর জানা নেই। বঙ্গবন্ধুকেও বিষয়টি

নিয়ে তিনি কখনো কারও কাছে কিছু বলতে শুনেছেন বলে তাঁর মনে পড়ে না। ড. কামাল হোসেনও আমাদের বলেছেন, এ বিষয়ে তাঁরও কিছু জানা নেই। তবে পাকিস্তান আমলে মুজিব হত্যাচেষ্টার ঘটনাগুলো আমরা আরও যাচাই করে দেখব।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে যা জানা জরুরি বলে প্রতীয়মান হয় তা হলো, ১৯৭২-৭৩ সালে সৈয়দ ফারুক রহমানের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে অস্ত্র সংগ্রহ করতে যাওয়ার বিষয়সংক্রান্ত মার্কিন দলিলগুলোর পূর্ণ বিবরণ। জানা দরকার, মুক্তিযুদ্ধে ফারুক-রশিদের অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট কী ছিল? লিফশুলজ দাবি করেছেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে 'মোশতাক গ্রুপের' কতিপয় লোক মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে 'বৈঠক' করেছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তিদের মধ্যে কারও নাম এ পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়নি। লিফশুলজও বিষয়টি প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না। স্টিফেন আইজেনব্রাউন নির্দিষ্ট করেছেন যে, মুজিবকে সতর্ক করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের জুন-জুলাইয়ে। আইজেনব্রাউন একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এভাবে সময়টা নির্দিষ্ট করলেও অবমুক্ত হওয়া কোনো দলিল দ্বারা তা এখনো সমর্থিত হয়নি। এটা অনুমেয় যে, আইজেনব্রাউনের বর্ণনা অনুযায়ী বোস্টার যদি মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তার বিবরণসংবলিত একটি তারবার্তাও পাওয়া যাওয়ার কথা। আবার সে তথ্য বোস্টার কেন লিফশুলজকে দেননি, সেই প্রশ্নও ওঠে। সোলার্জের চিঠিপত্র থেকেই মুজিব সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার বিষয়ে লিফশুলজ জানতে পারেন। তা-ও খুব অস্পষ্টভাবে। এর পরই লিফশুলজ প্রশ্ন তোলেন যে মার্কিন সরকার তাহলে কাকে সতর্ক করেছিল?

আগেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে কিসিঞ্জার নিজেই প্রশ্ন রাখছেন, 'আমরা কি মুজিবকে নির্দিষ্টভাবে জানাইনি কারা এটা করতে পারে?' কর্মকর্তারা তাঁকে বলেছেন, 'পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' সুতরাং এই পরীক্ষা এবং তার ফলাফল সম্পর্কে জানার সুযোগ আমাদের সামনে আছে।

মুজিব হত্যায় শুধু মার্কিন-সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিই নয়, একে বৈদেশিক সম্পৃক্ততার ব্যাপকভিত্তিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। এ বিষয়ে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাবকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। এবং সেই কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের আদালত সাধারণভাবে এ পর্যন্ত একটি

নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়েছে মাত্র। লরেন্স লিফশুলজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরকে সামনে রেখে ২০০০ সালের ১৫ মার্চ *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে লেখেন, 'দুই পক্ষের অতীতের রেকর্ড পরিষ্কার হয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারবে।' আমরাও মনে করি, যেসব দলিলপত্র ইতিমধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে এবং যা এখনো গোপন রাখা হয়েছে এবং যার মধ্যকার কিছু বিষয়বস্তু অভ্যুত্থান-সম্পর্কিত বলেও প্রমাণ মিলছে, তাতে পুরো বিষয়টি আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নিরিখেও আনুষ্ঠানিকভাবে খতিয়ে দেখার দাবি রাখে।

আমরা মনে করি, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন শুধু সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই জরুরি নয়, একটি জাতির বিনির্মাণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গেও এর একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান-রহস্য উদ্‌ঘাটনে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সদুত্তর না পাওয়ার ফলে ভারত সরকার এ পর্যন্ত তিনটি কমিশন গঠন করেছে। এর প্রত্যেকটির তদন্ত রিপোর্ট অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে একটি নিতান্ত ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে একটি বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে মাত্র। ঘটনার রাজনৈতিক ও বৈদেশিক সম্পৃক্ততার দিকটি বিস্তারিত ও নির্দিষ্টভাবে খতিয়ে দেখতে নাগরিক সমাজের অনাগ্রহ ও নিশ্চেষ্টতাও দুর্বোধ্য।

লিফশুলজ যে পর্যন্ত এগিয়েছেন এবং তারপর আমাদের চলতি অনুসন্ধান বিবেচনায় নিলে, তদন্ত কমিশনের অগ্রসর হওয়ার সুযোগ খোলা পড়ে আছে। স্টিফেন সোলার্জ কেন মাঝপথে শীতল মনোভাব দেখালেন, তা-ও রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে জানতে হবে। প্রশ্নটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যে সোলার্জ কেন সই না করে লেস এসপিনের (ক্লিনটনের আমলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী) কাছে চিঠি লিখলেন? লিফশুলজের দাবি অনুযায়ী স্টিফেন সোলার্জ কি সত্যিই মুজিব হত্যার তদন্ত চাননি? সোলার্জ যে উপমহাদেশের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন তা আমরা বেনজির ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থেকেও প্রমাণ পাই।

১৫ আগস্টের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে সম্ভাব্য বিদেশি ইন্ধনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের পুরো বিষয়টি এখনো পর্যন্ত আসলে একজন লরেন্স লিফশুলজের ব্যক্তিগত গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এমনকি লিফশুলজ যা উদ্‌ঘাটন করেছেন, যা দাবি করেছেন তা খতিয়ে দেখাও

মুজিবের নেতৃত্বে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তব্য। সোলার্জ লিফশুলজকে লিখেছিলেন, 'মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দাবি যে, অভ্যুত্থানের আশঙ্কাসহ সেসব বৈঠকের ব্যাপারে (মুজিবুর) রহমানকে জানানো হয়েছিল।' বাংলাদেশ যদি কোনো কমিশন গঠন করে তাহলে তারাও বিষয়টি জানতে চাইতে পারে এবং তখন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তা প্রকাশ করতে পারে। কমিশনের শুনানিতে লিফশুলজ একজন সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিতে পারেন।

লিফশুলজ সোলার্জকে বলেছিলেন :

> আমাদের সূত্রগুলো যা বলেছে তার সঙ্গে ওই দাবি কোনোমতেই মেলে না। এ ব্যাপারে আরও গভীরভাবে তদন্ত চালানোর জন্য আমি আপনার কাছে আরজি জানাচ্ছি। আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমি বহু লোকের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করি এবং দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত। আপনাকে এ ব্যাপারে হয় কৌশলে বিপথে চালিত করা হয়েছে অথবা চিঠির ভাষায় কথার মারপ্যাঁচে মূল বিষয়টিকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়েছে। মূল প্রশ্ন হলো, অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে মুজিব সরকারের কাকে জানানো হয়েছিল? মুজিবুর রহমানকে কি এসব বৈঠকের কথা সরাসরি জানানো হয়েছিল? কে জানিয়েছিল? কোন পরিস্থিতিতে জানিয়েছিল? আর মুজিব সরকার এই অভ্যুত্থানের ব্যাপারে যদি ভালোভাবে ওয়াকিবহালই থাকবে তাহলে মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের এত সহজে হত্যা করা এবং এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া কি আশ্চর্যের নয়?
>
> পররাষ্ট্র দপ্তরের জবাবের অর্থ কি এই যে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের আশঙ্কা সম্পর্কে মুজিব সরকারের কয়েকজন বিশেষ সদস্যকে জানিয়েছিল? যদি তা-ই হয়, তাহলে এর অর্থ কী দাঁড়ায়, যেখানে বস্তুতপক্ষে সরকারেরই একটি অংশ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে?

এটা খুবই লক্ষণীয় যে, মোশতাক সরকার এই অভ্যুত্থানকে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা বা আক্রোশের ফল হিসেবে বর্ণনা করেছিল। লিফশুলজ দেখান যে, মার্কিন প্রশাসনও বিষয়টিকে সেভাবেই দেখাতে চাইছে। আর আমাদের অনুসন্ধানে সিআইএর একটি দলিলেও নির্দিষ্টভাবে তা-ই দেখা যায়। সিআইএ বলেছে, 'অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা।' এ বিষয়ে যে গল্প চালু রয়েছে তা ঘটেছিল ১৯৭৪-৭৫ সালে। তাহলে ১৯৭৩ সালে রশিদ-ফারুককে জিয়াউর রহমানের কথা বলে মার্কিন দূতাবাসে দেখা গেল কেন?

লিফশুলজ লিখেছেন :

> মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলতে চেয়েছে এটা মুজিবের নিজের দল, তাঁর মন্ত্রিসভা ও তাঁর নিজস্ব জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কট্টরপন্থীদের নিজেদের কাজ। এদের সকলের আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক অতীত সম্পর্ক রয়েছে। এখন তাহলে পররাষ্ট্র দপ্তর কি এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, এ লোকজনের মধ্যেই একজনকে অভ্যুত্থানের আশঙ্কার ব্যাপারে দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল? এখানে আমার সেই পুরোনো গল্প মনে পড়ছে যে দিয়েম সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ ভাষায় 'বিপদ হতে পারে' বলে হুঁশিয়ার করেছিল, যখন অভ্যুত্থান-পরিকল্পনাকারী জেনারেলদের সদর দপ্তরেই কর্নেল ল্যান্ডসডেলের ইউনিটের একজন অফিসার ঢুকে বসে ছিলেন। যে ধরনের ঘটনাবলি সম্পর্কে আমরা দিনের পর দিন উদাসীন থাকি তার দীর্ঘ অতীত আছে।

লেস এসপিনকে লেখা চিঠিতে [এসপিনের কাছে চিঠিটি যায়নি] সোলার্জ লিখেছেন :

> যদিও আমি লিফশুলজের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত করেছি, তবু আমি যেসব উত্তর পেয়েছি তাতে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। বিশেষ করে, ১৯৭৫-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে সিআইএর যোগাযোগের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিযোগ স্বীকার বা খারিজ করে দেওয়ার মতো উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ খুঁজে পেতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি লিফশুলজের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে, এসব পরিকল্পনার কথা যুক্তরাষ্ট্রের আগে থেকেই জানা ছিল কি ছিল না—এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা কংগ্রেসের এ ব্যাপারে তলব করার ক্ষমতাপ্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়। বাংলাদেশে সিআইএর কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত চালানো স্পষ্টতই পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির চেয়েও গোয়েন্দাবিষয়ক স্থায়ী সিলেক্ট কমিটির অধিকারের মধ্যে পড়ে বলেই আমি এই আশা নিয়ে লিফশুলজের দেওয়া তথ্য আপনার কাছে পাঠালাম যে আপনি এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।

এরপর লিফশুলজই আমাদের হতাশ করেন।

উত্তর খুঁজছেন লিফশুলজ। ১৯৯৭ সালের ১৫ আগস্ট *ভোরের কাগজ*-এ তিনি লিখেছিলেন, 'সাংবাদিক হিসেবে অনুসন্ধান করার সময় আমি ১৫ আগস্টের ঘটনাবলি সম্পর্কে দুটি বিপরীতধর্মী ভাষ্য পেয়েছি। জিয়া ও মোশতাককে ঘিরে স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল দুটি পরিকল্পনা কি অগ্রসর হচ্ছিল?'

লিফশুলজের এই প্রশ্ন কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সিআইএ আয়েন্দেকে উৎখাতে একই সঙ্গে তিনটি গ্রুপকে সমর্থন দিয়ে চলছিল। ১৯৯২ সালে সৈয়দ ফারুক রহমান আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'কাজটা আমরা না করলে অন্য গ্রুপ করত। আরও কয়েকটি গ্রুপ একই লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।'

লিফশুলজ প্রশ্ন করেছেন :

> কোনো মার্কিন কর্মকর্তা কি সচেতনভাবে বা অসাবধানতাবশত অভ্যুত্থানে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন? অভ্যুত্থানের আগে যেসব বৈঠক হয়েছিল সেসব বৈঠকের আলোচিত বিষয়গুলো প্রকাশে কি মার্কিন সরকার প্রস্তুত? বৈঠকগুলোতে দুই পক্ষের কে কে অংশ নিয়েছিল? কী প্রশ্ন উঠেছিল? সেখানে কি লাল, হলুদ অথবা সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছিল? যদি অভ্যুত্থান হয় তাহলে 'আমেরিকানদের জন্য তা সমস্যার হবে না'—বৈঠকে এমন কোনো ধারণা দেওয়া হয়েছিল কি? যথাসময়ে কি সম্মতিসূচক নীরব 'মাথা নাড়ানো' হয়েছিল? রাষ্ট্রদূত বোস্টারের নির্দেশ কি উপেক্ষা করা হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, কারা করেছিল?

ডেভিস ইউজিন বোস্টার রাষ্ট্রদূত হিসেবে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আদেশ জারি করেন, তাহলে তা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে অন্ধকারে রেখে করার কথা নয়। মার্কিন দলিলপত্রের আরও অবমুক্তকরণ এবং এ বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান আমাদের জানার পরিধিকে যে আরও প্রসারিত করবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে বোস্টারের বক্তব্যকে লিফশুলজ যতটা আস্থায় নিয়েছেন, আমাদের অনুসন্ধান কিন্তু ততটা সমর্থন করেনি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

শেখ মুজিব সম্পর্কে সিডনি সোবারের সাক্ষাৎকার

মার্কিন কথ্য ইতিহাসবিদ চার্লস স্টুয়ার্ড কেনেডি ১৯৯০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সিডনি সোবারের একটি সাক্ষাৎকার নেন। এখানে অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হলো। এতে সিডনি সোবার বলেন, 'বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানিরা আমাদের প্রতি অবন্ধুসুলভ ছিল না; যদিও আমরা তাদের সাহায্য করতে পারিনি। আমরা সব ধরনের সামরিক সরবরাহ বন্ধ করেছিলাম। সব অর্থনৈতিক সাহায্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো কাজ করা সম্ভব ছিল না। সবকিছুই স্থগিত ছিল। আমরা সত্যিই পাকিস্তান সরকারকে সহায়তা দিইনি। অন্য দিকে, আমরা অবশ্যই প্রকাশ্যে তাদের কটুকাটব্যও করিনি। ইসলামাবাদে ইয়াহিয়ার শাসনাধীন পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ উন্মুক্ত আলোচনা চালিয়েছিলাম। আমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা তাঁর কাছে আবেদন রেখেছি। আমি মনে করি, আমরা কিছুটা কৃতিত্বের দাবি করতে পারি। কারণ, ইয়াহিয়া মুজিবকে প্রাণদণ্ড দেননি। যেটা পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু লোক দাবি করছিল।'

চার্লর্স স্টুয়ার্ড কেনেডি: পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন দূতাবাসের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? আপনি এ পরিস্থিতির মূল্যায়ন করুন। নির্বাচন থেকেই শুরু করা যাক।

সোবার: সেটা ছিল একটি ভালো সুষ্ঠু নির্বাচন। ১৯৪৭ সালের পর ওই নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে মুজিব ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের কথা, তখন প্রশ্নটা ছিল, ইয়াহিয়া কখন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ডাকবেন। সুতরাং, সবার কাছেই স্পষ্ট ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে মুজিব অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আর সেটাই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করল। এর কারণ

ছিল, মুজিব তথাকথিত ছয় দফার ভিত্তিতে একটি সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী মঞ্চ থেকে প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। আর সেটা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক মাত্রার স্বায়ত্তশাসন কিংবা স্বশাসন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার নামান্তর। পূর্ব পাকিস্তানে এমন লোকও ছিলেন, যাঁরা ইউডিআই বা একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে ছিলেন।

চার্লর্স স্টুয়ার্ড কেনেডি : সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানিরা সংখ্যায় কেমন ছিল?

সোবার : প্রকৃতপক্ষে কেউ ছিলেন না। কতিপয় জাতিগোষ্ঠীকে মার্শাল রেস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তাতে বাঙালির ঠাঁই ছিল না। তাদের কবি ও স্বাপ্নিক হিসেবে গণ্য করা হতো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অধিকাংশই পাঞ্জাবি ও পশতুনদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানিরা সেখানে সংখ্যায় ছিল নগণ্য। সুতরাং, সেটা একটা গুরুতর সমস্যা। পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক রাজনীতিকদের মধ্যেও একটা সমস্যা ছিল। তাঁরা এমন একটা পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান, সেটা ছিল লক্ষণীয়। আর সে ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের শীর্ষ নেতৃত্ব ছিল তাঁদের শিরঃপীড়ার কারণ। তবে সেটা কিন্তু তিনি শুধু একজন বাঙালি, পূর্ব পাকিস্তানি, এখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসবেন বলেই নয়। কারণ, পাকিস্তানের পূর্ববর্তী বছরগুলোয় পাকিস্তান বাঙালি পূর্ব পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীদের সহ্য করেছে। তিনজন। তবে কিনা সব সময়ই তাঁদের টেনে তোলা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জেনারেল কিংবা গভর্নর জেনারেলদের বৃদ্ধাঙ্গুলির তলায় ছিল তাঁদের অবস্থান। সুতরাং মুজিবই পাকিস্তানের প্রথম পূর্ব পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী হতেন না। কিন্তু তাঁর ক্ষমতার উৎস হতো একটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট, যার কাছে তিনি দায়ী থাকতেন। তাঁকে কোনো প্রেসিডেন্ট কিংবা গভর্নর জেনারেলের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হতো না। ইতিহাসের ওপর দিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কিছু গড়িয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতা '৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে জয়ী জুলফিকার আলী ভুট্টো কী করে ২ নম্বর ব্যক্তি হয়ে মুজিবকে মোকাবিলা করতেন। তাঁকে উপপ্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে হতো। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন। এতে তিনি স্পষ্টতই দ্বিতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। মুজিবকে শীর্ষ আসনে দেখতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিয়ে অনেক ধরনের রাজনীতি করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হয়নি।

চার্লর্স স্টুয়ার্ট কেনেডি : পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার পর কী ঘটল? আমাদের কী ভূমিকা ছিল? ভারতীয়রা বেশ একটা স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতৃবৃন্দ, যাঁরা পালিয়ে গিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করল। ভারত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার শতভাগ পক্ষে।

আমি মনে করি, ভারতীয়রা একে একটি রেডিমেট সুযোগ হিসেবে দেখেছিল। এমন নয় যে তারা সেটা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তারা তা থেকে ফায়দা নিয়েছিল। আমি স্মরণ করতে পারি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম। আমি একটা তারবার্তা পেয়েছিলাম। তাতে ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ ছিল। একই তারবার্তা দিল্লিতে রাষ্ট্রদূত কিটিংয়ের কাছে গিয়েছিল। যাও, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আমাদের সর্বাত্মক তৎপরতা চালাতে বলা হলো, যাতে উভয় পক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের প্রায় ১০ মাইল দূরে তাদের অবস্থান সীমিত রাখে। জাতিসংঘের লোকদের আসার সুযোগ দেয়, যাতে যুদ্ধ এড়ানো যায়। আমি ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি করাচিতে ছিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এটা পাকিস্তানের স্বার্থের পক্ষে হবে। কারণ, সবারই জানা ছিল, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গেলে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের জেতা সম্ভব নয়। ইন্দিরা দূরে ছিলেন। তাই রাষ্ট্রদূত কিটিং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ভারত ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

পরিশিষ্ট ২

ডেভিস ইউজিন বোস্টারের বার্তাগুলো

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী অন্তত সাতটি তারবার্তা পাঠান ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে। ১৬ আগস্ট এ সম্পর্কে 'প্রাথমিক মন্তব্য' শীর্ষক বার্তায় তিনি উল্লেখ করেন, '১৫ আগস্ট স্থানীয় সময় ভোর সোয়া পাঁচটায় অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টা পরের ঘটনাবলি এই আশাবাদ সৃষ্টি করেছে যে, এই অভ্যুত্থান প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে না।'

ওই সময় ওয়াশিংটনেও তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ঢাকার খবর জানতে ছিলেন উদ্‌গ্রীব। মুজিব নিহত হওয়ার ১১-১২ ঘণ্টা পর তিনি তাঁর স্টাফ বৈঠকে উল্লেখ করেন, 'আমি আইএনআর (ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ) থেকে এসব বিষয়ে সঠিক/নির্ভরযোগ্য তথ্য পেয়ে থাকি।' এ সময় ব্যুরোর পরিচালক উইলিয়াম জি হিল্যান্ড বলেন, 'আমি যখন আপনার সঙ্গে কথা বলি, মুজিব তখনো মারা যাননি।' সিআইএর সাবেক কর্মকর্তা হিল্যান্ড ৭৯ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ২৫ মার্চ মারা যান। 'তিনি ছিলেন একজন দক্ষ বিশ্লেষক। ছিলেন আমাদের গ্রুপের অবিচ্ছেদ্য অংশ।'—তাঁর মৃত্যুর পর এ মন্তব্য করেন কিসিঞ্জার। (*ওয়াশিংটন পোস্ট*, ২৮ মার্চ ২০০৮)।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ওয়াশিংটন সময় সকাল আটটার আগে মুজিবের মৃত্যুর বিষয়ে কিসিঞ্জার-হিল্যান্ডের মধ্যে ওই কথোপকথনের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে ১৫ আগস্ট কিসিঞ্জার যখন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে শুনলেন, বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ছিল সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত, তখন তিনি তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করেন : 'তার মানে কী? মুজিবুর কি জীবিত না মৃত?'

আলফ্রেড আথারটন (নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এ সময় বলেন, 'মুজিবুর নিহত। তাঁর নিকটতম আত্মীয়স্বজন, যাঁদের অধিকাংশই পরিবারের সদস্য, তাঁরা বেঁচে নেই।' এ-সংক্রান্ত দলিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হার্ভার্ডের স্নাতক ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা আথারটন এবং ১৯৬৯ পর্যন্ত সিআইএতে থাকা হিল্যান্ড বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানের খুঁটিনাটি জানতেন। ১৯৬২-৬৫ সালে কলকাতায় কর্মরত আথারটন ২০০২ সালের ৩০ অক্টোবর মারা গেছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে তিনি ছিলেন মিসরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ হিল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি *ফরেন অ্যাফেয়ার্স* ম্যাগাজিনের সম্পাদকও ছিলেন।

ওই দিন হিল্যান্ডের মুখে 'মুজিব তখনো মারা যাননি' শুনে কিসিঞ্জার পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'সত্যিই তাই? ওরা তাহলে মুজিবকে কিছু সময় পরে হত্যা করে?' এর জবাব দেন নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আথারটন। তিনি বলেন, 'আমরা যত দূর জানি—আমি বলতে পারি না যে, আমরা বিস্তারিত সবকিছু জেনে গেছি, কিন্তু ইঙ্গিত ছিল তাঁকে হত্যা-পরিকল্পনার বিষয়ে—তারা তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে, ভেতরে প্রবেশ করে এবং তাঁকে হত্যা করে।'

লক্ষণীয় যে, বোস্টারের পাঠানো তারবার্তাগুলোতে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের নতুন সরকারের স্বাভাবিক কার্যক্রম যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে তিনি সহানুভূতিশীল ও সতর্ক ছিলেন। তিনি ১৬ আগস্ট লিখেছেন, 'জনসাধারণ যদিও মুজিবের পতনে আনন্দ প্রকাশ করেনি কিন্তু পরিবর্তন-গ্রহণসূচক শান্ত অবস্থা বিরাজ করছে এবং সম্ভবত তাতে স্বস্তির নিঃশ্বাসও মিশে রয়েছে। শেখ মুজিব ও বাঙালিরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ হলো, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে তাঁর ব্যর্থতা। আর তাঁর ক্ষমতায় থাকাটা হয়ে পড়েছিল আসলে ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যাভিসারী। অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয় "ডাইনেস্টিক রিজন্স" অর্থাৎ পরিবারতান্ত্রিক শাসকদের পরম্পরাসংক্রান্ত কারণ। বাঙালিদের কাছ থেকে মুজিবের বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার বড় কারণ ছিল তিনি সঠিক পরামর্শ গ্রহণ করা থেকে দূরে সরছিলেন। এমনকি মুজিবের মধ্যে স্বৈরশাসকের চিরায়ত বৈকল্য ফুটে উঠতে শুরু করেছিল (...began to suffer the classic paranoia of the despot)।'

বোস্টারের কথায়, 'জুনের গোড়া থেকে শেখ মুজিব ক্ষমতা আঁকড়ে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর ভাগনে শেখ মনির ক্রমবর্ধমান প্রভাব। এ সবই অভ্যুত্থানকারীদের সন্দেহাতীতভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে যে, পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব করা আর সমীচীন হবে না। তবে অভ্যুত্থানের জন্য

ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস বেছে নেওয়ার বিষয়টি হয়তো স্রেফ কাকতালীয়। তবে এই কাকতালীয় বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।'

সামান্য উৎসাহ-উদ্দীপনা

বোস্টার এরপর লেখেন, 'এটা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকার সামান্যই উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পেরেছে। যদিও শেখ মুজিবের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের অনেকেই হত্যার শিকার হয়েছেন কিংবা মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন। কিন্তু তার পরও বর্তমান সরকারে সেসব পরিচিত মুখই রয়ে গেছেন, যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী দুর্বল প্রশাসনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। স্পষ্টতই মন্ত্রিসভায় এখন যাঁরা রয়ে গেছেন, তাঁদের অবস্থান থেকে মনে হয়, মোশতাকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আগের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলবে। অবশ্য সেখানে বড় ধরনের পরিবর্তনও থাকবে। ১৫ আগস্ট দেওয়া তাঁর প্রথম বেতার ভাষণ এই ধারণাকে সমর্থন করে। শেখ মুজিবের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের নিন্দা করলেও মোশতাক জানিয়ে দিয়েছেন, পররাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিকতা অনেকটাই অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যেই এরকম কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, নতুন সরকার পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চাইবে। মোশতাকের সঙ্গে ভারতের সদ্ভাব না থাকার বিষয়টি প্রকাশ্য হলেও এটাও পরিষ্কার যে, নতুন সরকার ভারতের মনে বাড়তি কোনো সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির দিকে যাবে না। মোশতাকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার দিকে তাকালে সেই ইঙ্গিত মেলে। পুরোনো মুখগুলো রেখে দেওয়ার মাধ্যমে নতুন সরকার ভারতের কাছে কার্যত সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে চায়। মোশতাকের ভাষণে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মতো বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণেরই ইঙ্গিত মেলে। এভাবে সরকার সোভিয়েত প্রভাব কিছুটা হ্রাস করতে চাইছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ধরন উল্লেখ করতে গিয়ে বোস্টার লিখেছেন, 'নতুন সরকারের সঙ্গে আমাদের নিজেদের সম্পর্ক মুজিব সরকারের চেয়ে ভালো "এমনকি অধিকতর অন্তরঙ্গ ভিত্তি"র ওপর প্রতিষ্ঠা পাবে। নতুন প্রেসিডেন্ট অতীতে অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে ও প্রকাশ্যে "প্রো-আমেরিকান" দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। বড় কথা হচ্ছে, মুজিব সরকারের মধ্যে শেখ মনি ও সামাদের (আবদুস সামাদ আজাদ) মতো যাঁরা বামপন্থী ও আমেরিকাবিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা আর নেই। আরও জোরালো সম্ভাবনা হচ্ছে, বাংলাদেশ আমাদের কাছে এখন বেশি পরিমাণে সাহায্য চাইতে

পারে। ইতিপূর্বে মোশতাক আমাদের বলেছিলেন, "শুধু আমেরিকাই আমাদের সত্যিকারের সাহায্য করতে পারে।" সুতরাং আমাদের কাছে নতুন সরকারের উচ্চাশার বাঁধ নিয়ন্ত্রণই হতে পারে বড় সমস্যা।'

মোশতাক সরকার এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইউজিন বোস্টার লক্ষণীয়ভাবে উল্লেখ করেন, 'এটা আমরা বিচার করতে পারি না।' তাঁর কথায়, 'আমরা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করি যে, প্রত্যেক সরকারি বিবৃতিতে ক্ষমতা গ্রহণের অনুকূলে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখিত হচ্ছে। আমাদের বলা হয়েছে, সামরিক বাহিনী বর্তমানে সামরিক আইন আদেশ এমএলও প্রস্তুত করছে এবং এ ক্ষেত্রে যদি পাকিস্তানি ধাঁচ অনুসরণ করা হয়, তবে তা-ই হবে দেশের আইনের ভিত্তি। এর ফলে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়বে কি না, তা আমরা এখন বলতে পারি না। কিন্তু আমরা এটা আশা করতে পারি, মোশতাক ইতিমধ্যে তাঁর বিবৃতিতে যা বলেছেন, তাতে গত জানুয়ারিতে মুজিব যা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তার চেয়ে নতুন ও অধিকতর উদার একটি সংবিধান পাওয়া যাবে।'

বোস্টার এ পর্যায়ে আরও উল্লেখ করেন, 'মুজিবকে উৎখাতে সামরিক বাহিনীর সাফল্যের প্রেক্ষাপটে আমাদের এই ধারণা জন্মেছে যে, অভ্যুত্থানকারীরা মুজিবকে হত্যার চেয়ে বেশি কিছু ভাবেনি। যাহোক, সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে যেসব তরুণ কর্মকর্তা, যারা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব দিয়েছে, তারাই শেখ মুজিবকে উৎখাত করেছে এবং আমরা সন্দেহ করি, যেহেতু তারা রক্তের স্বাদ পেয়েছে, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহেও তারা কিছু ভূমিকা রাখতে চাইবে। অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে কোনো বাঙালি গাদ্দাফিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। তার চেয়ে বরং এটা ভাবাই সংগত যে, চাকরিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরোনো সদস্য—যারা শেখ মুজিব দ্বারা হুমকিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তারা হয়তো একটি অধিকতর উদারপন্থী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। পাকিস্তানি জমানায় পূর্ব বাংলায় যেমনটা দেখা গিয়েছিল, তার চেয়ে এটা ভিন্ন হতে পারে।'

বোস্টার লেখেন, 'এখানে একটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা উচিত যে, রক্তস্নাত হলেও শেখ মুজিবের উৎখাত-প্রচেষ্টা যখন সফল হয়েছে তখন আরও অনেক কিছুই করার থাকতে পারে। মোশতাকের ভাষণ সাধারণ বিবরণগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং এতে আওয়ামী লীগের ইতিপূর্বেকার বাগাড়ম্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ এ পর্যন্ত যা নেওয়া হয়েছে তা অল্পই। দেশ পরিচালনায় সীমিত পদক্ষেপ আমাদের অবাক করেনি। তবে যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাতে নতুন সরকারের কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে শুরু করবে। সে ক্ষেত্রে আমরা খুবই সংঘাতপূর্ণ একটি ক্ষমতার লড়াই প্রত্যক্ষ করতে পারি। বাঙালির

রাজনৈতিক মঞ্চে আজ আর শেখ মুজিবের মতো কোনো কমান্ডিং পারসোনালিটি বা আদেশদানকারী ব্যক্তিত্ব নেই, মুজিবকে যা কিনা দীর্ঘকাল টিকিয়ে রেখেছিল। বেসামরিক সরকারের পদস্খলন ঘটেছে। আমরা এখন সামরিক বাহিনীর দিকে তাকাতে পারি। জাতিকে বাঁচাতে সেটাই দরকার।'

প্রথম 'আনুষ্ঠানিক' যোগাযোগ

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় কারফিউ পাসের জন্য নতুন সরকারের সঙ্গে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের প্রথম 'আনুষ্ঠানিক' যোগাযোগ ঘটে। এ ক্ষেত্রে বেঙ্গল ল্যান্সারের সদস্যরাই প্রথমে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৫ আগস্ট মেজর ফারুক রহমান বেঙ্গল ল্যান্সারের সহ-অধিনায়ক বা সেকেন্ড-ইন কমান্ড ছিলেন। সেনাবাহিনীর দুটি রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছিল। আর্টিলারি ও আর্মার্ড। আর্টিলারির সহ-অধিনায়ক ছিলেন মেজর রশিদ।

এদিন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে ওয়াশিংটনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তারবার্তা পাঠান। আর ঢাকার বাইরের অবস্থা জানতে মার্কিন দূতাবাস বিকল্প উপায় বের করেছিল। বোস্টার ১৫ আগস্ট এক বার্তায় লেখেন, 'সকাল ১১টা পর্যন্ত অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। গুটিবসন্ত নির্মূল কর্মসূচির চিকিৎসক তাঁদের সংগঠনের বেতার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাপক এলাকার খবর নিয়ে জেনেছেন, কোথাও গোলযোগ হয়নি। তবু কিছু প্রতিরোধের সম্ভাবনা আমরা এখনই নাকচ করে দিচ্ছি না। তবে সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে, অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। বেতারের মাধ্যমে সেনা-নৌ-বিমান, বিডিআর ও পুলিশপ্রধানেরা সরকারের প্রতি অনুগত থাকার বিবৃতি প্রচার করছেন।'

ঢাকার মার্কিন দূতাবাস কী উপায়ে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবে, সে বিষয়ে ওয়াশিংটন থেকে বোস্টারের প্রতি নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। পূর্বোক্ত তারবার্তায় বোস্টার পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানান, 'আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে নতুন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং আমরা অবশ্যই সূত্রের (contacts) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ১১ এফএএম ১১৩.৭-এর নির্দেশনা মেনে চলব।' অনুসন্ধানে অবশ্য এই নির্দেশনার হদিস পাওয়া যায়নি। তবে ১৯ আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর 'বাংলাদেশে অভ্যুত্থান-স্বীকৃতি' শীর্ষক একটি তারবার্তা সব গুরুত্বপূর্ণ মিশনে পাঠায়। এতেও এ নির্দেশনা কার্যকর রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, মার্কিন রাষ্ট্রদূতেরা যেন নতুন সরকারকে স্বীকৃতির প্রশ্নে নিচু গলায় কথা বলেন। তবে নতুন (সরকারের) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হবে যথার্থ। সাহায্য বাড়ানোর প্রশ্নে সহানুভূতি দেখালে ক্ষতি নেই।

বোস্টার ওই দিন তাঁর তৃতীয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'নিহতদের সঠিক সংখ্যা আমরা জানি না।' কিন্তু বোস্টার লক্ষণীয়ভাবে অজ্ঞাতনামা একটি সূত্রের বরাতে

নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে প্রায় নির্ভুল তথ্যই মার্কিন সরকারকে জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বোস্টার লিখেছেন, একটি সূত্রকে সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল জানান, নিহতদের সংখ্যা ১৬। বার্তায় ওই সূত্র বা কর্নেলের নাম নেই। কর্নেল সম্পর্কে বলা হয়েছে 'অজ্ঞাত'।

১৮ আগস্ট বোস্টার তাঁর সপ্তম প্রতিবেদনে লেখেন, 'অভ্যুত্থানে কতজন নিহত হয়েছে, তার নিশ্চিত সংখ্যা জানা যায়নি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী রোববার মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সরকারিভাবে এ খবর ও ছবি প্রচার করা হয়েছে। তোফায়েল আহমেদ গৃহবন্দী। আবদুর রাজ্জাক পলাতক। জিল্লুর রহমান তাঁর বাড়ির পাশে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রয়েছেন।' এই বার্তার শেষ বাক্যেও গোপন যোগাযোগকারীদের একটি উল্লেখ পাওয়া গেছে। বোস্টার লিখেছেন, 'আমাদের কয়েকজন পরিচিত সাংসদ বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা দেখতে চান বাকশাল নিয়ে সরকার কী করে।'

বোস্টার আরেকটি বার্তায় লেখেন, 'ঢাকায় এখন বিকেল চারটা। তেমন কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই অভ্যুত্থান সফল। রাস্তাগুলো শান্ত, লোক চলাচল খুবই কম, যানবাহন নেই বললেই চলে। জুমার নামাজের জন্য দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দুইটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়েছিল। রাস্তায় কিছু সেনাসদস্য দেখা গেছে। দূতাবাসের কর্মকর্তারা দূতাবাস ও ধানমন্ডির মধ্যকার বিভিন্ন রুটে যাতায়াত করেছেন। সকাল ও দুপুরে তাঁরা বাইরে চলাফেরা করেছেন। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ও ঢাকা ক্লাবের কাছে ট্যাংক দেখা গেছে। শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর বাড়ির কাছেও সেনা টহল ছিল।'

'জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক বেতারে নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করতে শামিল হয়েছেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের খেয়াল থাকতে পারে (বার্তা নম্বর ঢাকা-৩৯৩৮) রক্ষীবাহিনীর পরিচালক বর্তমানে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন। আনুগত্য প্রকাশ করেছেন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক।

'শেখ মনির ভাই দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কাছে নিহতদের বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। বাংলাদেশ বেতার সব সাবেক সেনাসদস্যের প্রতি সেনাবাহিনীতে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। বলা হয়েছে, জাতীয় স্বার্থে তাঁদের প্রয়োজন। এ মুহূর্তে অন্তত ১৪টি ট্যাংক মার্কিন দূতাবাসসংলগ্ন সড়ক হয়ে বঙ্গভবন পর্যন্ত আসা-যাওয়া করছে।'

১৬ আগস্ট বোস্টার লেখেন, 'আমরা বুঝতে পারছি, একদল সেনা কর্মকর্তা সামরিক আইনের বিধিবিধান তৈরির কাজে ব্যস্ত। কিছু নির্দেশনা ইতিমধ্যে ঢাকার পত্রপত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের বক্তব্য বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। মুখপাত্রের বরাতে বলা হয়েছে, 'নতুন শাসকেরা এখনো মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তবে তাঁরা চাইলে যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।'

এই দিন মার্কিন মুখপাত্রকে ওয়াশিংটনে প্রশ্ন করা হয়, নতুন সরকার কি আমেরিকাপন্থী? মুখপাত্রের জবাব, 'আমি জানি না।' অথচ এদিন ওয়াশিংটন সময় সকাল আটটায় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারসহ সবাই একমত হন যে নতুন সরকার আমেরিকাপন্থী। ১৫ আগস্ট বোস্টারের প্রাথমিক মন্তব্যেও মোশতাকের নিজের জবানিতে তাঁকে আমেরিকাপন্থী বলা হয়।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫, শুক্রবার

প্রেরক : ঢাকা দূতাবাস। প্রাপক : পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ওয়াশিংটন। অনুলিপি : দূতাবাস, দিল্লি ইসলামাবাদ কাঠমান্ডু ও কলকাতা

'১. শেখ মুজিবুর রহমান সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেডিও সেনাবাহিনীর একজন মেজরের কণ্ঠে ধারণকৃত একটি টেপ প্রচার করে চলেছে। এতে বলা হচ্ছে, শেখ মুজিবকে উৎখাত করা হয়েছে। খন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের অন্তরীণ রাখা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) এবং রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন প্রদান অন্যথায় পরিণতি ভোগ করার ঝুঁকি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

'২. অভ্যুত্থান শুরু হয় ভোর সাড়ে পাঁচটার অব্যবহিত আগে। ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়ির এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়।

'৩. আমরা বুঝতে পারছি, এর মধ্যেই ২৪ ঘণ্টার কারফিউ জারি হতে চলেছে। এই মুহূর্তে দূতাবাসের কারও নিরাপত্তা বা সম্পদের ওপর কোনো হুমকি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বোস্টার'। তারবার্তা নম্বর ১৯৭৫ঢাকা০৩৯৪১।

বাংলাদেশ রেডিও এখনো আরও ঘোষণা প্রচার করছে।

নিচে তার প্রাথমিক অনুবাদ দেওয়া হলো :

'সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।

'খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।

'মুজিবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

'নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে, আর কোনো গোলযোগ হবে না। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনাদের বাড়িতে থাকতে বলা হচ্ছে। আমরা জনগণের কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা চাই। যদি কেউ গৃহীত ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তবে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। বিশ্বের শান্তিপ্রিয় দেশগুলোকে এই সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বোস্টার'। তারবার্তা নম্বর ১৯৭৫ঢাকা০৩৯৪৩।

বিষয় : বাংলাদেশে অভ্যুত্থান, পরিস্থিতি প্রতিবেদন নং ৩

সারসংক্ষেপ : একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, একটি দশ সদস্যের বেসামরিক মন্ত্রিসভা এবং ছয়জন প্রতিমন্ত্রী নতুন সরকারে শপথ নিয়েছেন। তাঁরা সবাই মুজিব সরকারে ছিলেন। বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধানের পদ থেকে গাজী গোলাম মোস্তফাকে 'অপসারণ' করা হয়েছে। ঢাকা নগর শান্ত রয়েছে। সারসংক্ষেপ শেষ।

১. ১৯০০ ঘণ্টায় রেডিও বাংলাদেশ ঘোষণা দেয় যে, প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ছয়জন প্রতিমন্ত্রীসহ ১০ সদস্যের বেসামরিক মন্ত্রিসভাকে শপথ করিয়েছেন। তাঁদের দপ্তর ঘোষণা করা হয়নি। ১০ জন মন্ত্রীর সবাই মুজিব সরকারে ছিলেন। ছয়জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে পাঁচজনই মুজিব সরকারে ছিলেন। ঘোষণার ক্রম-অনুযায়ী তালিকাটি নিচে দেওয়া হলো : ভাইস প্রেসিডেন্ট : মোহাম্মদ উল্লাহ (বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং জানুয়ারি থেকে ভূমি প্রশাসন ও সংস্কারবিষয়ক মন্ত্রী)

মন্ত্রিসভার সদস্য : ১. আবু সাঈদ চৌধুরী (সাবেক প্রেসিডেন্ট, বিদেশে মুজিব সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি এবং ৮ আগস্ট থেকে বন্দর, নৌপরিবহন ও অভ্যন্তরীণ জল পরিবহনবিষয়ক মন্ত্রী।), ২. মো. ইউসুফ আলী (শ্রম ও সমাজকল্যাণ; সংস্কৃতিবিষয়ক ও ক্রীড়া), ৩. ফণীভূষণ মজুমদার (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন), ৪. মনোরঞ্জন ধর (আইন ও সংসদবিষয়ক), ৫. আবদুল মোমেন (খাদ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন), ৬. আসাদুজ্জামান খান (পাট), ৭. এ আর মল্লিক (অর্থ), ৮. মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী (শিক্ষা), ৯. আবদুল মান্নান (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা), ১০. সোহরাব হোসেন (পূর্ত ও নগর উন্নয়ন)।

প্রতিমন্ত্রী : ১. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (সংসদীয় দলের চিফ হুইপ), ২. দেওয়ান ফরিদ গাজী (বাণিজ্য), ৩. তাহেরউদ্দিন ঠাকুর (তথ্য), ৪. নুরুল ইসলাম চৌধুরী (প্রতিরক্ষা), ৫. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী, কথিত দুর্নীতির অভিযোগে ২১ জুলাই ১৯৭৫ মুজিব তাঁকে অপসারণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে সেরনিয়াবাতের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।), ৬. কে এম ওবায়দুর রহমান (ডাক, তার ও টেলিগ্রাফ)।

২. রেডিও এর আগে ঘোষণা দেয় যে, বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যানের পদ থেকে গাজী গোলাম মোস্তফাকে 'অপসারণ' করা হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা 'অবিলম্বে কার্যকর' হবে।

৩. রেডিওর খবরে প্রচার করা হচ্ছে যে, 'সর্বস্তরের জনসাধারণ এ ক্রান্তিকালে জাতিকে বাঁচাতে' খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা

দখলের 'সাহসী পদক্ষেপ'কে অভিনন্দন জানিয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দও নতুন সরকারের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। ঘোষণায় অবশ্য 'বিপুলসংখ্যক সাবেক সেনাসদস্য' 'যাঁরা সেনাবাহিনীতে পুনরায় যোগদানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন', তাঁদের অবিলম্বে নিকটস্থ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

৪. আরেকটি ঘোষণা পুনঃপুন প্রচার করা হচ্ছে যে, নতুন সরকার বলেছে বৈদেশিক মিশনসমূহের 'ইনভাইয়োলাবিলিটি ও এক্সট্রা টেরিটরিয়ালিটি'র মর্যাদা পুরোপুরি বজায় রাখা হবে। বাংলাদেশে কর্মরত কূটনীতিক ও অকূটনীতিক বিদেশি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা ও কল্যাণ আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতিক রেওয়াজ অনুসারে নিশ্চিত করা হবে।

৫. ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা আমাদের অবহিত করেছেন যে, আগামীকাল ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিমানবন্দর বন্ধ থাকবে।

৬. ক্ষমতা দখলপর্বে শেখ মুজিব সমর্থকদের কতজন নিহত হয়েছে তা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু একটি সূত্র বলেছে, একজন কর্নেল (অচিহ্নিত) তাঁকে বলেছেন, শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসভবনে হামলার ঘটনায় ১৬ জন নিহত হয়েছে। আমাদের কাছে অসমর্থিত খবর রয়েছে যে নবনিযুক্ত বাকশাল সাধারণ সম্পাদক ও গভর্নরদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৭. 'অনির্দিষ্টকালের' জন্য কারফিউ কার্যকর রয়েছে। যদিও দূতাবাস/ঢাকা স্টেডিয়াম এলাকায় ট্যাংক চলাচল প্রত্যক্ষকারী জনতার ছোটখাটো সমাবেশ ভণ্ডুল করতে সেনারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। মাঝেমধ্যে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। তবে আমাদের বিশ্বাস, সেনাদের গুলি জনতার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। ১৮৪০ ঘণ্টায় সর্বশেষ ট্যাংকটি যখন "মুভ" করছিল তখন জড়ো হওয়া জনতাকে সরানো শুরু হয়। এই মুহূর্তে ঢাকা নগরকে বড় বেশি শান্ত মনে হচ্ছে। বোস্টার'। তারবার্তা নম্বর ১৯৭৫ঢাকা০৩৯৫৩।

১৬ আগস্ট ১৯৭৫

বিষয় : বাংলাদেশে অভ্যুত্থান, পরিস্থিতি প্রতিবেদন নং ৫

১. ঢাকা রাতারাতি শান্ত হয়ে পড়েছে। দূতাবাসের ছাদে মোতায়েন থাকা মেরিন প্রহরীরা জানিয়েছে, রাস্তায় মানুষের চলাচল নেই বললেই চলে। বন্দুকের আওয়াজও মিলিয়ে গেছে। দূতাবাসের গাড়িগুলো আজ সকালে রাস্তা দিয়ে সহজেই চলাচল করেছে। নগরে ট্যাংকের সংখ্যাও কমে গেছে। ০৯.৩০ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত তিন ঘণ্টার মেয়াদে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়েছে। সন্ধ্যার আগে তা পুনরায় বলবৎ করা হবে কি না, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। পথচারী এবং যানবাহন চলাচল এখনো তেমন চোখে পড়ে না। তবে গতকাল

যেমনটা লোকজন খোশগল্প করে সময় কাটিয়েছে, আজ সেখানে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। তারা কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছে। সারা দেশে তাঁর লোকজনের মাধ্যমে খোঁজখবর নেওয়ার পর গুটিবসন্ত নির্মূল কর্মসূচির পরিচালক বলেছেন, তাঁর দপ্তরগুলো রিপোর্ট দিয়েছে যে গত রাতে সারা দেশে সবকিছুই শান্ত ছিল।

২. আমরা বুঝতে পারি যে সেনা কর্মকর্তাদের একটি দল সামরিক আইন ও প্রবিধান নিয়ে কাজ করছে এবং তাদের কতিপয় নির্দেশনা ইতিমধ্যেই ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সব বিভাগ ও সংস্থাকে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখতে বলা হয়েছে। যেমন হাসপাতাল, পানি সরবরাহ, সরকারি পরিবহন পুল, বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, অগ্নিনির্বাপণ প্রভৃতি। গত সন্ধ্যায় সব ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার ও পুলিশ সুপার, যাঁরা তাঁদের জেলার বাইরে ছিলেন, তাঁদের ফিরে আসতে ও কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক ও প্রেস-কর্মীদের অবিলম্বে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে এবং আজ সকালে সংবাদপত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের হতে দেখা গেছে।

৩. ইংরেজি দৈনিক দুটি তাদের প্রথম পাতায় অভ্যুত্থানের বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের বক্তব্য (চার পরিচ্ছেদ) সংবলিত রয়টার্সের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। শিরোনাম হলো: 'যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক কূটনৈতিক কার্যক্রম চালাতে প্রস্তুত।' প্রতিবেদনে অবশ্য মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের বরাতে বলা হয়, নতুন শাসকেরা মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করেনি। তবে যদি অনুরোধ আসে তাহলে মার্কিন সরকার স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত রয়েছে।

৪. সংবাদপত্র অবশ্য ভুট্টোর এই ঘোষণাও প্রকাশ করেছে যে পাকিস্তান সরকার নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভুট্টো নতুন নেতৃত্বকে মেনে নিতে ওআইসির সদস্য ও তৃতীয় বিশ্বের অন্য দেশগুলোর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

৫. নতুন সরকারের সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে গত সন্ধ্যায়ই প্রথম দূতাবাসের সরাসরি সরকারি যোগাযোগ ঘটে। কারফিউ পাসের ব্যাপারে দূতাবাসের অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে বেঙ্গল ল্যান্সারের দুজন কর্মকর্তা তাঁদের উদ্যোগে দূতাবাসে আসেন। তাঁরা কারফিউর সময় দূতাবাস ও বাসভবনের মধ্যে দূতাবাস-কর্মীদের যাতায়াতের জন্য এসকর্ট-সুবিধা গ্রহণের অনুরোধ জানান। বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁরা আরও বলেন, দূতাবাস-কর্মীরা যেন কোনোক্রমেই কারফিউকালে এসকর্টবিহীন চলাচল না করেন। দূতাবাস-কর্মকর্তারা জানিয়ে দেন যে আপাতত এ ধরনের সহায়তা নেওয়ার আমাদের প্রয়োজন নেই। বোস্টার। তারবার্তা নম্বর ১৯৭৫ঢাকা০৩৯৫৭।

১৭ আগস্ট ১৯৭৫

বিষয় : বাংলাদেশে অভ্যুত্থান, পরিস্থিতি প্রতিবেদন নং ৬

১. ১৬-১৭ আগস্টের রাতে ঢাকা শান্ত ছিল, যদিও নগরের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীকে টহল দিতে দেখা গেছে। মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। ১৭ আগস্ট সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। অভ্যুত্থানের পর এই প্রথম নগরকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা গেছে। মার্কিন নাগরিকেরা নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাটে আছেন।

২. নতুন সরকার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। আমরা একটি সার্কুলার নোট পেয়েছি। এতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নতুন সরকারের সম্পর্ক নির্ধারণী নীতির বিবরণ রয়েছে। নতুন সরকার স্পষ্টতই সৌদি আরব ও ইয়েমেনের স্বীকৃতি পেয়ে উৎফুল্ল। আজ সকালে তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে।

৩. বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে নতুন সরকার প্রশাসনিক বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে মনোযোগী হয়েছে।

   ক. প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ মন্ত্রীদের দায়িত্ব বণ্টন করেছেন। ১৪ আগস্ট তাঁরা যে দায়িত্বে ছিলেন সে দায়িত্বে বহাল রয়েছেন। যেসব মন্ত্রণালয় শূন্য রয়েছে সেগুলোর দায়িত্ব আপাতত প্রেসিডেন্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। দুজন নতুন প্রতিমন্ত্রীকে শিগগিরই দপ্তর বণ্টন করা হবে।

   খ. বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বলা হয়েছে, ১৪ আগস্ট তাঁরা যে পদে বহাল ছিলেন সেসব পদেই থাকবেন। (আমাদের বলা হয়েছে, শেখ মুজিবের গর্ভনর-ভিত্তিক নতুন প্রশাসনিক কাঠামো বাতিল করা হয়েছে। এখন থেকে পুরোনো ব্যবস্থা বহাল থাকবে। এই খবরের অবশ্য নিশ্চয়তা মেলেনি, তবে তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।)

   গ. নতুন সরকার অভ্যন্তরীণ নৌ, সড়ক ও আকাশযান চলাচলে অনুমতি দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি খাদ্যশস্য চলাচলে বিশেষ যত্নবান হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

   ঘ. শেখ মুজিবের মরদেহ তাঁর গ্রামে সমাহিত করা হয়েছে। প্রয়াত প্রেসিডেন্টের স্মৃতিচিহ্ন ইতিমধ্যেই সব জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাঁর ছবি, যা সর্বত্র উল্লেখযোগ্যভাবে শোভা পাচ্ছিল, সেসব ছবি অপসারণ করা হচ্ছে। এবং নতুন সরকার 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' অধীনে জারি করা সব খবর ও প্রামাণ্যচিত্রের রিল বাজেয়াপ্ত করছে।

৫. সর্বোপরি, সরকার পরিবর্তনের বিষয়টি যে সম্পূর্ণতা পেয়েছে তা প্রমাণের জন্য বিশিষ্ট কৃষকনেতা, অনুমিত বামপন্থী এবং বাংলাদেশ রাজনীতির বোলতা হিসেবে পরিচিত মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নতুন

সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন।

বোস্টার।

১৮ আগস্ট ১৯৭৫

বিষয় : বাংলাদেশে অভ্যুত্থান, পরিস্থিতি প্রতিবেদন নং ৭

১. ঢাকায় আজ লোকজন কাজে যোগ দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ সরকার সব সরকারি-বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এ ছাড়া প্রেসিডেন্টের পৃথক এক আদেশে সব সরকারি-আধা সরকারি অফিস ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আজ যথাসময়ে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কাজ যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সে জন্য তদারককারী কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে, কোনো অবস্থাতেই 'অবহেলা কিংবা শৈথিল্য' সহ্য করা হবে না। সরকারি বিবৃতিতে অভ্যন্তরীণ বিমান, ট্রেন এবং লঞ্চ যথাসময়ে চলাচল করছে বলে জানানো হয়েছে। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর থেকে খাদ্যশস্য দ্রুততার সঙ্গে খালাস করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাভাবিকতার এটাই বড় প্রমাণ।

২. অভ্যুত্থানে কতজন নিহত হয়েছে, সে সংখ্যা এখনো স্পষ্ট নয়। ব্যাপকভিত্তিক গুজব সত্ত্বেও (যেমনটা রিপোর্ট করা হয়েছে ঢাকা৩৯৫১ নম্বর বার্তায়) সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী নিহত হননি। রোববার তিনি প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু সময় অবস্থান করেন, এটা এক সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে। তাঁদের ওই বৈঠকের খবর ও ছবি টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে। ইতিপূর্বে যাঁরা নিহত হয়েছেন বলে সন্দেহ করা হয়েছিল, সেই সংখ্যা কিছুটা কমেছে। মুজিবের অন্যতম প্রভাবশালী আত্মীয় বেঁচে আছেন বলেই মনে হচ্ছে। তিনি সৈয়দ হোসেন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ছিলেন। তিনি নিরাপত্তা হেফাজতে রয়েছেন এবং চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। মুজিবের সাবেক বিশেষ সহকারী তোফায়েল আহমেদ গৃহবন্দী। বাকশালের সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক কথিতমতে পলাতক। গুজব হচ্ছে, অন্য বাকশাল সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানকে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আটকে রাখা হয়েছে। এই কেন্দ্র তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে কাছেই। গভর্নর ও সাংসদদের মধ্যে অনেকেই দৃশ্যত সতর্কতাবশত আত্মগোপন করে আছেন। তাঁদের আপাতত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী এমপিদের মধ্যে অনেকে তাঁদের বাসায় অবস্থান

করছেন। তাঁরা কিছুটা শঙ্কিত এবং এটাই স্বাভাবিক। তাঁরা বাকশাল সম্পর্কে নতুন সরকারের মনে কী আছে, তা না দেখা পর্যন্ত নির্লিপ্ত থাকবেন।

৩. অভ্যুত্থানের সহিংসতা মুজিব ও তাঁর সহযোগীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু নিরীহ লোকেরাও দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাড়ি থেকে আধা মাইল দূরবর্তী মোহাম্মদপুরে ১২ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এবং সম্ভবত এর দ্বিগুণসংখ্যক লোক গুরুতর জখম হয়েছে। শেখের ওপর পরিচালিত আক্রমণ কভার করার জন্য মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তা টার্গেটের অনেক বাইরে চলে যায়।

৪. পত্রিকা বিবিসির একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে আরব ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র (সানা) নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও পত্রিকায় ১৬ আগস্ট পাকিস্তানের স্বীকৃতির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পাকিস্তান কর্তৃক চাল ও পোশাক উপহার দেওয়ার বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

বোস্টার।

২১ আগস্ট ১৯৭৫

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ২১ আগস্ট ১৯৭৫ এক তারবার্তায় খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভা ও উপদেষ্টাদের নাম ওয়াশিংটনে পাঠান।

বোস্টার লিখেছেন, ২০ আগস্ট ১৯৭৫ প্রেসিডেন্ট মোশতাক তাঁর ১০ মন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মোশতাক নিজের হাতে রেখেছেন প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র। নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন আবু সাঈদ চৌধুরী। মোশতাক অতিরিক্ত পাঁচ প্রতিমন্ত্রীকেও শপথ করিয়েছেন। এর মধ্যে চারজন মুজিব সরকারে ছিলেন। মোট মন্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়াল ১১। কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)-এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রসচিব মাহবুব আলম চাষীকে মোশতাকের মুখ্য সচিব করা হয়েছে।

মন্ত্রীদের নাম ও তাঁদের পদবি উল্লেখ করা হলো : প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ : প্রেসিডেন্ট সচিবালয়, প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র; ১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী : পররাষ্ট্র; ২. অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলী : পরিকল্পনা; ৩. ফণীভূষণ মজুমদার : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়; ৪. মো. সোহরাব হোসেন : গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন; ৫. আবদুল মান্নান : স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা; ৬. মনোরঞ্জন ধর : আইন, সংসদবিষয়ক ও বিচার; ৭. আবদুল মোমেন : কৃষি ও খাদ্য; ৮. আসাদুজ্জামান খান : বন্দর ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন; ৯, ড. আজিজুর রহমান মল্লিক : অর্থ; ১০. ড. মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী : শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং আণবিক শক্তি।

প্রতিমন্ত্রীদের দপ্তর : ১. দেওয়ান ফরিদ গাজী : বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য, পেট্রোলিয়াম ও খনিজ; ২, মোমিন উদ্দিন আহমেদ : খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, পানিসম্পদ ও বিদ্যুৎ; ৩. অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী : শিল্প (রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসহ); ৪. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন : বিমান চলাচল, পর্যটন, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার; ৫. তাহেরউদ্দিন ঠাকুর : তথ্য ও প্রচার, শ্রম, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতিবিষয়ক ও ক্রীড়া; ৬. মোসলেম উদ্দিন খান : পাট; ৭. মো. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর : যোগাযোগ (রেল বিভাগ); ৮. কে এম ওবায়দুর রহমান : ডাক, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, ৯. ক্ষিতিশচন্দ্র মণ্ডল : ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ১০. রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ : বন, মৎস্য ও পশুপালন, ১১. সৈয়দ আলতাফ হোসেন : যোগাযোগ (সড়ক, মহাসড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ)।

২. মাহবুব আলম চাষী প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব নিযুক্ত হয়েছেন। শফিকুল হক প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং জহিরুল হক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মাহবুব আলম চাষী ছিলেন একজন পেশাদার কূটনীতিক। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারে মোশতাক যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন চাষী ছিলেন পররাষ্ট্রসচিব। রাঙ্গুনিয়া কো-অপারেটিভের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং স্বাধীনতার পর কুমিল্লা বার্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হন। শফিকুল হক একজন প্রকৌশলী, অরিগন স্টেট থেকে পানি প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। স্বাধীনতার পর তিনি প্রথমে ওয়াপদায় পানি কমিশনার নিযুক্ত হন। মোশতাক আহমদ যখন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন তখন শফিকুল হক ছিলেন তাঁর সচিব। গত বছর তিনি অবসরে যান। জহিরুল হক ছিলেন পাকিস্তানি সিভিল সার্ভেন্ট। ব্যাংকিং খাতে ছিলেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তরে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট ৩

সৈয়দ ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকার

১৯৯২ সালের ১৪ আগস্ট এই বইয়ের লেখক ফারুক রহমানের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন ধানমন্ডিতে তাঁর ফ্রিডম পার্টির অফিসে।

'আমি স্বীকার করছি, শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার ঘটনা মর্মন্তুদ না হলেও দুঃখজনক। শেখ মুজিব ইজ দ্য ভিকটিম অব দোজ হু আর বেনিফিসিয়ারিজ অব হিজ লাইফ লং পলিটিক্যাল একটিভিটিজ।' অর্থাৎ শেখ মুজিব তাঁদের কার্যক্রমের বলি হয়েছেন, যাঁরা তাঁর আজীবনের রাজনীতির সুবিধাভোগী ছিলেন।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ককে সপরিবারে হত্যার ঘটনায় আজ আপনি অনুতপ্ত কি না?' এক সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নের উত্তরে আগস্ট অভ্যুত্থানের নায়ক কর্নেল (অব.) ফারুক রহমান উপরিউক্ত মন্তব্য করে বলেন, 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, বেসামরিক রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যদি সততা ও দায়িত্বজ্ঞান থাকত, তাহলে শেখ মুজিব আজও বেঁচে থাকতেন। তাঁকে মরতে হতো না। তিনটি বড় ভুল তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। প্রথমত, দেশে ফেরার পর নিজেকে প্রধানমন্ত্রী না করে তাঁর উচিত ছিল শুধু দলীয় প্রধান হিসেবে থাকা। দ্বিতীয় ভুলটা ছিল আওয়ামী লীগকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরা অর্থাৎ শুধু একজন আওয়ামী লীগারই শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশি—এই ধারণা সৃষ্টি করা। তৃতীয়ত, নিজেকে তাঁর একজন 'গড'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ করা। যেকোনো ধরনের ফাইলে তাঁর সই লাগত। জিয়া, এরশাদ আমল এবং বর্তমানেও সেই একই ধারা চলছে।'

'শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণে আপনার আপত্তি কেন? আপনি তো তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।' জবাবে কর্নেল ফারুক বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এটাও সত্য যে, জনগণের সর্বোত্তম ইচ্ছায় তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত

হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই আমি পাকিস্তানিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।'

কর্নেল ফারুক ব্যক্তি মুজিবকে 'চমৎকার মানুষ', সদালাপী ও বন্ধুভাবাপন্ন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'পাকিস্তান থেকে ফিরে না এলে তিনি জনগণের হৃদয়ে চির অমর হয়ে থাকতেন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি ছিলেন অযোগ্য।' ফারুক বলেন, 'তিনি জাতিকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাঁর আসলে আর কিছুই দেওয়ার ছিল না। তাই বলছি, প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ তাঁর উচিত হয়নি।'

'শিশু রাসেল ও অন্যরা কী দোষ করেছিল? আপনার হত্যা-পরিকল্পনা বড়ই বেদনাদায়ক নয় কি?' এ প্রশ্নের জবাবে কর্নেল ফারুক বলেন, 'ইট ইজ রিগ্রেটেবল বাট নট ট্র্যাজিক (এটা দুঃখজনক হলেও, মর্মন্তুদ নয়), স্বয়ং শেখ মুজিবকেও ওই দিন হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল না। তাঁকে জিম্মি করে আনতে ১৫ আগস্টের সকালে আমি ট্যাংক নিয়ে ৩২ নম্বরে গিয়েছিলাম, ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে সৈন্যরা আমাকে জানাল, "স্যার! সব শেষ"।' ওই ভয়াল রাতের বিবরণ দিয়ে ফারুক রহমান বলেন, 'শেখ কামালের আচমকা গুলিতে সৈন্যদের মৃত্যু ও পরে অফিসারদের প্রতি সৈন্যদের অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ায় অত রক্তপাত ঘটে। সৈন্যরা ভীষণ রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। এমনকি পাতলা পায়খানায়ও আক্রান্ত হয় কেউ কেউ।' হত্যা-পরিকল্পনা সম্পর্কে ফারুক বলেন, '১৪ আগস্ট রাত একটা ৩০ মিনিটে ক্যান্টনমেন্টে আমি প্রথম সকলকে নির্দেশ দিই। ৩০ মিনিট ধরে বুঝিয়ে দিই কীভাবে কী করতে হবে। চারটা ৩০ মিনিটে "মুভ" করার নির্দেশ ছিল, কিন্তু অভিযানের সাজসরঞ্জাম জোগাড় হতে বিলম্ব ঘটে। সিগন্যাল মসজিদে ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ট্যাংক ৩২ নম্বরের উদ্দেশে যাত্রা করে। আমি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম যে, আর একটু দেরি হলে হার্টফেল করতাম। আমার নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল লান্সার এবং রশিদের নেতৃত্বাধীন গোলন্দাজ বাহিনীর ৭০০ থেকে ৯০০ সৈন্য এই অভিযানে অংশ নেয়।'

ফারুক বলেন, 'অফিসাররা প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে শেখ মুজিবের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় কথা বলে। এরই মধ্যে শেখ কামাল হঠাৎ গুলি চালিয়ে তিনজন সৈন্যকে হত্যা করে। অপ্রস্তুত সৈন্যরা এতে হতভম্ব হয়ে পড়ে। শেখ কামাল প্রথম নিহত হয় এ জন্যই।' এ প্রসঙ্গে কর্নেল ফারুক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈন্যদের অফিসারদের প্রতি বরাবর একটু আস্থাহীনতায় ভোগার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, 'এই ধারণাটা সৈন্যদের মনে গেঁথে গেছে এ জন্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈন্যরা যখন যুদ্ধে মারা পড়েছে, তখন অফিসারদের অনেকে সীমান্তের ওপারে বুকে নতুন নতুন ব্যাজ লাগিয়েছে।' ফারুক বলেন, 'শেখ কামালের সঙ্গে আমার ভালো জানাশোনা ছিল। তাদের পরিবারের প্রতি আমার আক্রোশ নেই। কামাল গুলি না ছুড়লে এবং শেখ মুজিব আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলে ১৫ আগস্টের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত।' তিনি রাসেলকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'বন্ধ দরজায় এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণের সময় অন্যদের সঙ্গে সে মারা যায়।'

'আপনার মূল পরিকল্পনা ছিল একরকম, ঘটেছে অন্যরকম। এতে আপনার কাঁধে ব্যর্থতার দায়ভাগ আসে'—এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন 'না, কোনো সামরিক কৌশলই এক শ ভাগ সফল হয় না। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে লড়াই অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং তার পরিণতিতে দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে এগোতে পারত। তা হয়নি। তাই আমরা সফল।' কর্নেল ফারুক বলেন, '৩২ নম্বরে অভিযান চলাকালে শেখ মুজিবের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে জেনারেল সফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলেছেন ঢাকার বিদেশি মিশনগুলোর সঙ্গে। শুধু ভারতের সঙ্গে লাইন ডাউন ছিল। এটাও আমরা করিনি। আল্লাহ করেছেন। জেনারেল সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলার সময় কর্নেল রশিদ তাঁর কাছে ছিলেন।' ফারুক বলেন, 'টেলিফোনে খবর পেয়েই যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানি দূতাবাসের পতাকাবাহী গাড়ি ৩২ নম্বরের উদ্দেশে ছুটে এসেছিল। রাতের আঁধারে নয়, শেখ মুজিব মারা গেছেন প্রকাশ্যে, দিনের আলোয়। ভোর সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। আজ যারা "ইনডেমনিটি ইনডেমনিটি" করেন, সে আওয়ামী লীগ নেতারা সবই জানতেন।'

'শেখ মুজিবকে হত্যা ছাড়া আর কি কোনো বিকল্প ছিল না? আপনি এই চরম পথ বেছে নিলেন কেন?' কর্নেল ফারুক বলেন, '১৫ আগস্টের আগে ১৫ মাস এ নিয়ে আমি ভেবেছি। শান্তিপূর্ণ কোনো পথ খুঁজে পাইনি। ওই সময় বামপন্থীরাও তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। রক্তপাত ছিল অনিবার্য। আমি না করলে অন্য কেউ করত। এড়ানো যেত না।' কর্নেল ফারুকের বাসভবনে নেওয়া তিন ঘণ্টাব্যাপী এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমার পরিকল্পনার পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র নেই। আমিই এ ঘটনার একক নায়ক। ১২ আগস্টের আগ পর্যন্ত আমি, আমার স্ত্রী এবং চট্টগ্রামের হাফিজ (অন্ধ দরবেশ) ছাড়া অন্য কেউ জানত না। এ নিয়ে আসলে তৎকালীন সামরিক অফিসারদের কাউকে বিশ্বাস করার উপায় ছিল না।'

'আমার সামনে দৃষ্টান্ত ছিলেন লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন। জিয়াউদ্দিন একপর্যায়ে জিয়াউর রহমান, শওকত আলীর মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্মতিক্রমে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "সকলের ইচ্ছা আপনি এখন সরে দাঁড়ান।" পরে শেখ সাহেব যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, ওই অফিসাররা অস্বীকার করলেন। পরিণতিতে তাঁকেই চাকরি খোয়াতে হয়। ভায়রা বলেই কর্নেল রশিদকে দলে ভেড়াতে সাহস করেছিলাম।' ফারুক বলেন, 'শেখ মুজিবকে সুকর্ণর মতো বন্দী করে নির্বাচনের মাধ্যমে নয়া সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছি কিন্তু কোনো কূল পাইনি।' ফারুক বলেন, 'জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্টস্থ বাসভবনের চত্বরে বসে প্রস্তাব দেওয়ার পর তিনি আমাকে উৎসাহিত করলেন কিন্তু সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন না। পরবর্তী সময়ে

আমাকে একেবারেই এড়িয়ে চলেছেন। তাঁর এডিসিকে বলেছেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে কখনো দেখা না করি।' মেজর ডালিম সম্পর্কে ফারুক বলেন, 'ওদের কারও সঙ্গে আমার আদর্শগত ঐক্য ছিল না। মোশতাকের সঙ্গেও নয়। রশিদ তাঁকে ধরে এনে গদিতে বসিয়েছে। আমি আগে জানতামও না।' ফারুক বলেন, 'ডালিম যখন প্রথম রেডিওতে শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার ঘোষণা দেয়, তখনো তিনি জীবিত।'

ইনডেমনিটি বাতিল বিল সম্পর্কে কর্নেল ফারুক রহমান বলেন, 'আওয়ামী লীগের স্বার্থেই এটা পাস হওয়া উচিত নয়। এ বিল পাস হলে ইতিহাস থেকে শেখ মুজিবের নামের অবশিষ্টটুকুও মুছে যাবে। তাঁর দোষ-গুণ জনসমক্ষে এতে করে ব্যাপকভাবে প্রচার পাবে এবং তিনি ইতিহাসের নব মীর জাফর হিসেবে চিহ্নিত হবেন।' ফারুক বলেন, 'বিএনপি এই বিলে যদি সম্মতি দেয় তবে বাংলাদেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীর কাছে বিএনপি প্রো-ইন্ডিয়ান শক্তি হিসেবেই গণ্য হবে। এরশাদ শেষ পর্যায়ে আর্মির কাছে প্রো-ইন্ডিয়ান হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণেই তাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।' পঞ্চাশের দশক থেকে তাঁরা পারিবারিক দিক থেকে বামঘেঁষা এবং আওয়ামী লীগার ছিলেন, কখনো মুসলিম লীগার নয়, এ কথা উল্লেখ করে ফারুক রহমান বলেন, 'সোহরাওয়ার্দীর দর্শন থেকে আওয়ামী লীগ সরে এসেছে। আর ভারতের আমলাদের উপদেশে এখন তারা চলছে। দলীয় কর্মসূচি দেখে এটা মনে হয়। ইন্দিরা-রাজীবের মৃত্যুর পর ওদের কর্মসূচিতে রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধির বিলোপ ঘটেছে।' ফারুক বলেন, 'আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। একমাত্র হাসিনাই যা বাগড়া দিচ্ছেন।' 'যদি ইনডেমনিটি বাতিল বিল পাস হয়?' জবাবে ফারুক রহমান বলেন, 'আমি এখন উদ্বৃত্ত জীবন ভোগ করছি। যা-ই ঘটুক না কেন, আর যা-ই লেখেন না কেন, ইতিহাস একদিন আমাকে মূল্যায়ন করবে।'

বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৫ আগস্ট ১৯৯২

পরিশিষ্ট ৪

লরেন্স লিফশুলজের সাক্ষাৎকার

প্রথম আলো : অনেকে বলার চেষ্টা করেন যে, আপনি বামপন্থী বলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও কর্নেল তাহেরের হত্যাকাণ্ড আজ এত বছর পরও ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করছেন। অর্থাৎ একটি আদর্শিক বা বামপন্থী চিন্তা-বলয়ের মধ্য থেকে এ বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন।

লিফশুলজ : আমি একজন পেশাদার সাংবাদিক। ওই সময় আমি হংকং থেকে প্রকাশিত *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর* সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। তখনো যেমন, তেমনি আজও পেশাগত চেতনা থেকেই আমি বিষয়টিকে দেখছি।

প্রথম আলো : পঁচাত্তরে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টারের মৃত্যুর পর আপনি গত বছর তাঁর নাম প্রকাশ করেছেন। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে সিআইএর সম্পৃক্ততা প্রশ্নে তিনি ঠিক কী উক্তি করেছিলেন?

লিফশুলজ : আমার বইয়ে তা লেখা রয়েছে। 'একজন উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তা'র বরাতে তাঁর উদ্ধৃতির উল্লেখ দেখতে পাবেন।

প্রথম আলো : আপনাদের কথোপকথন কি রেকর্ডবদ্ধ হয়েছিল? বোস্টারকে কি আপনি আপনার 'ডিপথ্রট' মনে করেন?

লিফশুলজ : 'ডিপথ্রট' কথাটি আমার পছন্দ নয়। কারণ এটা একটা মন্দ মুভির নাম। আমি ডেভিস বোস্টারের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের লাউঞ্জে বসেছিলাম। আমার বন্ধু কাই বার্ড বিস্তারিত নোট নিয়েছেন এবং তা প্রকাশের আগে আমরা তাঁর [বোস্টারের] কাছ থেকে যাচাই করেও নিয়েছিলাম।

প্রথম আলো : আপনি মি. বোস্টারের সঙ্গে কতবার কথা বলেছিলেন?

লিফশুলজ : বাংলাদেশে আমার সঙ্গে তাঁর কয়েকবারই সাক্ষাৎ ঘটে। তবে

ওয়াশিংটনে ওই একবারই, সঙ্গী ছিলেন কাই বার্ড।

প্রথম আলো : আচ্ছা, সিআইএর একটি নাকি লিক্যুইডেশন লিস্ট (হত্যার তালিকা) ছিল, যাতে বঙ্গবন্ধু মুজিবসহ ১৩ জনের নাম রয়েছে। এটা নাকি কার্নেগি পেপারে মুদ্রিত রয়েছে?

লিফশুলজ : আমি কখনো এমন কিছু শুনিনি। আপনি এমন খবর কোথায় পেলেন?

প্রথম আলো : ঢাকার একজন আইনজীবী এমনটাই আমার কাছে দাবি করেছেন।

লিফশুলজ : তাঁর দাবি উদ্ভট। কার্নেগি পেপার তো শুধু ১৯৭১ সালের ঘটনাবলির মধ্যে সীমিত। সেখানে ১৯৭৫ আসবে কোত্থেকে।

প্রথম আলো : স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত দলিলগুলো অনেকটা যাচাই করে দেখেছি। কিন্তু কোথাও এমন কিছু পাইনি, যাতে প্রমাণিত হয় খন্দকার মোশতাক আহমদ কখনো কোনো মার্কিন কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আপনার কি এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়?

লিফশুলজ : আমি মোশতাকের লোকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাঁরা আমাকে যোগাযোগ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। কলকাতার তৎকালীন মার্কিন কনসালের সঙ্গে কাই বার্ডের নেওয়া সাক্ষাৎকারেও বিষয়টি এসেছে।

প্রথম আলো : না, আমি বলতে চেয়েছি, যোগাযোগ তো ছিলই। কিন্তু মোশতাক নিজেই সরাসরি কথা বলেছেন, তেমন কোনো দলিল আমি পাইনি।

লিফশুলজ : আমি নিশ্চিত নই যে আপনি অবমুক্তকৃত সব দলিলই দেখেছেন কি না। তা ছাড়া আমি যত দূর জানি, সিআইএর ফাইল কিন্তু প্রকাশ করা হচ্ছে না।

প্রথম আলো : ১৯৮০ সালের ৩ জুন সাবেক মার্কিন কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জ আপনাকে লেখা চিঠিতে বলেছেন, সিআইএর সম্পৃক্ততার ব্যাপারে তিনি কোনো 'হার্ড এভিডেন্স' (অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ) পাননি। আপনি কি এমন কোনো 'হার্ড এভিডেন্স' পেয়েছেন, যাতে প্রমাণ মেলে যে মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএ জড়িত।

লিফশুলজ : সিআইএর জড়িত থাকা বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন? 'হার্ড এভিডেন্স' কথাটার ব্যাখ্যা দিন। সিআইএর সম্পৃক্ততার ব্যাপারে আমি কী দাবি করেছি, বলুন? আপনি কি আমার এ-সংক্রান্ত লেখা পড়েছেন?

প্রথম আলো : দয়া করে আপনি আবার একটু খুলে বলুন।

লিফশুলজ : আমি এ ব্যাপারে যা বলেছি, সে সম্পর্কে আমি কিন্তু খুবই 'প্রিসাইজ' (যথাযথ)। কিন্তু আপনি খুব 'প্রিসাইজ' বা যথাযথ নন। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হলো, যে গ্রুপটি আগস্টের অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে তাদের সঙ্গে [সিআইএর] 'পূর্ব-যোগাযোগ' ছিল কি না। মোশতাকের চারপাশের বহু লোকের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের ১৫ আগস্টের আগে যোগাযোগ ছিল। এটাই আসল কথা।

প্রথম আলো : তাহলে সিআইএ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মোশতাক গ্রুপের অভ্যুত্থানপূর্ব আলাপ-আলোচনার দিকটিই কেবল আপনি নিশ্চিত করেছেন...

লিফশুলজ : তাঁদের মধ্যকার জানাশোনা ও পূর্বযোগাযোগ। আমি এমন একজন সিনিয়র দূতাবাস-কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করেছি, যিনি পরে রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন, আরও একজন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করেছি, যাঁর নাম আমি প্রকাশ করতে চাই না। তাঁরা আমাকে তাঁদের ওই যোগাযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, সিআইএ স্টেশন চিফকে (ফিলিপ চেরি) ওই যোগাযোগ ছিন্ন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রদূত বোস্টার নিজেই নির্দেশ দেন এবং ছয় মাস পর তাঁরাই প্রত্যক্ষ করেন যে অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে।

প্রথম আলো : আপনি কি মনে করেন না যে...

লিফশুলজ : সে কারণেই বলেছি, আপনার প্রশ্ন যথার্থ নয়। আপনি আজ প্রশ্ন করছেন, 'আপনি সিআইএর সম্পৃক্ততার ব্যাপারে কী "হার্ড এভিডেন্স" পেয়েছেন?' আমি কি আমার লেখালেখির কোথাও বলেছি, অভ্যুত্থানে সিআইএর সম্পৃক্ততার ব্যাপারে "হার্ড এভিডেন্স" রয়েছে?

প্রথম আলো : না, তা বলেননি।

লিফশুলজ : একজন সাংবাদিক যখন অত্যন্ত বিতর্কিত ইস্যুতে প্রশ্ন করবেন, তখন তাঁকে খুব সাবধানী, খুব 'প্রিসাইজ' ও খুব 'ফেয়ার' হতে হবে। আপনি তো সোলার্জের চিঠির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকেই নজর দেননি। সোলার্জের চিঠির সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে—মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাকে নিশ্চিত করেছে যে 'পূর্বযোগাযোগ' ছিল। সোলার্জের চিঠিতে এটাই 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি' (অসাধারণ) বিষয়। এটাই 'হার্ড এভিডেন্স'। সোলার্জের সঙ্গে পুরো যোগাযোগ থেকে এটাই বড় অর্জন।

প্রথম আলো : আচ্ছা।

লিফশুলজ : আপনার প্রশ্নের সবচেয়ে কৌতুককর অংশ হচ্ছে, আপনি সোলার্জের চিঠির আসল কথাটিই বিস্মৃত হয়েছেন। ইউজিন বোস্টার 'পূর্বযোগাযোগ' সম্পর্কে আমাদের প্রথমে যা বলেছিলেন, পরে সোলার্জের চিঠি তা-ই নিশ্চিত করেছে। এটাই 'এসেনশিয়াল' (অপরিহার্য)। এটাই 'ক্রুশিয়াল' (গুরুত্বপূর্ণ)। তাঁরা যদি মিথ্যা বলতেন যে, না এমন কোনো যোগাযোগ ছিল না, তাহলে একটা 'ট্রাবল' (ঝামেলা) সৃষ্টি হতো। সুতরাং তাঁদের স্বীকার করতে হয়েছে, পূর্বযোগাযোগ ছিল।

প্রথম আলো : ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা বলুন তো, আপনি *প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার*-এ গত বছর যে নিবন্ধ লিখলেন, তার তো প্রতিবাদ এসেছে। বোস্টারের ছেলে বলেছেন, 'না, বাবা এমন কিছু লিফশুলজকে বলেননি।'

লিফশুলজ : মি. বোস্টারের জ্যেষ্ঠ ছেলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ ছেলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। *প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার*-এ প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলে। আমার মনে হয়, এ নিয়ে আর কিছু না বলাই ভালো। আমি মনে করি না, এই বিষয়ে মি. বোস্টারের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, সে ব্যাপারে তাঁর

ওই ছেলের কোনো ধারণা রয়েছে। তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে (ড. জেমস বোস্টার) এ ব্যাপারে অধিকতর অবগত।

আমি জানি না, *প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার*-এ আমার লেখার সঙ্গে প্রকাশিত নোটে কে এটা লিখেছিলেন যে বোস্টারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ জানাশোনা ও খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আপনারা যেভাবে নিবন্ধটি উপস্থাপন করেছেন, তাতে একটি 'হাইপ' সৃষ্টি হয়েছিল।

আপনারা ভুলভাবে বোস্টারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। বোস্টারের ছেলের চিঠি আপনাদের কাছ থেকে পাওয়ার আগেই কিন্তু আমি এ ব্যাপারে সম্পাদক মি. মতিউর রহমানের কাছে চিঠি লিখেছিলাম।

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের তদন্তে মার্কিন প্রশাসনের তরফে এবং তাদের গরজে কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করা কি আর সম্ভব? আপনি কি মনে করেন, সোলার্জ একটি কংগ্রেশনাল কমিটি গঠনে সম্ভব সব চেষ্টাই করেছিলেন?

লিফশুলজ : সোলার্জের সঙ্গে আমি ২০০০ বা ২০০১ সালের শেষাশেষি দেখা করেছিলাম। তিনি তখন কংগ্রেসের বাইরে। আমি তখন তাঁর এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁকে দেখালাম। বললাম, 'দেখুন, তদন্তের জন্য আপনি যে চিঠি সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাতে আপনারই সই নেই।'

প্রথম আলো : তাঁর বরাতে প্রেরিত চিঠিতে তাঁরই সই নেই!

লিফশুলজ : আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি তো সই করেননি।' এর কারণ হলো, তাঁর সঙ্গে যে লোক এসব কাজের জন্য নিয়োজিত ছিলেন, তিনি আমার নিবন্ধে বর্ণিত চরিত্রগুলোর অন্যতম। তবে আমি এ বিষয়ে নজর রাখছি। ভবিষ্যতে এদিকে আরও সময় দেব।

প্রথম আলো : প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা হেনরি কিসিঞ্জারের [একাত্তরে নিক্সনের উপদেষ্টা ও পঁচাত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন] কাছ থেকে 'শান্তি পুরস্কার' নিয়েছেন। আপনার কোনো মন্তব্য?

লিফশুলজ : আমার মনে হয়, এ প্রশ্ন আপনার শেখ হাসিনাকেই করা উচিত। 'আই ওয়াজ শকড' (আমি ব্যথিত হয়েছিলাম।) তবে আমি জানি না, তিনি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্ন রাখতে চেয়েছিলেন কি না—'মি. হেনরি কিসিঞ্জার, আমার মনে আজও জিজ্ঞাসা, অভিযোগ রয়েছে, যে গ্রুপটি আমার পিতাকে সপরিবারে নিশ্চিহ্ন করেছে, তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পূর্ব-জানাশোনা ও যোগাযোগ ছিল, আপনি কি তা স্বীকার করেন?'

প্রথম আলো : আপনি সম্ভবত জানেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার এন্ড্রু ও সপক্ষত্যাগী কেজিবি এজেন্ট ভাসিলি মিত্রখিনের নতুন বই বেরিয়েছে...

লিফশুলজ : কোন পর্ব সম্পর্কে বলছেন?

প্রথম আলো : মিত্রখিন আর্কাইভ-টু : *কেজিবি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড*।

লিফশুলজ : তো, কী আছে তাতে?

প্রথম আলো : এটা আমাদের কাছে দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক। আমি আপনাকে বইটির ৩৫১ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি: '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পরপরই ঢাকার কেজিবি মিশন সর্বাত্মক অপপ্রচারে নেমে পড়ে যে, এর পেছনে সিআইএর মদদ রয়েছে।'

লিফশুলজ : (হেসে) আপনি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?

প্রথম আলো : না, আমি কিন্তু কিছুই...

লিফশুলজ : আমি আমার বইয়ে এ ব্যাপারে লিখেছি, অনেকেই অভ্যুত্থানের পরপরই দাবি করেন যে সিআইএ এর সঙ্গে জড়িত। আমি গোড়াতে এর সঙ্গে কোনো মার্কিন-সংশ্লিষ্টতা দেখতেই রাজি ছিলাম না। এটাকে প্রচারণা হিসেবেই উপেক্ষা করেছিলাম। আরও স্মরণ করুন, মুজিব আমলে আমার লেখালেখির কারণেই *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ* বাংলাদেশে তিনবার নিষিদ্ধ হয়েছিল। দক্ষিণ এশীয় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ভারত তো আমাকে ভিসা দিতেই প্রায় বেঁকে বসেছিল। (হেসে) আপনি কি বলতে চাইছেন যে আর্কাইভের ভাষ্য অনুযায়ী কেজিবি আমাকে প্ররোচিত করেছিল?

প্রথম আলো : না না, প্রশ্নই আসে না। এমন চমকপ্রদ তথ্য সম্পর্কে নেহাত আপনার মন্তব্য শোনার আগ্রহ থেকেই—

লিফশুলজ : আমাকেও কিন্তু একদা পাকিস্তান সরকার ও কেজিবি কর্তৃক অপবাদের শিকার হতে হয়েছিল। আমি কারোরই এজেন্ট ছিলাম না, স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করেছি।

প্রথম আলো : কিন্তু আমাদের যা বিস্মিত করে তা হলো, সিপিবি নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত করেছেন যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সোভিয়েত পার্টি তাঁদের বলেছে, এই অভ্যুত্থানে সিআইএর যোগসাজশ ছিল না।

লিফশুলজ : 'পূর্বযোগাযোগ' সম্পর্কে কেজিবি জানত না। তাদের নিশ্চয় সবকিছুই জানা ছিল না। এসব অঞ্চল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। এ ছাড়া সাংবাদিকতায় যেমন বহু 'স্টুপিড' রয়েছে, তেমনি গোয়েন্দাদের মধ্যেও প্রচুর 'স্টুপিড' রয়েছে। এনএসআই, ডিজিএফআইতে অনেক মেধাবী গোয়েন্দা ছিল কিন্তু তাঁরাও কি সবকিছু জানতেন?

প্রথম আলো : বাংলাদেশের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হলো কেমন করে? কীভাবে কখন এলেন এ দেশে?

লিফশুলজ : আমি নিউ ইয়র্ক শহরের বাইরের একটি গ্রামে বড় হয়েছি। যখন স্কুলে পড়ি, তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে আমার চারপাশের জগৎ আলোড়িত এবং তরুণদের মধ্যে আমরা অনেকেই ভাবতাম, যুদ্ধ সম্পর্কে আমেরিকান সরকার সত্য বলছে না। সেটা ছিল ১৯৬৮ সাল। আমি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ বৃত্তিলাভের আশায় আবেদন জানাই। ওই বৃত্তির নিয়ম ছিল—বৃত্তিধারীকে তৃতীয় বিশ্বের কোনো একটি দেশে যেতে হবে। এ সময় ইয়েলে আমার সঙ্গে এমন একজন

অধ্যাপকের সাক্ষাৎ ঘটল, যিনি ১৯৬৭ সালে ভারতের বিহারে দুর্ভিক্ষকালে সেখানে ছিলেন। তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণকে সাহায্য করতে শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করে বিহারে ছুটে গিয়েছিলেন। সেবার ৪০০ আবেদন পড়েছিল। আট বা নয়জনকে বাছাই করা হলো।

প্রথম আলো : এবং আপনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।

লিফশুলজ : আমি তাঁদেরই একজন। ১৯৬৯ সালে ভারতে গেলাম। ১৭-১৮ বছর বয়সে আমি আমার চাচার খামারে কাজ করেছি। পশুপালন ও কৃষিতে আমার বেজায় আগ্রহ। ভারতে এসে আমি হিন্দি শিখলাম। ভারতীয় কৃষি, বীজ প্রযুক্তি, সেচব্যবস্থা, সবুজ বিপ্লব—এ সবই হয়ে উঠল আমার জানার বিষয়। বিহারে আমার প্রচুর বন্ধু জুটেছিল।

প্রথম আলো : কখন প্রথম ঢাকায় এলেন?

লিফশুলজ : ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মে আমি ভারত ত্যাগ করি। কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে পৌঁছাই। যশোর থেকে সড়কপথে ঢাকায় আসি। সময়টা জুলাই-আগস্ট হবে। একদিন অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম কিনতে বের হলাম। নিউ মার্কেটের একটি ওষুধের দোকানে গেলাম। 'হাই-হ্যালো'র মধ্য দিয়ে একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর নামের প্রথম অংশ নুরুল। পুরো নাম মনে নেই। চমৎকার ভদ্রলোক। কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে ভাব হলো।

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আপনার কীভাবে সাক্ষাৎ হলো?

লিফশুলজ : আমার বন্ধু নুরুলই তার অনুঘটক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার বহু বছর যোগাযোগ নেই। ফের এসে সাক্ষাতের চেষ্টা করব। তো, আমি নিয়মিত তাঁর মোটরসাইকেলের পেছনের আরোহী হলাম। তিনি একদিন আমাকে বললেন, 'একজন আপনাকে সাক্ষাৎ দিতে সম্মত হয়েছেন। তিনি ভারি চমৎকার মানুষ।' আমি জানতাম না তিনি কে হতে পারেন। অতঃপর তাঁর মোটরবাইকের পেছনে চেপে বসলাম। আমার বয়স তখন কুড়ি। ধানমন্ডির একটি বাড়ির গেটে পৌঁছে আমরা বাইক থেকে নামলাম। নুরুল কারও সঙ্গে কথা বললেন। অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনুমতি মিলল। আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম এবং আমি সেখানে প্রথম শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখলাম।

প্রথম আলো : একটু বিস্তারিত বলুন। আপনার সঙ্গে কী কথা হলো?

লিফশুলজ : নুরুল আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, আমি ভারতেই বাস করছি। কাজ করছি জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে। এরপর তিনি চলে গেলেন। আমরা মুখোমুখি হলাম। আমাদের সেই কথোপকথন ছিল প্রীতিপূর্ণ। চা এল। সম্ভবত সময়টা দুপুরের খাওয়ার সময় ছিল। মুজিবের সঙ্গে দুপুরের খাবারটাও খেয়ে নিলাম। এরপর তিনি আমার কাছে নানা বিষয়ে জানতে চাইলেন।

প্রথম আলো : এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ...

লিফশুলজ : কয়েকটি বিষয় আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। তিনি ভারত সম্পর্কে অনেক কিছুই প্রশ্ন করলেন। বিশেষ করে, গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে। বিহারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা, যার সঙ্গে আমিও সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমরা সমাজতন্ত্র নিয়ে কথা বলেছিলাম। একপর্যায়ে আমি তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখলাম, ঠিক কী ধরনের সমাজতন্ত্র তাঁর পছন্দ? আমি স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি, তিনি আমাকে বলেছিলেন, সুইডিশ ধরনের সামাজিক গণতন্ত্র তাঁর পছন্দ। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এটা ভেবে যে পূর্ব পাকিস্তানে তা কী করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কারণ, তখন সামরিক সরকার এবং চারদিকে আরও কত সমস্যা।

প্রথম আলো : কতক্ষণ স্থায়ী ছিল আপনাদের সেই বৈঠক?

লিফশুলজ : প্রায় এক ঘণ্টা। আমাদের সেই বৈঠক ছিল খুবই সৌজন্যমণ্ডিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, এতটুকু অহংকার ছিল না। বড় দিলদরিয়া একজন মানুষকে দেখেছিলাম। তিনি যে খুবই উঁচু মাপের মানুষ, আলোচনাকালে এমন ধারণা আমি পাইনি। প্রথম সাক্ষাতের আগে আমি তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকুই জানতাম যে তিনি আওয়ামী লীগের নেতা। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে আওয়ামী লীগের তেমন পরিচিতি ছিল না।

প্রথম আলো : আর কোনো কথা?

লিফশুলজ : আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমার হয়তো সামান্যই জানা ছিল যে বহু বছর পর একজন রিপোর্টার হিসেবে তাঁর জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে আমি আমার জীবনকে এভাবে জড়িয়ে ফেলব।

প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০০৬

পরিশিষ্ট ৫

মুজিব-কিসিঞ্জার সংলাপ

৩০ অক্টোবর ১৯৭৪, সময় : বিকেল সাড়ে পাঁচটা, ঢাকা

বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন, পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুস, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক সচিব ড. এম আবদুস সাত্তার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আবদুল বারী।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত : পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার, রাষ্ট্রদূত বোস্টার, সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আথারটন, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (এনএসসি) রবার্ট অ্যান্ডারসন।

কিসিঞ্জার : আপনি খুবই অতিথিপরায়ণ। আপনাদের অতিথিশালাটি খুবই আরামদায়ক ও মনোরম। আজ অপরাহ্নে আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি। আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে, এমন যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারলে আমি খুবই আনন্দিত হব। আমরা আন্তর্জাতিক বিষয় পর্যালোচনা করেছি। এবং যেসব বিষয়ে আমরা কাজে আসতে পারি, সেসব বিষয় সম্পর্কে আমি ইঙ্গিত দিয়েছি। বাংলাদেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের বিষয়গুলো আমাদের মনে বিশেষ স্থান নিয়ে আছে।

শেখ মুজিব : এসব বিষয়ে আমাদের অবস্থান আপনার জানা আছে। আপনাদের কার না বিষয়গুলো জানা? আমি হয়তো উপমহাদেশের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

কিসিঞ্জার : সেটা তো আমার জন্য খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

শেখ মুজিব : আমি আর অতীতবৃত্তান্ত নিয়ে বেশি দূর যেতে চাই না। আপনি যদি আমাদের স্বাধীনতা-পূর্ব ইতিহাসের দিকে তাকান তাহলে আপনি দেখবেন,

পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার ৭৫ শতাংশ আয় করত পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালে আমি জাতীয় গণপরিষদের সদস্য ছিলাম। আপনি সেই পটভূমি জানেন।

কিসিঞ্জার : তখন জনসংখ্যা কত ছিল?

শেখ মুজিব : ১৯৪৭ সালে এই এলাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ মিলিয়ন। না, আমি আমাদের সমস্যার পেছনে যেতে চাই না। কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি পাকিস্তানে নয়, এই বাংলার মাটিতেই ঘটেছে। ভুট্টো যখন এই গ্রীষ্মে এখানে এসেছিলেন তখন আমি কিছু নিদর্শন তাঁকে দেখিয়েছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি তাঁকে জেনারেল ফরমান আলীর একটি আদেশ দেখাই। তিনি লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের সবুজ ভূখণ্ড অবশ্যই লাল করে দিতে হবে।' এটা ছিল তাঁর সৈন্যদের প্রতি একটি নির্দেশনা। আমি সেটা ভুট্টোকে দেখিয়েছিলাম।

আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানিরা উদারতা দেখাবে। কিন্তু আপনার কাছে সত্যি স্পষ্ট করে বলতে চাই, পাকিস্তান কেবল আমাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কই চেয়েছে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা আমাদের অংশ পালন করেছি। আমরা সব যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু এরপর যখন আমরা সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে কথা বলতে বসলাম, তখন তারা কিছুই বলল না। আমরা তাদের কাছ থেকে সম্পদের বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কোনো আশ্বাসও দাবি করিনি। আমরা চেয়েছিলাম, তারাই বলুক এ বিষয়ে তারা আমাদের জন্য কীভাবে কতটুকু করতে পারে। কিন্তু ভুট্টো যখন ঢাকায় এলেন, তখন তিনি কোনো কিছু সম্পর্কেই রাজি হলেন না। তিনি কেবল কূটনৈতিক সম্পর্কের কথাই বললেন।

আমি সাড়ে সাত কোটি মানুষ পেয়েছি, যাদের কিছুই নেই। আমি পাকিস্তানিদের কাছ থেকে কিছুই পাইনি। তাদের উড়োজাহাজ রয়েছে, জাহাজ রয়েছে, রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়।

কিসিঞ্জার : নিউ ইয়র্কে আমাদের সবশেষ বৈঠকের পর আজিজ আহমাদের [পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী] সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি দায়দেনার হিস্যা বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

শেখ মুজিব : কিন্তু আমি তো ইতিমধ্যেই বহু প্রকারের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছি। ঋণদাতাদের সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই একটি চুক্তি করেছি। কিন্তু তার পরও সম্পদের বিষয়ে আমি কেন কিছু নিশ্চয়তা পাব না?

এরপর আসে বিহারিদের প্রশ্ন। এই জনগোষ্ঠী পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। আর এখন পাকিস্তান তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আমি জানি, বিহারিদের ফেরানোর বিষয়ে করাচিতে সমস্যা আছে। কিন্তু তাদের পাঞ্জাবে পুনর্বাসিত করতে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। আমার ভূমি নেই, আছে সাড়ে সাত কোটি মানুষ। অন্য দেশগুলো আমাদের সহায়তা দেওয়ার আগ পর্যন্ত তারা কী করবে?

কিসিঞ্জার : তারা কি এখন শিবিরে রয়েছে?

শেখ মুজিব : এক প্রকার সেটাই বলতে পারেন। তাদের আমাদের রেশন দিতে হচ্ছে। তাদের মধ্যে যাঁরা বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছেন, তাঁরা এখানে থাকতে পারেন। আমি তাঁদের চাকরির ব্যবস্থাও করেছি।

কিসিঞ্জার : তারা যদি চায়, তাহলে কি আপনি বিহারিদের পারমিট দেওয়ার প্রস্তাব করছেন?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, তাদের মধ্যে চার লাখ। কিন্তু আরও তিন লাখ পাকিস্তানকে বেছে নিয়েছে। আমার প্রশ্ন তাদের নিয়েই।

আমার অন্তরে কোনো ঘৃণা নেই। কারও সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই। আমি শান্তি চাই। আমি এটা বলতে পারি না যে, অন্য দেশগুলো আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য সহায়তা দিয়ে যাবে।

আমি ৫ হাজার ৩০৩টি রান্নাঘর বসিয়েছি। প্রতিদিন এক লাখ লোককে খাবার দিই। আমাদের সমস্যা খুবই জটিল। উপরন্তু এই বছর বন্যা হওয়ায় পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে।

কিসিঞ্জার : অবশ্যই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বাস্তবতা। যেমনটা আপনি বর্ণনা করলেন। আন্তর্জাতিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আজ অপরাহ্নে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। যেসব বিষয় নিয়ে আপনি কথা বললেন, এর মধ্যকার কিছু বিষয় নিয়ে আমি কি ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

শেখ মুজিব : সেটা করলে আমি খুবই আনন্দিত হব। কিন্তু কেউ একজন শুধু আলোচনাই চালাতে পারেন না। তার উচিত সহায়তা দেওয়া। তাদের তো জানা উচিত, মানুষ এখানে মরছে। তাদের জমি আছে এবং তারা সহায়তা দিতে পারে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এ সমস্যায় ভুগছি। বড় নদীগুলোর বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের রয়েছে যৌথ নদী কমিশন।

কিসিঞ্জার : কী কারণে বন্যা হয়, এর জন্য দায়ী কি নদী না সমুদ্র?

কামাল হোসেন : এই সমস্যার দুটো দিক রয়েছে। এ বছর বন্যার কারণ নদী। কিন্তু ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের কারণ ছিল সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসা জলোচ্ছ্বাস।

শেখ মুজিব : আমরা যদি কেবল নদী নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে তা খুবই সহায়ক হয়। বাঁধ নির্মাণ ও ছোট প্রকল্প এর সহায়ক। পাঁচ বছর আমরা যদি আমাদের সম্পদ ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা খাদ্যসমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব। অবশ্যই এর সঙ্গে দরকার হবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা।

কিসিঞ্জার : আপনি কি বঙ্গোপসাগর থেকে নতুন জমি পান?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, আগামী বছর একটি এলাকায় আমরা প্রায় ২০০ বর্গমাইল জমি পাব।

কিসিঞ্জার : চাষাবাদের জন্য আপনি কি সেখানে লোকজন পুনর্বাসিত করতে পারবেন?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, আমাদের তা অবশ্যই পারতে হবে। আপনারা আমাদের এখন যে দেড় লাখ টন খাদ্যশস্য এবং অতিরিক্ত আরও এক লাখ টন সরবরাহ করছেন সে জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

কিসিঞ্জার : বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সেটা খুবই দরকারি।

শেখ মুজিব : আমাদের আরও এক বা দুই বছর খাদ্যসহায়তা লাভের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমার দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে দরকার ব্যাপক সহায়তা। আমাদের শিল্পের জন্য দরকার কাঁচামালের সহায়তা। আমরা আমাদের পাটের জন্য ভালো দাম চাই।

কিসিঞ্জার : মনে হচ্ছে, আপনি সব দিক থেকেই সমস্যা মোকাবিলা করছেন।

শেখ মুজিব : জাপানি সহায়তায় আমরা এখন একটি সার কারখানা নির্মাণ করছি। আমাদের সার কারখানাগুলো সচল করতে জাপান ও যুক্তরাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞরা আসছেন। তাঁরা, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত একটি কারখানা পরিদর্শন করবেন। আমরা এ জন্য কাউকে দায়ী করি না। জাপানিদেরও নয়। কারণ, তাঁরা আমাদের ভালো বন্ধু। যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞরাও আমাদের সাহায্য করবেন। কিন্তু তাঁরা তা না করা পর্যন্ত আমাদের মাশুল দিতে হবে।

আমরা ইউরিয়া উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি। আমরা ভারতের কাছ থেকেও সার কারখানা নির্মাণে কিছু সহায়তা পেয়ে আসছি।

বোস্টার : এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রও সাহায্য করছে। আশুগঞ্জ সার কারখানার জন্য ৩০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়া হয়েছে।

কিসিঞ্জার : আসলে খাদ্য উৎপাদন সমস্যা মোকাবিলার এটাই সত্যিকার উপায়। আমরা এবং অন্যরা সাহায্য দিতে পারি, কিন্তু আসল কাজটা আপনার দেশকেই করতে হবে।

শেখ মুজিব : আমরা অলসভাবে বসে নেই। আমরা আমাদের জমিতে খাদ্য উৎপাদন করছি। খাদ্যমজুত গড়ে তুলতে একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য ক্রয় কর্মসূচি চালু করেছি।

কিসিঞ্জার : আপনারা কি খাদ্যমজুত গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন?

শেখ মুজিব : জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমাদের খাদ্যের মজুত গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কামাল হোসেন : এটা আসলে কালোবাজারি রোধের একটি ব্যবস্থা।

কিসিঞ্জার : আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এর আগে বলেছি, আগামী সপ্তাহে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে আমি একটি উল্লেখযোগ্য ভাষণ দিতে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের খাদ্যসমস্যার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরব। এরপর আমাদের সরকারের মধ্যে খাদ্য বিষয়ে আরও গোছালো ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হব। আমাদের আসলে যেটা

বেশি প্রয়োজন, তা কেবল খাদ্যসাহায্য দেওয়া নয়। হয়তো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রযুক্তি ও সার সহায়তা দেওয়া, যাতে অন্য দেশগুলো অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। রাষ্ট্রদূত বোস্টার আমার বক্তব্যের পর এ বিষয়ে কথা বলবেন।

শেখ মুজিব : দুর্ভাগ্যবশত আমরা চীনাদের কাছ থেকে কোনো সহায়তা বা স্বীকৃতি পাচ্ছি না।

কিসিঞ্জার : কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এটা আপনারা পাবেন।

শেখ মুজিব : আমরা অপেক্ষমাণ। সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী।

কিসিঞ্জার : পাকিস্তান আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তারা হয়তো অপেক্ষা করতে পারে।

শেখ মুজিব : সেটা হতে পারে। তারা বড় শক্তি এবং এটা তাদের ওপর নির্ভর করছে।

দুর্ভাগ্যবশত আমার বহু লোক প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। এর জন্য অংশত দায়ী পাকিস্তান। কারণ, তারা আমার কাছ থেকে সবকিছুই নিয়ে গেছে।

পাকিস্তান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভালো সম্পর্কে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আপনারা প্রত্যেকেরই বন্ধু হতে পারেন। চীনও তার ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কিসিঞ্জার : আপনি যে ভালো সম্পর্ক গড়ার কথা বললেন, তা কি আমি চীনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

শেখ মুজিব : অবশ্যই। আমি চৌ এন লাইকে জানি। তিনি একসময় ঢাকায় এসেছিলেন। এবং পাকিস্তান থেকে একটি প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে আমি চীন সফর করেছিলাম। সেটা ১৯৫৭ সালে। আমি ১৯৫২ সালেও চীনে গিয়েছিলাম। চৌ এন লাই এসেছিলেন ১৯৫৬ সালে। সেই সময় চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটা ছিল এক টার্নিং পয়েন্ট বা নতুন মোড়।

কিসিঞ্জার : সত্যিই সেটা ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমি কখনো ভাবতেই পারিনি যে, সেই সময় পাকিস্তান ও চীন অতটা ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছাবে।

শেখ মুজিব : চৌ এন লাই যখন প্রথম পাকিস্তান সফরে আসেন, তখন তিনি খুবই ভালো অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন।

কিসিঞ্জার : আমি এর আগে আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি যে আমি ভাবতাম, চীনারা এখানে খুবই ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ওয়াশিংটনে আপনার সঙ্গে তাঁর বৈঠকের খুবই প্রশংসা করেছেন। আপনি তাঁকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছেন।

শেখ মুজিব : আমি তাঁকে খুব পছন্দ করেছি। তিনি ছিলেন খুবই খোলামেলা।

কিসিঞ্জার : ওই বৈঠকের পর তিনি আমাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন, বাংলাদেশকে খাদ্যসাহায্য দিতে আমরা কতটা কী ভূমিকা রাখতে পারি তা দেখতে।

শেখ মুজিব : অনুগ্রহপূর্বক তাঁকে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা পৌঁছে দেবেন। বাংলাদেশে তাঁকে স্বাগত। তিনি যখন ভারত যাবেন, তখন তিনি এখানে আসতে পারেন।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, তিনি ভারতে আসতে পারলে তখন তিনি এখানেও আসতে পারেন। তবে আমরা মনে করি না যে, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই ভারতের অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন রয়েছে।

শেখ মুজিব : সেটা ঠিক। আপনি যখন বাংলাদেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন, তখন আমাদের সঙ্গেই তা করেন। সেখানে তো অন্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমরা যেসব লঙ্গরখানা স্থাপন করেছি, আমরা তা আপনাকে দেখাতে চাই। আমার জনগণ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে, পশুরাও মরছে। আমাকে আমার জনগণকে খাওয়াতে হবে এবং তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে। আমাদের পুনর্বাসন-প্রক্রিয়ার এটাই বড় অগ্রাধিকার। আমরা খুবই মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি।

কিসিঞ্জার : আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের আর খাদ্য উদ্বৃত্ত নেই। পাঁচ বছর আগে এটা ছিল। তখন আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ারও অবস্থানে ছিলাম। এখন আমাদের কোনো প্রাক্কলন তৈরি করার আগে প্রত্যেক বছরের খাদ্য উৎপাদন দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

শেখ মুজিব : আমি জানি, এ ক্ষেত্রে আপনাদের বিরাট সমস্যা আছে।

কিসিঞ্জার : কিন্তু আমাদের কাছে বাংলাদেশ খুবই বড় মাপের অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

শেখ মুজিব : পাকিস্তান আমাদের কোনো সাহায্য দিচ্ছে না। তারা আমাদের কোনো জাহাজ কিংবা তাদের মজুতের হিস্যা দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করেছি।

কিসিঞ্জার : অবশ্যই আপনি আপনাদের অবস্থান উন্নত করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখিয়েছেন।

শেখ মুজিব : আমরা তিন বছরে কিছুটা কাজ করেছি। আমরা যোগাযোগব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করেছি, সড়ক ও সেতু মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ করেছি। চাষাবাদ শুরু করেছি। আমরা কিছুটা হলেও করতে পেরেছি!

কিসিঞ্জার : আমি তা জানি এবং বিশ্ব মুদ্রাস্ফীতি আপনাদের জন্য কাজ করা আরও কঠিন করে তুলেছে।

শেখ মুজিব : আপনি কি একটু চা পান করবেন? কলা?

কিসিঞ্জার : আমি ওজন কমাতে সচেষ্ট রয়েছি।

শেখ মুজিব : পাকিস্তানিরা আমার কলাগাছগুলোও ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

কিসিঞ্জার : কোনোভাবে কি আপনাদের জলবায়ুতে পরিবর্তন ঘটেছে?

শেখ মুজিব : আমি তা জানি না, তবে এই গ্রীষ্মে যে বন্যা হলো তাতে আমরা মারাত্মক সমস্যা মোকাবিলা করেছি। ১৭টি জেলা পানির নিচে গিয়েছিল। আমার রয়েছে খুবই উর্বর জমি। আমরা তাতে গম ও ধান জন্মাতে পারি এবং এই বছর চিনিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছি।

কিসিঞ্জার : সাহায্যের বিষয়ে আমাদের কংগ্রেসকে নিয়ে আমরা সমস্যায় রয়েছি। আগামী বৃহস্পতিবার আমাদের কংগ্রেস নির্বাচন। অবশ্যই আমি এ রকমটা অনুমান

করি না যে, ১৯৭০ সালে আপনি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন, তেমন কিছু আমাদের প্রশাসন করায়ত্ত করতে সক্ষম হবে।

শেখ মুজিব : খুব বেশি আসন পেতে যাবেন না! আমি যখন তা পেয়েছিলাম, তখন কী ঘটেছিল তা তো আপনি জানেন। পাকিস্তানিরা এল, ধ্বংস হলো আমাদের দেশ এবং তারা আমাকে গ্রেপ্তার করল। আমার পাঁচ বছরের সন্তান ঠিকই বুঝেছিল। পরে সে আমাকে বলেছে, 'তুমি আর কখনো নির্বাচনে দাঁড়িয়ো না!' আমার দেশ জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, গৃহযুদ্ধ ও সর্বাত্মক যুদ্ধকবলিত হলো। এ সবই আমি নির্বাচনী ফলাফল হিসেবে পেয়েছি!

কিসিঞ্জার : আমি ধারণা করি, এর অর্থ এই নয় যে, আপনি ক্ষণকালের জন্যও কখনো নির্বাচন এড়াতে চেয়েছিলেন! আমার নিজের ইচ্ছা এবং প্রেসিডেন্ট ফোর্ডও তা-ই মনে করেন যে, বাংলাদেশকে আমাদের সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়া উচিত। খাদ্যের বিষয়ে আমি অনেকটাই নিশ্চিত করে বলতে পারি, ১৯৭৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অধিকতর সহায়তা দিতে সক্ষম হব।

শেখ মুজিব : দয়া করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলোও ভুলে যাবেন না। আমরা যাতে অধিক খাদ্য ফলাতে পারি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের এক কঠিন সমস্যা।

কিসিঞ্জার : সেটা সর্বত্র ঘটছে।

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, কিন্তু আপনার জনগণ শিক্ষিত। আমাদের জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই। আমরা এক সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং তা এর সহায়ক হবে। আমি চার দিনের সফরে মিসর যাব বলে আশা রাখি।

কিসিঞ্জার : একই সময়ে আমিও হয়তো সেখানে থাকতে পারি। রাবাতে কী ঘটছে তা আমি জানার চেষ্টা করছি।

শেখ মুজিব : আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন।

কিসিঞ্জার : আমি সাদাতকে পছন্দ করি। আপনি?

শেখ মুজিব : খুবই পছন্দ করি।

কিসিঞ্জার : আপনি কি আসাদকে পছন্দ করেন?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, তাঁকেও আমার পছন্দ। তিনি একজন চৌকস ব্যক্তিত্ব।

কিসিঞ্জার : এটা তো নয় যে, বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের কোনো রং নেই!

শেখ মুজিব : আমরা একটা দীর্ঘ সংগ্রাম পেছনে ফেলে এসেছি। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। পাকিস্তানিরা দুবার আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি জীবিত ফিরে এসেছি। আপনার সরকার সাহায্য করেছিল।

কিসিঞ্জার : আমরা যদিও চাপ সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু আমরা জানতাম না ঠিক কোথায় আপনাকে তারা রেখেছিল। আমরা আপনার বিষয়ে অনেক চিঠিপত্র দিয়েছি।

শেখ মুজিব : আমাকে যদি হত্যা করা হতো তাহলে তখন বাংলাদেশের মাটিতে থাকা ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের জীবন অনতিবিলম্বে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতো।

কিন্তু আমি এ সবকিছুই ভুলে গেছি। আমি এই উপমহাদেশে শান্তি চাই; ঠিক জার্মানিতে আপনারা যুদ্ধ শেষে যেমন করেছেন। আমরা পাকিস্তানকেও সহযোগিতা করতে চাই।

কিসিঞ্জার : তাহলে তাদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ইস্যু হলো সম্পদ এবং বিহারি প্রত্যাবাসনের প্রশ্ন?

শেখ মুজিব : আর কিছুই নয়। পাকিস্তানের ওপরই নির্ভর করছে সব। আমার হাতে কিছুই নেই। ভুট্টো জানেন, পাকিস্তান আমাদের ওপর কী করেছে। আমি তাঁকে প্রমাণ দেখিয়েছি। জেনারেল ফরমান আলী তাঁর এক আদেশে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের সবুজ ভূমিকে লাল করে দাও।'

কিসিঞ্জার : ভুট্টো কী বললেন?

শেখ মুজিব : তিনি বিস্মিত হলেন এবং এই কক্ষে উপস্থিত সবাইকে তা প্রদর্শন করলেন।

কিসিঞ্জার : আজিজ আহমাদ নিউ ইয়র্কে আমাকে বলেছিলেন, কেবল সম্পদ নয়, দায়দেনার হিস্যা নিতে, তিনি আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন।

শেখ মুজিব : কিন্তু আমি তো তা করেছি। পাকিস্তান আমলে শুরু হওয়া সব প্রকল্পই আমরা বাংলাদেশে গ্রহণ করেছি। আর সবকিছুই তো পাকিস্তানে।

কিসিঞ্জার : আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানকে অনগ্রসর রাখতেই কি পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে ওই নীতি গ্রহণ করেছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, আমরা ২৫ বছর উপনিবেশ ছিলাম! এবং সেটা ব্রিটিশ আমলের ২০০ বছরের শাসনের ওপরই বর্তাবে।

কিসিঞ্জার : আপনারা যে স্বাধীনতা চান সে সিদ্ধান্ত কখন নিলেন। প্রথমেই নিশ্চয়ই নয়, সেটা আমি বুঝতে পারি। আপনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন!

শেখ মুজিব : অবশ্যই। আইয়ুব তাঁর গোলটেবিল বৈঠকের সময় সেই প্রস্তাবই আমাকে দিয়েছিলেন। আমি দীর্ঘকাল ধরে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলাম।

কিসিঞ্জার : পাকিস্তান কি তার চলমান রাজনৈতিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?

শেখ মুজিব : সামরিক বাহিনী তা চায় না। সেনাবাহিনী এসেছে পাঞ্জাব থেকে। তারা বেলুচদের দাবিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু ভুট্টো একজন রাজনীতিবিদ এবং তিনি সেভাবেই তা মোকাবিলার চেষ্টা করবেন। আমি আশা করি, তিনি তা করবেন।

আমি সব যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছিলাম, কারণ আমি ভুট্টোকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। আমি সেটা ভেবেচিন্তে (intentionally) করেছিলাম। আমি যদি তখন তা না করতাম, তাহলে সামরিক বাহিনী আবার পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসত।

কিসিঞ্জার : সেটা ছিল আপনার দূরদর্শিতা।

শেখ মুজিব : একজন নেতার উচিত তাঁর জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং জনগণকে তাঁকে পরিচালিত করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

সাহায্য পেলে আমার দেশের এমন সম্পদ রয়েছে, যা দিয়ে আমি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারি। আমার গ্যাস রয়েছে, রয়েছে চুনাপাথর এবং আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। বঙ্গোপসাগরে তেল অনুসন্ধানে আমরা মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছি।

কিসিঞ্জার : আপনি যদি তেল পান তাহলে আপনি ওপেকে যোগ দিতে পারেন!

শেখ মুজিব : আমার রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, যা এখনই বিক্রয়যোগ্য। আমরা এটা সার প্রস্তুত ও অন্যান্য সম্পদের কাজে ব্যবহার করতে পারি। এমন নয় যে, আমাদের কোনো সম্পদ নেই। আমাদের সম্পদ আছে। আমরা এখন যা করি তার চেয়ে তিন গুণ খাদ্য উৎপাদন করতে পারি।

কিসিঞ্জার : কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শেখ মুজিব : এ জন্য আমার জনগণকে শিক্ষিত করতে হবে। আমরা আসলে এখনো যুদ্ধের ক্ষত কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। এখন আমাকে আবার এটা বলতে দিন যে, আপনি বাংলাদেশ সফরে আসায় আমি কতটা আনন্দিত হয়েছি। যখন প্রেসিডেন্ট আসবেন, আশা করব, আপনিও তাঁর সঙ্গে আসবেন। আমরা তাঁর জন্য একটি নৌবিহারের আয়োজন করব। আমরা তাঁকে বাংলার বাঘ দেখাব!

আমি সর্বদাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরেই আমি সে কথা বলেছি।

কিসিঞ্জার : আপনি চেতনার এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

শেখ মুজিব : সেটা আসলে আমাদের যে সামগ্রিক নীতি তারই বহিঃপ্রকাশ। আর সে নীতি হলো সবার প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরিতা নয়।

(মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই পর্যায়ে একটি পৃথক কক্ষে গমন করেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে একেবারেই স্বল্প সময়ের জন্য মিলিত হন।)

পরিশিষ্ট ৬

১৫ আগস্ট : পেছন ফিরে দেখা

মতিউর রহমান

নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন এবং তাঁর সরকারের পতন ঘটে। সেদিন সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানে সংঘটিত আকস্মিক ও অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনাবলি দেশে-বিদেশে সবাইকেই স্তম্ভিত করেছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। বহু অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জনগণের গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। একাত্তরের নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের দুঃসহ দিনগুলোতে বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বিগত প্রায় তিন দশক ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বহু প্রশংসা, অনেক সাফল্যের কথার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমালোচনা, অনেক বিতর্ক উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের অধিকার, গণতন্ত্র আর স্বাধিকারের সংগ্রামে তাঁর ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে খাটো করা সম্ভব নয়। বিগত দশকগুলোতে ও ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যত পরিবর্তনই আসুক না কেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতার আসন থেকে তাঁকে অপসারিত করা সম্ভব নয়। সে জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদানকে কেউ মেনে নিতে পারুন আর না-ই পারুন, ইতিহাসে এ সত্য সমুজ্জ্বল থাকবে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। যে জন্য বিএনপি নেতা মন্ত্রী মওদুদ আহমদকেও এ স্বীকৃতি দিতে হয় যে, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তার চেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, এমন

কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। শেখ মুজিব ছিলেন সেই ব্যক্তি, জীবনব্যাপী যিনি এই জাতির স্বার্থে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন, বিরাজ করেছিলেন সেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসেবে।' *(শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, মওদুদ আহমদ, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৩৫০)। সে জন্য বিএনপি নেতৃত্ব বা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকেও জাতীয় নেতার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের আগে এটা সাধারণভাবে কেউ ভাবতেই পারেননি যে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই, এমনকি শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম করে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মধ্যেই সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র তখন একদম অনালোচিত ছিল, তা নয়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁর নিরাপত্তা ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্কতার কথা বলেছিলেন অনেকে। দেশের ভেতরের শুভানুধ্যায়ী অনেকেই যেমন তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তেমনি কোনো কোনো বিদেশি রাষ্ট্রও এ ব্যাপারে তাঁকে জানিয়েছিল। ভারতের পক্ষ থেকে তো চুয়াত্তর সালের ডিসেম্বর ও পঁচাত্তর সালের মার্চে দুবার সামরিক বাহিনীতে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের সুনির্দিষ্ট তথ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানানো হয়েছিল। ভারতের বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক প্রধান আর এন কাও [রমেশ্বর নাথ কাও] কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। (কলকাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক *সানডে*, ২৩-২৯ এপ্রিল, ১৯৮৯)।

তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, ১৫ আগস্টের দু সপ্তাহ আগে সুইডেনে প্রকাশিত বিশেষ রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ও সেনাসদস্যদের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ ছিল। (*ক্রিটিক্যাল টাইমস, মেমোয়ার্স অব আ সাউথ এশিয়ান ডিপ্লোম্যাট*, ফখরুদ্দীন আহমেদ, ১৯৯৫, পৃ. ১৪০)।

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের কাছেও এরকম তথ্য ছিল। এই সংস্থার প্রধান ব্রিগেডিয়ার আবদুর রউফের এক সাক্ষাৎকার *(ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস/বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড*, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ২৬৫) থেকে জানা যায়, চুয়াত্তরের শেষে বা পঁচাত্তরের শুরুর দিকে তিনি খবর পেয়েছিলেন যে ট্যাংক রেজিমেন্টের কিছু লোক একটা শোডাউন করতে চায়। তবে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কিন্তু এটা জানা গিয়েছিল যে এই পরিকল্পনার সঙ্গে লে. কর্নেল ফারুক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার রউফ এ খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দিয়েছিলেন। তিনি এ সবকিছু জানেন বলে জানিয়েছিলেন।

সে সময়ে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহও এরকম তথ্য বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছিলেন (এ নিবন্ধকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, *ভোরের কাগজে* প্রকাশিত, ১৫-১৬ আগস্ট ১৯৯৩)। কিন্তু এসব সতর্কীকরণকে বড় হৃদয়ের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোনো আমল দেননি। এসব শুনে বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'ওরা (সেনাসদস্যরা) আমার সন্তান, আমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

কিন্তু ১৫ আগস্ট সকালে সে ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে যায়। সামরিক বাহিনীর ক্ষুদ্র এক অংশের (এর মধ্যে তিনজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারও ছিলেন) নেতৃত্বে এক আকস্মিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন। স্বাধীনতার চার বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে ব্যাপক নেতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে তা আর থামেনি। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন, ক্যু-পাল্টা ক্যু, বহু সামরিক ব্যক্তি নিহত এবং ঢাকা জেলের অভ্যন্তরে বদ্ধ প্রকোষ্ঠে চার জাতীয় নেতার জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এ ধারাতেই। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও সামরিক বাহিনীর একটি অংশের অভ্যুত্থানে নিহত হন ১৯৮১ সালের ৩০ মে, চট্টগ্রামে। আবার সামরিক অভ্যুত্থান হয় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে।

পঁচাত্তরের ঘটনাবলির পর প্রায় দেড় দশকজুড়ে দেশে সামরিক-বেসামরিক শাসন ও নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর গত এক দশকে তিনটি সাধারণ নির্বাচনের পরও দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনো অস্থিতিশীল অবস্থাতেই রয়ে গেছে। পঁচাত্তরের আগস্টের পর সব সরকারের পক্ষ থেকে বারবার দুর্নীতি উচ্ছেদ ও গণতন্ত্রের আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তা রূপলাভ করেনি। বিগত এক দশক ধরে নির্বাচিত সরকারগুলোর অধীনেও দেশে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বরং রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা আর সংঘাত বেড়েই চলেছে। নির্বাচিত সরকারগুলো তাদের ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে না, জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘটনাবলি ও তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মহলে আজও তেমন কোনো গভীর অনুসন্ধানী পর্যালোচনা হলো না। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যা হচ্ছে তা শুধু অতীতের সাফল্যের বক্তৃতা-বিবৃতি বা আলোচনারই পুনরাবৃত্তি। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগবিরোধী শক্তিগুলো স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতাগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করেই শুধু রাজনৈতিক সুবিধা লাভের চেষ্টা করেছে।

তবে দেশের বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে এ বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকারের বিভিন্ন মাত্রার বেশকিছু সাফল্যের কথা স্বীকার

করেন। সে সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হয়। বিধ্বস্ত যোগাযোগব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহনব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। স্বল্প সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্বাধীনতার ১০ মাসের মধ্যেই নতুন সংবিধান দেওয়া হয় এবং তার ছয় মাস পর নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেড় বছরের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সমাপ্ত করে। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীন অবস্থান নিতে সক্ষম হন এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। এসব ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, উদ্যোগ ও তাঁর অবস্থানই নিঃসন্দেহে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

তার পরও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন নীতির ফলে সৃষ্ট জনজীবনের সংকট, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি, নিজের দলের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে নিপীড়ন, গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল, জরুরি আইনের প্রয়োগ এবং শেষ পর্যন্ত একদলীয় শাসনব্যবস্থা 'বাকশাল' প্রভৃতি ঘটনাবলির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ সবকিছুর বিভিন্নমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান এবং পরবর্তী ঘটনাবলি সৃষ্টির পটভূমি তৈরি হয়েছিল বলে তাঁরা মনে করেন।

শুধু অভ্যন্তরীণ কারণ নয়, মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজের 'দ্য মার্ডার অব মুজিব' শিরোনামে বড় নিবন্ধটির (*বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভল্যুশন* গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ) তথ্যানুসন্ধান থেকে জানা যায়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর জ্ঞাতসারে কয়েকজন দক্ষিণপন্থী আওয়ামী লীগ নেতা ও সামরিক অফিসারের বছরাধিককালের ষড়যন্ত্রের ফলে শেখ মুজিব নিহত হন। প্রায় এক বছর ধরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। উৎখাতের দিন পর্যন্ত এ যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। আর এ তো সবার জানা কথা, মার্কিন সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি কখনো খুশি ছিল না। নিক্সন-কিসিঞ্জার স্বাধীন বাংলাদেশকে কখনো মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল তাঁদের জন্য ব্যক্তিগত বড় পরাজয়। সে জন্য চুয়াত্তর সালে খাদ্যসাহায্য না দিয়ে মার্কিন সরকারের রাজনৈতিক চাপ ও তার ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্য সংকটকে আরও গভীর করে তুলেছিল। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ ও মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে শেখ মুজিবের পতনে তারা খুশি হয়েছে। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরই শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের বিরোধী পাকিস্তান, চীন ও সৌদি আরব সরকার বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি দেয়।

পঁচাত্তর-পূর্ববর্তী দুই দশকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘটিত অভ্যুত্থানগুলো পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের অত্যন্ত সফল একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত করা অসম্ভব ছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের মূল্যায়নটি আমরা বিবেচনায় নিতে পারি। তাঁর মতে, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান-সম্পর্কিত ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বের সত্যতা যা-ই থাকুক না কেন, বাস্তব এই যে প্রায় সব অভ্যুত্থান অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হলেও বাইরের শক্তির উৎসাহ বা নিরুৎসাহ এর সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। শেখ মুজিবের পরবর্তী সরকারগুলোর সফলতা বিপুলভাবে নির্ভরশীল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের ওপর এবং বাংলাদেশ-মার্কিন উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান দিক-পরিবর্তনকারী ভূমিকা পালন করেছে। (*দ্য মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য মিথ অব ডেমোক্র্যাসি*, এমাজউদ্দীন আহমদ, ইউপিএল, পৃ. ৬৫)।

নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত দেশ ও অর্থনীতি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রেই বিরাজ করছিল বহুবিধ জটিল ও কঠিন সমস্যা। সৃষ্টি হয়েছিল গভীর ক্ষত, অনেক অনিশ্চয়তা। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা দেশবাসীর মনে বিপুল আশা সঞ্চার করেছিল। তারা ভেবেছিল, দ্রুত তাদের জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হবে।

প্রাথমিকভাবে বঙ্গবন্ধু সরকারের বেশ কিছু সাফল্যের পর তাঁর সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রমের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জটিলতা ও সংকট দেখা দিতে শুরু করে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। চুয়াত্তর সালে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। মৃত্যু হয় বহু মানুষের। অসহায় মানুষের এই মৃত্যু, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, দুর্নীতি ও অরাজকতা প্রভৃতি জনজীবনের সমস্যাগুলোকে গভীর করে তোলে। এসব সমস্যা সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতা, আওয়ামী লীগের ভেতরে দুর্নীতি ও কোন্দল ইত্যাদি কারণে মানুষের মধ্যে আওয়ামী লীগ দল ও তার সরকার সম্পর্কে সমালোচনা বৃদ্ধি পেতে থাকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তাও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এ সবকিছুর পটভূমিতে চুয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর—এই এক বছরে আওয়ামী লীগের ভেতরেও রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিভক্তি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নানাভাবে দলের ঐক্যবদ্ধ ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। সরকার ও দলের সর্বক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত প্রভাবই সে সময়ে নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছে।

এ সময়ে আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ তরুণের একটি বড় অংশ বের হয়ে গিয়ে উগ্র স্লোগান ও বক্তব্য দিয়ে সরকারবিরোধী দল 'জাসদ' গড়ে তোলে। দেশব্যাপী তারা দ্রুত সমর্থন পায়। সভা, মিছিল, ঘেরাও কর্মসূচি দিয়ে দেশে তারা এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সরকারের বিরুদ্ধে

তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি পর্যন্ত দেয় এবং পুলিশ-বিডিআরের সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। একই সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উগ্র বামপন্থীদের গোপন সশস্ত্র তৎপরতাও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, চীনপন্থী উগ্র বামপন্থী দলগুলো পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি। তখন এসব গোষ্ঠী নিজেদের 'পূর্ব পাকিস্তান' বা 'পূর্ব বাংলা'র দল হিসেবে অভিহিত করত। আর সিডনি উলপার্টের *জুলফি ভুট্টো অব পাকিস্তান* গ্রন্থে এ তথ্য পাওয়া যায় যে এদের এক নেতা আবদুল হক (স্বাধীনতার পর থেকে আমৃত্যু আত্মগোপনকারী) মুজিব সরকারকে উৎখাতের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে সাহায্য পর্যন্ত চেয়েছিলেন। সিডনি উলপার্টের কাছ থেকে আরও জানা যায়, ভুট্টো বাংলাদেশের মুজিববিরোধী রাজনৈতিক দলকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন (*জুলফি ভুট্টো অব পাকিস্তান*, পৃ. ২৪৮)। অন্যদিকে, স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন চরম ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী অপ্রকাশ্যে তাদের সব তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিল। নানা প্রচারণায় ধর্মকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতা করছিল। এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চক্রান্ত ও অন্তর্ঘাতী তৎপরতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা পাল্টে দেওয়ার প্রবল চেষ্টা চলছিল।

এ সবকিছুর পাশাপাশি সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর লেখা ও সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, দেশবাসীর মধ্যে যেসব সমস্যা বিরাজ করছিল, সামরিক বাহিনীর মধ্যেও তা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে এ মনোভাব ছিল যে তারা অবহেলিত। অফিশিয়াল আর্মির পাশাপাশি রক্ষীবাহিনী গঠন নিয়ে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল। (বর্তমান নিবন্ধকারকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৫ ও ১৬ আগস্ট ১৯৯৩ *ভোরের কাগজ*-এ প্রকাশিত) সে সময়ে ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলও লিখেছেন যে সে সময়ে সেনাবাহিনীতে রেষারেষি ছিল। চক্রান্তও ছিল। ('কাছে থেকে দেখা : আগস্ট ট্র্যাজেডি', কর্নেল শাফায়াত জামিল, *ভোরের কাগজ*, ১৫-২২ আগস্ট ১৯৯৪)। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগতদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের জ্যেষ্ঠতা প্রদান ও দ্রুত পদোন্নতি ইত্যাদিসহ নানা কারণে অসন্তোষ ছিল। তা ছাড়া চুয়াত্তর সালের প্রথম ভাগে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, দুর্নীতি দমন ও চোরাচালান বন্ধের জন্য সামরিক বাহিনীকে নিয়োজিত করলে কোনো কোনো আওয়ামী লীগ নেতা বা কর্মীর বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এতেও তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল।

পঁচাত্তরে দেশের এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি শাসন ও একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে গেলেন। অবশ্য এর আগে

চুয়াত্তরের ডিসেম্বরেই জরুরি আইন বলবৎ করা হয়। একদলীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ দলে ও মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। জনগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থেকে বঙ্গবন্ধু এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলা হলেও আওয়ামী লীগ ও বাঙালি জাতির দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন এ ব্যবস্থা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ২৫ বছর সংগ্রাম করেছে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই সংসদীয় গণতন্ত্রের জায়গায় একদলীয় শাসন বাকশাল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বহু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মধ্যেও এ ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল না। মন্ত্রীদের অনেকেও এ নতুন ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। দলের কার্যকরী কমিটি বা সংসদীয় দলে এ নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সামনে বস্তুত কারও পক্ষেই এ ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ সম্ভব ছিল না। মাত্র দুজন সংসদ সদস্য (জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন) এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির শাসন ও একক জাতীয় দল গঠনসহ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিলটি সংসদে কোনো আলোচনা ছাড়াই মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে পাস করা হয়। সেদিন যাঁরা পুরোনো সংসদ ভবনে ছিলেন, তাঁরা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী পাস করানোর পর একক জাতীয় দল বাকশালকে কেন্দ্র করে যা হচ্ছিল তার সবকিছুই ঘটেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে। পরিবর্তন হচ্ছিল শুধু ওপরতলায়। দলের ভেতরে ও বাইরে বস্তুত কারও কাছে পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না যে কী হতে চলেছে। বাকশালের বিভিন্ন কমিটিতে মানুষ নতুন তেমন কিছু দেখতে পায়নি। বাকশালের সর্বস্তরের কমিটিতে স্থান পায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, যাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ছিল, বহু অভিযোগ ছিল। এমনকি বাকশালের সর্বোচ্চ কমিটিতে জায়গা পেল খন্দকার মোশতাকসহ পরিচিত ষড়যন্ত্রকারীরা। অথচ একাত্তর সাল থেকেই মোশতাকের নানা ষড়যন্ত্রের কথা সবাই জানতেন। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদকে অন্যায়ভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ দুজনের মধ্যে বিভেদ দল ও সরকারের জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়েছিল। এসবের ফলে মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অগ্রসরমাণরা এ পরিবর্তন গ্রহণ করতে পারেননি। প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তাঁদের অনেকে বাকশালে যোগ দেননি। এঁদের মধ্যে বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, আবু জাফর শামসুদ্দীন, কবি শামসুর রাহমান প্রমুখ ছিলেন। কোনো কোনো রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতে, একদলীয় শাসনব্যবস্থা ও দ্বিতীয় বিপ্লব দেশের তৎকালীন প্রধান প্রধান সামাজিক শক্তি ও গোষ্ঠীকে বঙ্গবন্ধু বা তাঁর

সরকারের কাছ থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই করেনি, তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কেও ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

সে সময়ের পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমেদ ১৫ আগস্টের পূর্ববর্তী অবস্থাকে ১৯৬৫ সালে ঘানার জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক কাওমে নক্রুমার বিরুদ্ধে তরুণ অফিসারদের অভ্যুত্থান-পূর্ব অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৫ আগস্ট সকালে অভ্যুত্থানের খবর শোনার পরই তাৎক্ষণিকভাবে তার ঘানার নক্রুমা-বিরোধী অভ্যুত্থানের ঘটনাবলির কথা মনে পড়েছিল। প্রেসিডেন্ট নক্রুমা ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু তাঁর একক দল তাঁকে অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। ১৫ আগস্টের আগে বাংলাদেশে ঘানার মতোই পরিস্থিতি ছিল। (ফখরুদ্দীন আহমেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৯)।

এ কথা ঠিক যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানে অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাংবাদিক বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। তবে এঁদের অনেকেই যে বিশ্বাস থেকে যোগ দেননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পরই। বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের বড় এক অংশ নতুন অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে উৎসাহের সঙ্গে প্রচারে নেমে পড়েন। অনেকে খন্দকার মোশতাক আহমদকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। শুধু মোশতাকের সঙ্গেই নয়, তাঁদের অনেকেই পরে বিএনপি ও জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

চুয়াত্তর সালের ডিসেম্বরে জরুরি আইন জারি, রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা, সংসদে কোনো আলোচনা ছাড়াই চতুর্থ সংশোধনী পাস, একক দল বাকশাল গঠন, চারটি মাত্র পত্রিকা বাদে অন্য সব পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা, বাকশাল ও অন্যান্য সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন, বিভিন্ন জেলায় গভর্নর নিয়োগ এবং বঙ্গভবনে তাঁদের ট্রেনিং নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীদের ব্যস্ততা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সৃষ্ট দেশব্যাপী অনিশ্চিত ও তরল রাজনৈতিক পটভূমিতেই অভ্যুত্থানকারীদের আকস্মিক আক্রমণে দেশের ক্ষমতায় দ্রুত রদবদল ঘটে যায়। সেদিন ওই নৃশংস ঘটনাবলির বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। আওয়ামী লীগসহ বঙ্গবন্ধুর সমর্থক শক্তিগুলো ছিল সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তত। তাদের পক্ষে প্রতিরোধের কোনো উদ্যোগ নেওয়াই সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে সে সময়ের সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ ও ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের ভাষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় সাধারণভাবে সেনাবাহিনীতে 'উল্লাস' সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে অভ্যুত্থান প্রতিরোধের ব্যাপারে কিছু ভাবলেও তা করা সম্ভব ছিল না। তেমন কোনো অবস্থা বা পরিবেশও ছিল না। সেদিন সামরিক শৃঙ্খলাও গিয়েছিল পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের কেউ কেউ এ নিবন্ধকারকে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁদের পক্ষে কোনো প্রতিরোধ গড়ে

তোলা সম্ভব ছিল না। সে রকম কোনো প্রস্তুতিও তাঁদের ছিল না। তা ছাড়া আওয়ামী লীগ বা নবগঠিত বাকশাল ও মন্ত্রিসভার প্রায় সব সদস্য বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারে দ্রুত অংশ নেওয়া ও শপথগ্রহণের ফলে পুরো পরিস্থিতিই পাল্টে গিয়েছিল। সেসব দৃশ্য মানুষ টেলিভিশনে দেখেছে।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান সম্পর্কে খুনি ফারুক আর রশিদ (তাঁদের *মুক্তির পথ* বইয়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার) বলেন, ১৯৭৩ থেকে তাঁরা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে আসছিলেন। ৭৪-এর নভেম্বরে একবার তাঁরা অভ্যুত্থানের কর্মসূচি ও সময় ঠিক করেন। ৭৫-এর জানুয়ারির মধ্যে আঘাত হানার দুটি নির্ধারিত সময়সূচি ছিল। ১৫ আগস্ট ছিল সর্বশেষ ও সর্বোত্তম সময়সূচি। তা ছাড়া শাফায়াত জামিলের লেখা থেকে জানা যায়, ৭৩ সালের শেষ দিকে ফারুক একটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সামরিক নেতৃত্বের কেউ কেউ ফারুকের অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনাবলির প্রায় তিন দশক পর যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-প্রবর্তিত নতুন শাসন-পদ্ধতি কি সফল হতো? সে সময়ে বিরাজমান দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ও বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ ও অবস্থান বিবেচনায় নিয়েই এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে। এ প্রশ্ন নিয়ে ভিন্নভাবে বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। তবে এ কথা বলা যায়, নতুন শাসনব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল জনজীবনের সংকট মোচনে সৎ প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন এবং সামরিক বাহিনীর সমর্থনের ওপর। সেদিক থেকে বলা যায়, তখন সমগ্র পরিস্থিতি বাকশালের সফলতার অনুকূলে ছিল না। আর তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একক দলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনার নানামুখী প্রচেষ্টা চললেও পরে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে একক দলের নেতৃত্বে কোনো সমাজতান্ত্রিক বা তথাকথিত অধনবাদী পথে রাষ্ট্রগুলো এগোতে পারেনি, ওই রাষ্ট্রগুলোর পুরো ব্যবস্থাই ভেঙে গেছে। বাংলাদেশের মতো তাদেরও এখন নতুন করে গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে যেতে হচ্ছে। তা ছাড়া সে সময়ে দেশ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, মানুষের জীবনের ক্রমবর্ধমান সংকটগুলো যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সরকারের নতুন পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছিল, এসব বিবেচনা করলে এবং সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে অসন্তোষের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সে সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে রাজনৈতিক

অস্থিরতা ও গভীর সংকটের লক্ষণগুলো বিদ্যমান ছিল। ফখরুদ্দীন আহমেদের ভাষায় বলা যায়, এ সবকিছুর মধ্যে 'ঘানার ঘটনার প্রতিফলন ছিল'। এরকম অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা শুধু নয়, অভ্যুত্থানকারীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার পরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও কোনো ব্যবস্থা নেননি। তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীরাও পরিস্থিতির গভীরতা অনুধাবন করতে পারেননি। সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনও তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। এসবই অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘটনাবলির প্রায় তিন দশক পর এ কথা বলা যায়, স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশকে ঘিরে দেশের ভেতরে ও বাইরের বিভিন্ন শক্তি যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল, তাতে সেদিন তারা বিপুলভাবে সফল হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। বাঙালি জাতির এক অত্যন্ত উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি সংগ্রামের বিজয়ের মধ্য দিয়ে মহত্ত্ব আর অমরত্ব অর্জন করেও ইতিহাসের এক ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে রইলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। [ঈষৎ সংক্ষেপিত]

প্রথম আলো, ১৬ আগস্ট ২০০২

নির্ঘণ্ট

ই

উ

এ

ও

ক

খ

ঝ

ট

ড

ঢ

ত

থ

দ

ভ

ম

গ্রন্থপঞ্জি

বই

Alexander De Waal, *Famine Crimes Politics & the Disaster Relief Industry in Africa*, London : African Rights & the International African Institute, James Currey Publishers, 1997.

Amartya Sen, *Poverty and Famines*, Oxford University Press,1981.

Anthony Mascarenhas, *Bangladesh : A legacy of blood*, London, 1986.

Bhashyam Kasturi, *Intelligence Services Analysis, Organization and Functions*, Laneer Publishers, 1995.

Christopher Hitchens, *The Trial of Henry Kissinger,* Verso, 2001.

Elora Shehabuddin, *Reshaping the Holy Democracy, Development, and Muslim Women in Bangladesh*, Columbia University Press, 2008.

George W. Norton; Jeffrey R. Alwang; William A. Masters, *Economics of Agricultural Development World Food Systems and Resource Use,* Routledge, 2006.

H. Kissinger, *The White House Years*, Weidenfeld & Nicolson/Michael Joseph, London, 1979.

House Select Committe on Intelligence, *US Intelligence Agencies Activities Intelligence Costs* (Washington DC, GPO, 1975, P. 169).

J. N. Dixit, *Liberation and Beyond Indo-Bangladesh Relations*, Konark Publishers, New Delhi, 1999.

Janneke Arens, *Economic And Political Weekly*, 'Winning Hearts and Minds Foreign Aid and Militarisation in the Chittagong Hill Tracts', vol. 32, No. 29 (July. 19-25, 1997).

Kristin L. Ahlberg, *Transplanting the Great Society : Lyndon Johnson and Food for Peace*, University of Missouri Press, 2008.

Kuldip Nayar, *The Judgement Inside story of the emergency in India*, Vikas Pub House, 1977.

Lawrence Lifschultz; Kai Bird, *Bangladesh The Unfinished Revolution,* Zed Press, 1979.
Lioyd I. Rudolph; Susanne Hoeber Rudolph, *The Regional imperative The Administration of US Foreign policy towards South Asian States Under Presidents Johnson and Nixon,* Concept Publishing Company, 1980.
M. Andrew; Vasili Mitrokhin; Allen Lane, *The Mitrokhin archive II the KGB and the world* (An imprint of Penguin Books), London, 2005.
Pamela K. Gilbert, *Imagined Londons*, 'IDSA Journal', vol. II, Sunny Press, 2002.
Peter Dale Scott, *The Road to 9/11 Wealth, Empire, and the future of America*, University of California Press , 2008.
Pupul Jayakar, *Indira Gandhi An intimate biography*, Pantheon Books, 1992.
Robert S. Anderson, *Nucleus and Nation Scientists, International Networks, and Power in India*, University of Chicago Press, 2010.
S Mahmud Ali, *Understanding Bangladesh*, Columbia University Press, 2010.
Seymour M. Hersh, *The Price of Power, Kissinger in the Nixon White House*, Summit Books, 1983.
Sharad Chauhan, *Inside CIA Lessons in Intelligence*, APH Publishing, 2004.
Sukharanjan Dasgupta, *Midnight Massacare in Dacca*, Vikas, 1978.
Viggo Olsen, *DAKTAR II,* Moody Press, Chicago, 1990.

পত্রপত্রিকা

এবিসি নিউজ, ৩ অক্টোবর ২০১২
দি ওয়াশিংটন পোস্ট, লিউস এম. সাইমন্স, ৫ অক্টোবর ১৯৭১
দি ওয়াশিংটন পোস্ট, ২৫ নভেম্বর ২০০৪
কাইহান (ইরান), ১৭ আগস্ট ১৯৭৫
টাইমস অব ইন্ডিয়া, ৯ নভেম্বর ২০১১
দি ইকোনমিস্ট, ১৯ এপ্রিল ২০০১
দ্য গার্ডিয়ান, ১৫ আগস্ট ১৯৭৯
দ্য নেশন, ২১ জুন ১৯৮০
দ্য স্টেটসম্যান (কলকাতা), ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১
নিউ ইয়র্ক টাইমস, ৩ জুলাই ১৯৮৩
প্রথম আলো, ১৬ আগস্ট ২০০৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ মে ১৯৭৪

বোকা রেটন নিউজ, ৪ এপ্রিল ১৯৭২
সানডে, ২৩-২৯ এপ্রিল ১৯৮৯
American Universities Field Stuff, Reports Service South Asia series, Volumes 19-21, 1975
N. M. J (Lifshultz), *Murder In Dacca Ziaur Rahman's Second Round*, *E&PW*, vol-13, No : 12, March 25, 1978.

মার্কিন নথিপত্র

স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট, আফ্রিকা, সাউথ এশিয়া। সিক্রেট নং ০৮৩৬০/৭৫।
৩ জানুয়ারি ১৯৭২ : সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন (ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স), সিক্রেট নং ০৪২
১০ জানুয়ারি ১৯৭২ : সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন (ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স), সিক্রেট নং ০৪২
২১ ডিসেম্বর ১৯৭২ : সিআইএ, এনআইসি ফাইলস, জব ৭৯-আর ০১০১২এ
২ নভেম্বর ১৯৭৩ : আউটগোয়িং মেসেজ, সিক্রেট
১ মার্চ ১৯৭৪ : উইকলি রিভিউ, টপ সিক্রেট কপি নং ৪২৬
২৬ জুন ১৯৭৪ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড, কপি নং ৬৩১
২৬ জুন ১৯৭৪ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড, টপ সিক্রেট নং ৬৪৮
৩ জানুয়ারি ১৯৭৫ : সিআইএ স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৪০৫/৭৫
১৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ : সিআইএ স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ : সিআইএ স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, টপ সিক্রেট নং ১৩৪
৬ মার্চ ১৯৭৫ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউএসআইবি, টপ সিক্রেট নং ৬৩৮
৯ মে ১৯৭৫ : সিআইএ স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৬৬৭/৭৫
৪ জুন ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, টপ সিক্রেট নং ০৬৮৫/৭৫
৯ জুন ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, কনফিডেনশিয়াল নং ০৬৮৮/৭৫
২৫ জুন ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৬৯৬/৭৫

১ জুলাই ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৪৩৮৯/৭৫

৩ জুলাই ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮২১/৭৫

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন (ইউনাইটেড স্টেট ইন্টেলিজেন্স বোর্ড)

১৬ আগস্ট ১৯৭৫ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন (ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড), টপ সিক্রেট

১৮ আগস্ট ১৯৭৫ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টেলিজেন্স বোর্ড (ইউএসআইবি), টপ সিক্রেট নং ৬৬৯

১৯ আগস্ট ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : সোভিয়েত ইউনিয়ন ইস্টার্ন ইউরোপ, টপ সিক্রেট

২০ আগস্ট ১৯৭৫ : ফরেন ব্রডকাস্ট ইনফরমেশন সার্ভিস এফবিআইএস, কনফিডেনশিয়াল, ভলিউম. ২৪, নং ৩৩, ট্রেন্ডস ইন কমিউনিস্ট মিডিয়া

২১ আগস্ট ১৯৭৫ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউএসআইবি, টপ সিক্রেট নং ৬৬৯

২২ আগস্ট ১৯৭৫ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউএসআইবি, টপ সিক্রেট নং ৬৭৪

২২ আগস্ট ১৯৭৫ : উইকলি সামারি, সিক্রেট নং ০০৩৪/৭৫, কপি নং ৬১

২৭ আগস্ট ১৯৭৫ : ট্রেন্ডস ইন কমিউনিস্ট মিডিয়া, কনফিডেনশিয়াল, ফরেন ব্রডকাস্ট ভলিউম ২৪, নং ৩৪

২৯ আগস্ট ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮৪৯/৭৫

২৯ আগস্ট ১৯৭৫ : উইকলি সামারি, সিক্রেট নং ০০৩৫/৭৫

২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : চায়নিজ অ্যাফেয়ার্স, টপ সিক্রেট নং ১৬৩

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, টপ সিক্রেট নং ১৪০

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮৫২/৭৫

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮৫৩/৭৫

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮৫৫/৭৫

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : সোভিয়েত ইউনিয়ন ইস্টার্ন ইউরোপ, টপ সিক্রেট নং ০০৫১০/৭৫

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮৩৬১/৭৫
৩ অক্টোবর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইস্টার্ন ইউরোপ, সিক্রেট নং ১৭২
৬ অক্টোবর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮৬৩/৭৫
৬ অক্টোবর ১৯৭৫ : ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন, ইউনাইটেড স্টেট ইন্টেলিজেন্স বোর্ড (ইউএসআইবি), টপ সিক্রেট কপি নং ৬৬৯
১০ অক্টোবর ১৯৭৫ : উইকলি সামারি, সিক্রেট নং ০৪১/৭৫, কপি নং ৭১
১৭ অক্টোবর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮৭০/৭৫
২২ অক্টোবর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিডল ইস্ট আফ্রিকা সাউথ এশিয়া, সিক্রেট নং ০৮৭৩/৭৫
২৯ অক্টোবর ১৯৭৫ : স্টাফ নোটস : মিলিটারি ডেভেলপমেন্টস, টপ সিক্রেট নং ৩৯৩০/৭৫
নভেম্বর ১৯৮২ : এ হ্যান্ডবুক, সিক্রেট এনইএসএ ৮২-১০৫৪৭
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, রিভিউ অথরিটি : রবার্ট এল ফুনসেথ, তারিখ/কেস আইডি : ৫ মার্চ ২০০৩, ২০০১০২৯৭৯
টেলিকন, রিভিউ অথরিটি রবার্ট এইচ মিলার, তারিখ/কেস আইডি : ২২ ডিসেম্বর ২০০৪, ২০০১০২৯৭৯
National Intelligence Estimate, Soviet Military Posture and policies in the third world, 2/8/1973, vol. I